সর্পতান্ত্রিকের সন্ধানে

(তৃতীয় খণ্ড)

নিগূঢ়ানন্দ

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ

শ্রাবণ ১৩৬৬

প্রকাশক

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী

১৮এ, টেমার লেন

কলকাতা-৯

মুদ্রাকর

শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ

দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস

২০৯এ, বিধান সরণী

কলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদশিল্পী

খালেদ চৌধুরী

মৃণালেন্দু চট্টোপাধ্যায়
প্রীতিভাজনেষু।

লেখকের বক্তব্য

সর্পতান্ত্রিকের সন্ধানে তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে। নানা কারণে তৃতীয় খণ্ড প্রকাশে বিলম্ব হল। তৃতীয় খণ্ড মূলতঃ যোগের উপর লিখিত। তন্ত্র যোগের উপর নির্ভরশীল। সেই যোগসাধনার কথা সহজ অথচ বিজ্ঞানভিত্তিক করে লিখে পাঠকের কাছে পরিবেশন করার চেষ্টা হয়েছে। প্রথম দুটি ফর্মায় ভাল করে প্রুফ দেখা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। মুদ্রণ-প্রমাদ থাকলে ক্ষমার চোখে দেখা হবে আশা করি। পরবর্তী অংশে যথাসম্ভব অভিনিবেশ সহকারে প্রুফ দেখা হয়েছে। প্রথম দু'খণ্ডের মত তৃতীয় খণ্ডও যদি অধ্যাত্মতত্ত্ব-পিপাসু পাঠকের সামান্য মাত্রও তৃপ্তি সাধন করতে পারে তবে নিজেকে ধন্য মনে করব।

ইতি—

লেখক

সাংসারিক জীবের মন সবসময়ই সংশয়ে আচ্ছন্ন। বিশ্বাস্য ও অবিশ্বাস্যের মধ্যে সহজে সে কোন সীমারেখা টানতে পারে না। না পারার কারণ, বিশ্বাস করে প্রতারিত হওয়া। সংসারে বিশ্বাস না করলে টেকা দায়, অথচ মানুষের স্বভাব নেমেছে এত নিচে যে, বিশ্বাস করলে অধিকাংশই সেই সুযোগে বিশ্বাসকারীকে প্রতারণা করে। ফলে ঠেকে ঠেকে ঠকে ঠকে মানুষ হয়ে উঠেছে বড় অবিশ্বাসী। কোন্‌টাতে বিশ্বাস করা উচিত আর কোনটাতে নয়, সে তা বুঝতে পারে না সহজে। অতিপ্রাকৃত শক্তি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কোন জ্ঞানই নেই, সুতরাং অতিপ্রাকৃত সত্যের মুখোমুখি এলে সে দিশেহারা বোধ করে। সহজে বিশ্বাস করতে পারে না নিজের চোখকেও ; তার বিশ্বাসের মাপকাঠি হল প্রাকৃত বিজ্ঞান। অতিপ্রাকৃতকে সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত বিজ্ঞানের আলোতে বিচার করে দেখার চেষ্টা করে। যখন দেখে প্রাকৃত বিজ্ঞানের সাহায্যে অতিপ্রাকৃতের স্বরূপ ধরা কঠিন তখন কিছুতেই আর অতিপ্রাকৃত সত্যে আস্থা স্থাপন করতে পারে না।

কিছু কিছু লোক আছে, যারা চায় বিশ্বাস করতে ; মনে মনে ভাবে, বিশ্বাস তারা করেও। কিন্তু কার্যতঃ তারা নিজের মনের গোপন খবরই জানে না। তারা জানে না যে, তাদের বিশ্বাস সন্দেহের দোলায় দোলায়িত। তাদের বিশ্বাস হল অর্ধ-বিশ্বাসেরই আর এক নাম। তাদের অবিশ্বাসও অনুরূপ। মুমূর্ষু কোন রুগীর নিরাময়ের জন্য তার আত্মীয়-স্বজন শুধুমাত্র অতিপ্রাকৃত সত্যের উপরই নির্ভর করে থাকেন না কখনও। তাঁরা ৺মা কালীর মন্দিরে গিয়েও হত্যে দেন, আবার ডাক্তারের কাছেও ছুটে যান। না ডাক্তার, না ভগবান, কারো উপর বিশ্বাস নেই সম্পূর্ণ, আবার কারো উপর অবিশ্বাসও নেই সবটা। মানুষের সবচেয়ে বড় ত্রুটি এখানেই। স্বয়ং গান্ধীজীর মত ব্যক্তি, যিনি অতিপ্রাকৃত সত্যের উপরই নিজেকে নির্ভর করিয়েছিলেন সবটা

তিনিও শেষপর্যন্ত তাঁর দৌহিত্রীর চিকিৎসার জন্য প্রাকৃত নিরাময় ব্যবস্থার উপর আস্থা রাখতে পারেন নি। গিয়েছিলেন আধুনিক চিকিৎসকের সাহায্য নিতে। সুতরাং সাধারণ মানুষের এই ত্রুটি থেকে আমিও মুক্ত নই। সর্পতান্ত্রিকের সন্ধানে সকরিগোলি পাহাড়ের উপর আমি যে শক্তিধর সাধকের দেহের মধ্যে অলৌকিক ব্যাপার দেখেছিলাম তাকে অলৌকিক ক্ষমতা এবং সত্য বলে কখনও মেনে নিতে পারিনি। এক্স্‌রে মেশিনে প্লেট তুলে মানুষের দেহের অভ্যন্তর ভাগ দেখানো যায়। কিন্তু কোন মানুষ অলৌকিক শক্তি বলে নিজের দেহকে কাঁচের আধারের মত করে ভেতরের কার্যকলাপ দেখাতে পারেন এটা পার্থিব সত্যের বিচারে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। সুতরাং সকরিগোলি পাহাড়ের সেই সাধুর অলৌকিক ক্ষমতা আমাকে বিভ্রান্ত করলেও বিশ্বাসী করে তুলতে পারেনি সবটা। সম্পূর্ণ অবিশ্বাস বা বিশ্বাস যদি কোনটাই না করা যায়, মনের মধ্যে একটা যন্ত্রণা থাকে। সত্যের পথে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলে সেই যন্ত্রণা আরও বেশি করে অস্থির করে তোলে।

ধর্মানুসন্ধানী এক বয়স্ক ব্যক্তিকে আমার সেই অভিজ্ঞতার কাহিনী বলতে গেলে তিনি বললেন, যোগী পুরুষেরা এ ধরনের কাজ করতে পারেন অত্যন্ত সহজেই। তাঁদের মধ্যে যে ইচ্ছাশক্তি জাগে তার সাহায্যে তাঁরা সব কিছুই করতে পারেন যখন তখন। 'ভারতের সাধক' গ্রন্থের কথা বললেন তিনি। সেখানে নাকি আছে অলৌকিক ক্ষমতা দেখাবার মত এরকম বহু সাধকের জীবনী।

আছে, জানি। এবং আমি নিজেও পড়েছি সে গল্প। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, বিশ্বাস করতে পারিনি পড়েও। এ ধরনের ক্ষমতা মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করি প্রত্যেকেই কিন্তু কখনও এটা সম্ভব ভাবতে পারি না পার্থিব ক্ষমতা নিয়ে।

বৃদ্ধ বললেন, যোগ সম্পর্কে বই পড়ুন, দেখবেন অসম্ভব বলে মনে হবে না কোন কিছুই।

যোগ সম্পর্কে শুনেছি অনেক। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আমি নিজে

করি যোগ-ব্যায়াম। ফলও পাওয়া যায় সন্দেহ নেই। কিন্তু এ ফল হল প্রাকৃত নিয়ম অনুযায়ী। অপ্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা যোগের মাধ্যমে আসে কি করে—কে বলবে।

ভারতে যোগচর্চা আজকের নয়। বহু প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে এই যোগচর্চা। যোগ সম্পর্কিত গ্রন্থ নিয়ে যদিও পতঞ্জলিই বিখ্যাত তবু তাঁর আগে যে যোগদর্শন বা যোগভাবনা ছিল না তা নয়। মৃত্তিকা খনন করে আমরা পেয়েছি সিন্ধুসভ্যতার যে-সব নিদর্শন তার মধ্যে যোগাসনে উপবিষ্ট মূর্তি পাওয়া গেছে অনেক। মূর্তির লক্ষণ বিচার করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না একটুও যে, যোগাভ্যাস এখানে ছিল ব্যাপকভাবে প্রচলিত। বিভিন্ন মূর্তি ও সীলমোহরে আঁকা চিত্র দেখে আমার ধারণা, এ অঞ্চল ছিল তন্ত্রের অন্যতম এক পাদপীঠ। যোগের সঙ্গে তন্ত্রের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। যদিও অনেকের বিশ্বাস, এ যোগ হল হঠযোগ। হঠযোগ হতে না পারে পতঞ্জলির যোগদর্শন তবু যে যোগবিদ্যারই তা অন্তর্ভুক্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কিছুমাত্র। সুতরাং অলৌকিক ক্ষমতার রহস্য ভেদ করতে গেলে যোগশাস্ত্র সম্পর্কে জেনে নেওয়াই বিধেয়। সুতরাং যোগ সম্পর্কে গ্রন্থ পড়াই ঠিক করলাম।

ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যোগশাস্ত্র পাঠ করলে দেখা যায়—ইন্দ্রিয়াতীত রহস্য ভেদ করার ক্ষমতা রয়েছে যোগাভ্যাসের। অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই এখন মনে করেন যে, মানুষের সচেতন কার্যকলাপের জন্য মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলীই যে অপরিহার্য, তা নয়। এ সম্পর্কে চর্চা করেন এমন একজন স্পষ্টই বললেন "brain is by no means indispensable for conscious activities.' মনস্তত্ত্ব-বিদদের মধ্যেও অনেকে নাকি এখন এই আলোতেই চিন্তা করছেন। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকেরা বিশ্বাস করতেন, বাহ্যেন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়াই আমরা পারি দেখতে ও জানতে। জগতে আছে এমন রহস্য যা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিচারবিশ্লেষণের বাইরে। অন্তর্দৃষ্টি হলে তা

জানা যায়। অন্তর্দৃষ্টি হল এমন জিনিস যা লাভ করলে অকস্মাৎ সম্পূর্ণ এক নতুন জগৎ চোখের উপর খুলে যায়। জন্মান্ধের চোখে দৃষ্টিশক্তি দেওয়া হলে সে যেমন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়—তেমনিই অন্তর্দৃষ্টিও নতুন জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে সৃষ্টি করে আশ্চর্য এক চমক। এই যে অন্তর্দৃষ্টি, যা দ্বারা সত্য জ্ঞান পাওয়া যায়, পাওয়া যায় ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানের সন্ধান, সেই অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যায় যোগের সাহায্যে। যোগের সাহায্যে আমরা লাভ করি এমন এক মানসিক পরিবর্তন যার সাহায্যে স্বাভাবিক ধ্যান-ধারণার অনেক উর্ধ্বেও বিচরণ করা সম্ভব হয় সহজভাবে।

এখন প্রশ্ন হল, এই যোগ কি? যোগ হল একটা পদ্ধতি। যার সাহায্যে চূড়ান্ত সত্যের কাছে যাওয়া যায়। উপনিষৎ ও ভগবদ্গীতাতে বলা হয়েছে যে, পার্থিব জগতে জীবাত্মা থাকে পরমাত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। এই দুয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে যে পদ্ধতি, তাই হল যোগ। পতঞ্জলি অবশ্য এই যোগ বলতে বোঝাননি সংযোগ বরং ভোজ যা বলেছেন তাই। অর্থাৎ যোগ হল প্রকৃতপক্ষে বিয়োগ। পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সংযোগ ছিন্ন করা। অবশ্য যাজ্ঞবল্ক্য একে বলেছেন যথার্থই সংযোগ। তাঁর মতে যোগ হল জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে সংযোগসাধন পদ্ধতি। সেইজন্য তিনি বলেছেন: 'সংযোগো যোগ ইত্যুক্তোজীবাত্ম পরমাত্মনর ইতি।' এই যোগ হল দেহকে নিয়ন্ত্রণের কতকগুলো পদ্ধতি যাতে ইন্দ্রিয় ও মনকে নিবৃত্ত করা যেতে পারে। কেউ কেউ অবশ্য যোগকে ভুল করেন সমাধি বলে। আসলে যোগ হল 'সমাধি' পর্যায়ে পৌঁছুবার একটি পদ্ধতি মাত্র। পতঞ্জলির মতে যোগ হল নিয়মমাফিক কতকগুলো প্রচেষ্টা; যাতে মানুষের দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। বস্তুগত দেহ, সক্রিয় ইচ্ছা এবং মনকে বশে আনতে হয় যোগের সাহায্যে। দেহকে নিয়ন্ত্রণ করার যোগ-পদ্ধতি অনুসরণ করলে দেহ রক্ষা পায় অস্থিরতা থেকে, অপবিত্রতা থেকে। এর ফলে আসে অতিরিক্ত প্রাণশক্তি। যৌবন

দীর্ঘ হয়, জীবনও হয়। অধ্যাত্ম-মুক্তির জন্য আছে এ-সব কিছুরই প্রয়োজন। পতঞ্জলি দিতে চাননি অধিবাস্তব তত্ত্ব, বরং বলেছেন কতকগুলো নিয়মকানুনের কথা, যা অনুসরণ করলে শরীর ও মন হয় নিয়মানুবর্তিতার অধীন। যে নিয়মানুবর্তিতা অধ্যাত্ম মুক্তি লাভে সাহায্য করে। যোগতত্ত্ব এ-ক্ষেত্রে বলেছে, চার ধরনের যোগের কথা। যেমন, মন্ত্রযোগ, লয়যোগ, হঠযোগ ও রাজযোগ। পতঞ্জলির যোগ হল শেষোক্ত যোগ অর্থাৎ রাজযোগ। এই রাজযোগ দ্বারা মন হয় শুদ্ধ। যোগ সাধককে এগিয়ে নিয়ে যায় সমাধির দিকে। হঠযোগে দেহকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। পতঞ্জলির যোগের একটি মাত্র অংশ হল দেহ নিয়ন্ত্রণ। বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল মন্ত্রযোগ। বিশ্বাস করে মন্ত্রের উপর নির্ভর করলে তা ফল দান করে তৎক্ষণাৎ।

তবে এই যোগের ধ্যান ধারণা যে পতঞ্জলির সময় থেকেই আত্মপ্রকাশ করেছে তা নয়। ঋগ্বেদেও এ সম্পর্কে ইঙ্গিত আছে যথেষ্ট। ঋগ্বেদের 'মুনি' শব্দের মধ্যেই এর ইঙ্গিত মেলে। অথর্ব বেদে আছে যে, অতীন্দ্রিয় শক্তি অর্জন করা যায় তপস্যা দিয়ে। তপস্যার মধ্যে কতকগুলি দেহ নিয়ন্ত্রণের ইঙ্গিতও আছে স্পষ্টভাবে। উপনিষদেও স্পষ্ট করে আছে যোগ-সাধনার কথা। উপনিষদের তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য, যোগসাধনারই অন্যতম অঙ্গ। যোগ-সাধনার দিকে উপনিষদেও রয়েছে স্পষ্ট ইঙ্গিত। কঠ, শ্বেতাশ্বতর ও মৈত্রায়ণী উপনিষদে সাধনার ক্ষেত্রে যে বাস্তব দিকের উল্লেখ আছে তা আসলে যোগ-সাধনারই নামান্তর। কঠ, তৈত্তিরিয় ও মৈত্রায়ণী উপনিষদে 'যোগ' কথার উল্লেখ রয়েছে স্পষ্ট করে। যোগের চূড়ান্ত পরিণতিকে এমন এক অবস্থা বলে বর্ণনা করা হয়েছে কঠোপনিষদে যেখানে মন ও বুদ্ধিবৃত্তি থাকে স্থির ও স্তব্ধ হয়ে। মৈত্রী উপনিষদে আছে ছয় ধরনের যোগের কথা। পতঞ্জলির যোগ-ব্যবস্থার কিছু নিয়মকানুনের উল্লেখও পাওয়া যায় সেখানে। তবে পতঞ্জলি যেভাবে করেছেন যোগের উল্লেখ সেভাবে উপনিষদ পর্যায়ে নেই যোগের কথা।

গৌতম বুদ্ধ নিজেও করেছিলেন যোগসাধনা। সাধনায় বসবার আগে তিনি শিক্ষা করেছিলেন তপস্যার কতকগুলি কঠোর নিয়ম-কানুন। গৌতম বুদ্ধের কয়েকজন শিক্ষকের মধ্যে অনেকেই ছিলেন যোগসিদ্ধ, যেমন, আলার। বৌদ্ধসূত্রেও আছে যোগের উল্লেখ। বৌদ্ধধর্মে ধ্যানের যে চারটি পদ্ধতি আছে তা ক্লাসিক্যাল যোগ সাধনারই অন্তর্ভুক্ত। বৌদ্ধরা বলেন যে, বিশ্বাস, শক্তি, সৎশিক্ষা, মনঃসংযোগ ও সত্য জ্ঞান, সে-কোন সাধনার মতই পারে সত্যের কাছে নিয়ে যেতে। বৌদ্ধধর্মের যোগাচার পদ্ধতি বৌদ্ধ সাধনার ধারার সঙ্গে ঘটিয়েছে যোগের সংমিশ্রণ। পরবর্তী বৌদ্ধধর্মে যোগ-সাধনা লাভ করেছে বিরাট এক ভূমিকা।

মহাভারতে সাংখ্য ও যোগকে উল্লেখ করা হয়েছে সাধনার সহকারী বলে। উপনিষৎ, মহাভারত, ভগবদগীতা, জৈনধর্ম, ও বৌদ্ধধর্ম সবাই বলেছেন যোগের কথা। হিন্দুদের বিশ্বাস, স্বয়ং ব্রহ্মাও নাকি জানতেন যোগের কথা। সুতরাং দীর্ঘদিন যাবৎ যোগ সাধনের যে ধারা আত্ম-প্রকাশ করছিল পতঞ্জলির যোগসূত্রে তাই লাভ করেছে চূড়ান্ত সিদ্ধি।

বাৎসায়নের আদি পর্যায়েও যোগ সাধনার উল্লেখ মেলে। এ যোগ অবশ্য যত যুক্ত কর্মমীমাংসার সঙ্গে সাংখ্যের সঙ্গে তত নয়। এতে বলা হয়েছে সৎকার্যবাদের কথা, বলা হয়েছে আত্মার মুক্তির কথাও। এ-সব সম্ভব যদি, দেহ ও ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বাৎসায়নের মতে সাংখ্য ও যোগের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে যথেষ্ট। আত্মার প্রকৃতি, কার্যপদ্ধতি ও কারণ নিয়েও মতভেদ আছে প্রচুর।

তবে যোগ ব্যবস্থার উদ্ভবের ইতিহাস লক্ষ্য করলে মনে হয় যে, যোগসাধনার ধারা আবহমান কাল থেকে ভারতীয়দেরই অবদান। এটা আর্যদের দান নয়, অনার্যদের। এর কারণ প্রাক-আর্য যুগে সিন্ধু উপত্যকার প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনগুলোর মধ্যে পাওয়া গেছে এখন অনেক মূর্তি যা নাকি যোগ সাধকদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাছাড়া অথর্ববেদের পর তপস্যা, অর্থাৎ যোগের একটি ধারার বহু প্রচলন

দেখেও মনে হয়, যোগসাধনা অনার্যদেরই দান। কারণ, অথর্ববেদে অনার্যদের প্রভাবে প্রভাবিত বলে প্রথম দিকে ছিল নিতান্তই অবজ্ঞার মধ্যে। তবে পতঞ্জলির যোগসূত্রই এসম্পর্কিত প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কবে রচিত হয়েছিল নিশ্চিন্ত রূপে বলা দায়। তবে খ্রীঃ পূঃ ৩০০ অব্দ থেকে খ্রীষ্টীয় ৩০০ অব্দের মধ্যে কোন সময় রচিত হয়ে থাকবে নিশ্চয়ই এর পরে নয়।

পতঞ্জলির যোগসূত্র প্রাচীনতম যোগগ্রন্থ। এর আছে চারটি অংশ। প্রথম অংশে সমাধির চিত্র ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা। এই অংশ হল সমাধিপাদ। দ্বিতীয় অংশে আছে এই সমাধি লাভের পদ্ধতির ব্যাখ্যা সাধনপাদ। তৃতীয় অংশে অতীন্দ্রির যোগসাধনায় অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা লাভের কাহিনী বিভূতিপাদে। চতুর্থ অংশে আছে মুক্তির স্বরূপ বর্ণনা, যাকে বলে কৈবল্যপাদ। পতঞ্জলির যোগসূত্রকে প্রাচীনতম যোগগ্রন্থ হিসেবে মনে হলেও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির মতে হিরণ্যগর্ভ নামে এক ব্যক্তিই এর প্রতিষ্ঠাতা।

তবে মাধবের মতে এ-জন্য যে পতঞ্জলি অস্বীকৃত হয়েছেন তা নয়। তাছাড়া পথিকৃৎ হিসেবে কাউকে যে অস্বীকার করেছেন পতঞ্জলি তাও মিথ্যা। পতঞ্জলি তাঁর নিজের গ্রন্থকে বলেছেন 'অনুশাসন'। 'অনু অর্থ, আদি কোন ব্যবস্থার অনুসরণ। তিনি এ-কথা দাবি করেননি কখনও যে, তিনিই এ ব্যবস্থার উদ্‌ভাবক।

সাধনার ক্ষেত্রে যোগসূত্র যে কেন প্রয়োজন তা বুঝতে হলে পতঞ্জলির যোগসূত্রের দর্শন জানা দরকার। কারণ এই দর্শনের ভিত্তিতেই যোগসাধনার সার্থকতা।

যোগদর্শনের সঙ্গে আছে সাংখ্য দর্শনের একটি নিকটে আত্মীয়তা। উভয়েই প্রকৃতি ও পুরুষের উল্লেখ করেছেন একভাবে। বিশ্ব রহস্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দ্বৈতসত্তার কথা বলেছেন উভয়েই। এতে পুরুষ অর্থাৎ Spirit যে-কোন ভাবেই হোক না কেন প্রকৃতি অর্থাৎ Nature-এর মধ্যে গেছেন জড়িয়ে। কি ভাবে তা সম্ভব হয়েছে তার কোন ব্যাখ্যা

নেই। তবে এই দুই দর্শনের দার্শনিকেরাই এ ঘটনাকে ধরে নিয়েছেন সত্য বলে। বলেছেন যে, পুরুষকে অর্থাৎ **Spirit**-কে এই প্রকৃতি-জাল থেকে মুক্ত করা সম্ভব।

সাংখ্যকার ও যোগসূত্র লেখক উভয়েরই ধারণা যে, পরিণতিতে প্রকৃতি বেদনাময় যদিও সাধারণ মানুষ প্রকৃতির মধ্যেই আপাত গ্রাহ্য নানা সুখকর জিনিসের সন্ধান পান। উভয়েই বলেছেন, কি করে পুরুষকে এই বেদনাময় প্রকৃতি থেকে যুক্ত করা যায় সে-কথা। মুক্তির পরে পুরুষের অর্থাৎ **Spirit**-এর অবস্থা কি ধরনের হবে তা বলার জন্য তেমন মাথা ঘামাননি কেউই। উপনিষৎ বা বেদান্তের মত তারা পুরুষকে বলেননি 'এক'। প্রত্যেকেই বলেছেন বহু পুরুষের কথা। এই প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র পুরুষকেই স্বচেষ্টায় যুক্ত হতে হবে প্রকৃতিবন্ধন থেকে। প্রকৃতি বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পুরুষ বা পরমাত্মা লাভ করে এক অত্যাশ্চর্য স্বাতন্ত্র্য। প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন এই মুক্তি বা পুরুষের স্বাতন্ত্র্যকে বলা হয়েছে কৈবল্য। পুরুষ এখানে যে স্বাতন্ত্র্য লাভ করে তাতে শুধু যে প্রকৃতি থেকেই সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাই নয়, অন্যান্য মুক্ত পুরুষ থেকেও সে থাকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। এই মুক্তি বা স্বাতন্ত্র্যে পুরুষ বা পরমাত্মা ফিরে পান নিজস্ব পবিত্রতা ও আত্ম-জ্যোতি। বস্তু জালে জড়িত হয়ে তিনি যে সেই আবরণকেই সত্য বলে মনে করেছিলেন সেই ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হন।

পুরুষ এবং প্রকৃতি তত্ত্বে যারা বিশ্বাসী তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ভাবেন সে পুরুষ নয়, প্রকৃতিই পুরুষের আত্মজ্ঞান এলে তাঁর কাছ থেকে সরে যান। কারণ তাঁরা মনে করেন যে, পরমাত্মা বা পুরুষ নিজে কোন কর্মই করেন না কখনও। সুতরাং বন্ধন সৃষ্টি করার ক্ষমতা বা মুক্তি লাভ করার ক্ষমতা কোনটাই তাঁর নেই। কিন্তু কিছুসংখ্যক দার্শনিকের ধারণা যদিও এই রকম, অধিকাংশেরই ধারণা এই যে, পুরুষ নন কর্মক্ষমতাহীন। তাঁকেই সচেষ্টভাবে বন্ধন মুক্ত হয়ে ফিরে যেতে হবে স্বকীয় নির্ভেজাল সত্তায়।

প্রকৃতির জাল নানা রকমের। কখনও নিতান্ত স্থূল কখনও বা সূক্ষ্ম। প্রকৃতি এখন সূক্ষ্ম পর্যায়ে বিচরণ করতে পারেন যে, পরমাত্মা বা পুরুষেরও হতে পারে বিভ্রান্তি সৃষ্টি। তিনি ভাবতে পারেন যে, তাঁর চতুর্দিকে প্রকৃতির কোন বন্ধনই নেই আর। কিন্তু তখনও হয়তো তিনি প্রকৃতির জালেই রয়েছেন আবদ্ধ।

এই ধারণা থেকেই অনেকে অধ্যাত্ম সীমাবদ্ধতার মধ্যে বাস করেন। ভাবেন, পার্থিব বন্ধন জয় করেছেন। কিন্তু কার্যতঃ তা পারেন নি। প্রকৃতি যে-ভাবে পুরুষকে আবৃত করেন তা অত্যন্ত জটিল। প্রথমেই স্থূল রূপ নয়, প্রকৃতি আবরণ সৃষ্টি করেন বুদ্ধি বা মহতের। দ্বিতীয় আবরণ সৃষ্টি করেন অহংকারের ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের। এই একাদশ ইন্দ্রিয় হল পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মন। এরা শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাক্, পাণিপাদ, পায়ু, উপস্থ এবং মন নামে পরিচিত। এসব তিনি করেন নিজেকে পুরুষের যোগ্য করে তোলার জন্য। পুরুষকে তাঁর মোহিনী রূপে ভোলাবার জন্য। এর পরই তিনি আরম্ভ করেন তাঁর স্থূলরূপ তৈরির খেলা। স্থূল জগৎ তৈরি আরম্ভ হয় সূক্ষ্ম উপাদান দিয়েই প্রথম, যাকে বলা যায় তন্মাত্র। এই সূক্ষ্ম উপাদানের পরেই আসে স্থূল উপাদান—যাদের বলা হয়েছে মহাভূত। এই স্থূল জগৎ তৈরি হলেই পুরুষের চারদিকে তৈরি হয় এমন ঘন এক আবরণ যে, প্রকৃতির বাইরে এসে তার পক্ষে আর কিছুই দেখা সম্ভব হয় না তখন।

প্রকৃতির মধ্যেই থাকে তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজ, ও তম। থাকে গুণসাম্যে অর্থাৎ কেউ কারো গুণ প্রকাশ না করে স্থির হয়ে। এই তিন গুণ নিয়েই প্রকৃতি। প্রকৃতি এই গুণসাম্যে বিচলিত হয়ে ওঠে তখনই যখন তার মধ্যে এসে পড়ে পুরুষ। স্ত্রী ফুলের গর্ভকেশরে পুরুষ ফুলের রেণু এসে পড়লে সে যেমন তার পাপ্‌ড়ি গুটিয়ে নেয়, তেমনি গুণ-ক্ষোভে বিচলিত হয়ে প্রকৃতিও জড়িয়ে নেন পুরুষকে। তাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেন জটিল ফাঁদে। জড়িয়ে ধরেন তাঁকে উত্যক্ত করবার

জন্য প্রতিশোধ নিতে। জড়িয়ে ধরেই বুঝতে থাকেন পুরুষের চতুর্দিকে রয়েছে নানা ধরনের জাল। পুরুষও বুঝতে পারেন না যে, তিনি নিজেও জড়িয়ে পড়েছেন এই জালে। প্রথম জড়ায় সূক্ষ্ম জাল—যে জালের স্বরূপ বোঝা দুষ্কর। সেই সূক্ষ্ম জালকে নিজেরই অংশ বলে ভেবে নিয়ে পুরুষ হন নিশ্চিন্ত, কোন চেষ্টাই করেন না নিজেকে ছাড়াবার। স্তরে স্তরে তাঁর উপর পড়তে থাকে বন্ধনের বৃত্ত। পুরুষ ভাবেন তিনি যা ছিলেন তাই আছেন। বুঝতেও পারেন না যে, কঠিন জালের বন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত প্রকৃতিকেই ভাবতে থাকেন আসল যথার্থ সত্তা বলে। সাংখ্যযোগের এই যে ধারণা, এ ধারণা নয় বিজ্ঞানসম্মত। দুটো সত্তা যেন এ তত্ত্ব সত্য হলে অসংখ্য সত্তায় করতে বিচরণ থাকে। এ দুয়ের মধ্যে থাকে—সীমাহীন এক দেশ (space)। কারণ, তা না হলে সর্বত্রই যদি প্রকৃতি থাকত ব্যাপ্ত হয়ে, তাহলে পুরুষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখে চলা ছিল অসম্ভব। সেক্ষেত্রে তাকে থাকতে হত প্রকৃতির মধ্যেই। অকস্মাৎ অভিঘাতে তাঁকে চঞ্চল করার কোন প্রশ্নই আর থাকত না। বৈজ্ঞানিক বিচারে, তান্ত্রিক দৃষ্টিতে এ-তত্ত্ব হতে পারে না সত্য, তাহলে পুরুষ, প্রকৃতি ও দেশ বলে থাকতে হয় তিনটি জিনিস। সাংখ্য এবং যোগ কেউ বলেন নি এই ত্রিতত্ত্বের কথা।

কিন্তু তত্ত্ব নয়, আমাদের প্রয়োজন যোগসাধনা কেন, কি ভাবে আত্মাকে মুক্ত করতে চায় সেই সাধনার ধারার কথা জানা। তত্ত্বের দিক থেকে বেদান্তের তত্ত্বও সত্য। তন্ত্রের তত্ত্বও সত্য। দুইই বলে 'দুই' বলে কিছু নেই, ছিল না। 'এক'ই দুই রূপে প্রতিভাত। একই পুরুষ প্রকৃতি রূপে প্রকাশিত। নির্গুণ পুরুষ থাকেন তাঁর স্বকীয়তায়। তাঁর মধ্যে গুণ সঞ্চয় হলেই দেখা দেয় প্রকৃতি। যেন এক টুকরো গাছের বীজ। বীজের মধ্যে আকাঙ্ক্ষার বৃত্ত জাগরিত হলেই ফুলে ওঠে সৃষ্টির লক্ষণ। বীজ বীজ না থেকে শেষ পর্যন্ত পরিণত হয় মহাবৃক্ষে। কিন্তু শেষ পরিণতি আবার সেই বীজেই। সংকোচন ও বিকোচনের এই খেলা

চলেছে চিরকাল ধরে। সংকোচনের স্থির পর্যায়ে পুরুষ হল নিজস্ব, বিকোচনে প্রকৃতি। বিকোচনের সময় তিনি থাকেন কেন্দ্র হয়ে (Nucleus) নির্বিকার। সে যাই হোক, তত্ত্বের বিচার পরে। এবার দেখা যাক যোগ কি বলতে চায়।

যোগ বলতে চায়, পুরুষ ও প্রকৃতি দুটি চির পৃথক সত্তা। পুরুষ ধরা পড়েন প্রকৃতির বন্ধনে। এবং মুক্ত পুরুষ দুঃখ পান প্রকৃতিভুক্ত হয়ে। তাঁকে মুক্ত হতে হবে। এইজন্য বলা হয়েছে যে-প্রয়াসের কথা, তা-ই হল যোগসাধনার ধারা। পরমাত্মাকে, পুরুষকে প্রকৃতি বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য যোগ বলেছে তত্ত্বজ্ঞানের কথা, বিবেক-খ্যাতির কথা। যে উপায় দ্বারা অবিদ্যা নাশ করা যায় এবং বিবেক জাত যে জ্ঞান, যে জ্ঞান দ্বারা প্রত্যয় জন্মে, আমি আত্মা ছাড়া আর কিছুই নই, আমি প্রকৃতি থেকে ভিন্ন, এই ধরনের দৃঢ় জ্ঞানকেই বলা হয় বিবেকখ্যাতি। এই তত্ত্বজ্ঞান ও বিবেকখ্যাতির দ্বারা হয় ক্রমশঃ আত্মবোধ। যোগ অবশ্য এই তত্ত্বজ্ঞানের জন্য, বিবেকখ্যাতির জন্য, উপনিষদের মত যুক্তি জাল বিস্তার না করে দিয়েছে কতকগুলি নৈতিক কর্মের উপর জোর। এই নৈতিকতার ফলে প্রকৃতিজাত বস্তুই প্রকৃতির বিরুদ্ধে পরিণত হয়েছে ক্ষুরধার অস্ত্রে। তখন প্রকৃতির সাহায্যেই প্রকৃতিবন্ধন মুক্ত হয়ে আত্মা ফিরে পান তার নিজস্ব আত্মজ্যোতি ও পবিত্রতা।

আত্মা প্রকৃতির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে তিন ধরনের আবরণে জড়িয়ে পড়েন। এই আবরণে সামান্য মাত্র অবশিষ্ট থাকলেও আত্মার মুক্তি নেই। বস্তুদেহ আত্মাকে দেয় পার্থিব গুণ। মোহগ্রস্ত আত্মা তখন বিভ্রান্ত হয়ে তাকেই মনে করে অতীন্দ্রিয় সুখ বলে। আত্মার চতুর্দিকে যে বস্তু-কোষের সৃষ্টি হয় তাই ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আত্মার কাছে পৌঁছে দেয় বস্তুজগতের খবর। আত্মা সেই খবর পেয়ে মোহগ্রস্ত হয়। ক্রমশঃ বেশী করে প্রকৃতিতে আবদ্ধ হতে থাকে। ইন্দ্রিয়ে যে অভিঘাত সৃষ্টি হয় তাকে রূপায়িত করার চেষ্টা করে কর্মেন্দ্রিয়।

এর ফলে প্রকৃতি-জ্ঞান আরও বাড়ে। পার্থিব আনন্দবোধ জন্মায় আরও বেশী করে। স্থূল বস্তুদেহ থেকে সূক্ষ্মদেহে সেই বোধের সঞ্চার হতে থাকে। এই সূক্ষ্ম বস্তু হল অন্তঃকরণের, যার মধ্যে আছে মন, অহংকার ও বুদ্ধি। এই অন্তঃকরণের ত্রয়ী বন্ধন হল কঠিনতম বন্ধন। সেইজন্য যোগ বলেছে যে, আত্মাকে দেহ বলে ভাবলে ভুল হবে। তাকে ইন্দ্রিয়, মন, অহংকার বা বুদ্ধি বললে চলবে না। প্রকৃতির যে আবরণ বা কোষ আত্মাকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে তাকে ভেদ করে জানতে হবে তাঁর স্বরূপ। উপনিষদের সেই কথা বলেছে যোগসূত্রও— আত্মানং বিদ্ধি।

এখন প্রশ্ন হল আত্মাকে জানা যাবে কি করে? কেমন করে আমরা জানব যে, দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, অহংকার ও বুদ্ধি এ-সবের বাইরে আত্মা এক স্বতন্ত্র জ্যোতিষ্মান অস্তিত্ব? আত্মা যদি সচেতন হয়, তা থেকে যদি পার্থিব সত্তার জ্ঞান আহরণের উপাদানগুলি একে একে ঝরে যায় তাহলে পরম চৈতন্যের আর অবশিষ্ট থাকে কি? দেহ ছাড়া এবং মন বুদ্ধি ইত্যাদি ছাড়া আত্মা কাজ করবে কি করে? কি করে বুঝব যে, যদি পার্থিব সত্তার চৈতন্য-প্রবাহে সমস্ত উপাদানগুলিই শুকিয়ে যায়, মরে যায়; তাহলে আত্মার থাকে কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব? আত্মা সেখানে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে নাকি? যোগশাস্ত্র বলে যে, পার্থিব উপাদানগুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লেও আত্মা হয়ে যায় না অস্তিত্বহীন। সে তখন জ্বলতে থাকে নিজস্ব জ্যোতিতে। তখনই হয় বিবেকখ্যাতি। অনাত্মিক অর্থাৎ যা আত্মার অবিচ্ছেদ্য অংশ, নয় সেই প্রকৃতি নিষ্ক্রিয় হলে তবেই আত্মার নিজস্ব জ্যোতি ফুটে ওঠা সম্ভব। আত্মা যেন একখণ্ড পাথর। তার মধ্যে যে মূর্তি লুকানো আছে, তাকে কখনও দেখা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন শিল্পী অবান্তর অংশগুলিকে কুঁদে কুঁদে ফেলে দিচ্ছে। আত্মাকে আচ্ছন্ন করে থাকে প্রকৃতির এই অবান্তর অংশ। যোগশাস্ত্র এই অবান্তর অংশকে ফেলে দেবার হাতুড়ি বাটালির কাজ করে। এই কাজ হলে তখনই দেখা

দেয় প্রজ্ঞা। তবে এক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকে এই যে, তাহলে আত্মার সেই নির্ভেজাল অস্তিত্বের স্বরূপ কি? দেহসম্পন্ন কোন মানবের পক্ষেই বোধ হয় তা বলা অসম্ভব। যোগের লক্ষ্য আত্মার নিজস্ব সত্তায় তাকে অবস্থান করতে সাহায্য করা। এটা করতে হলে তার চতুর্দিক থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে প্রকৃতির আচ্ছাদন। কি ভাবে তাকে সরানো যায় যোগসূত্র বলেছে সে কথাই। যে পথে তাকে সরানো যায় তা নয় খুব সহজ পথ। স্তরে স্তরে কঠিন সংগ্রাম করেই সেই পদ্ধতিকে করতে হয় আয়ত্ত। এজন্য প্রয়োজন কঠিন নিয়মানুবর্তিতা। দেহবুদ্ধিকে অত সহজে দমন করা যায় না।

যে কঠিন দেহবুদ্ধির বিরুদ্ধে এই সাধনা, তার স্বরূপ না জানলে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যাবে কি করে? সুতরাং পার্থিব দেহের চেতনা কি জিনিস, জানতে হবে। শত্রুকে ঘায়েল করতে হলে শত্রুর চরিত্র আগে জানা দরকার। পার্থিব সত্তা যার মাধ্যমে জানে তাকে বলা হয়েছে চিত্তবৃত্তি। এই চিত্তবৃত্তির মধ্যে আছে পঞ্চ বায়ু, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং অহংকার ও বুদ্ধি। চিত্ত দু ধরনের—কার্যচিত্ত ও কারণ-চিত্ত। কার্য-চিত্ত প্রকৃতি দ্বারা সীমাবদ্ধ। এর দ্বারা প্রকৃতিবিমুক্ত পুরুষের স্বরূপ জানা অসম্ভব। কারণ-চিত্তকে বলা হয়েছে বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপী। এ হল মনের মৌলিক অবস্থা। যোগসাধনার ধারায় যায় মনের এই সর্বব্যাপকত্ব অর্জন করা, বিভু অর্জন করা।

যোগীকে প্রথম যথার্থ সমস্যার মুখে আসতে হয় চিত্তের ব্যাপারে। চিত্তের গড়ন সব মানুষের ক্ষেত্রে নয় এক ধরনের। এক একজনের মধ্যে এক এক রকম। ফলে কারো পক্ষে সহজে কারণ-চিত্ত পর্যায়ে যাওয়া সম্ভব হলেও অপর একজনের পক্ষে এই সর্বব্যাপী চিত্তের সন্ধান পাওয়া হয়ে দাঁড়ায় কষ্টসাধ্য। এ পার্থক্যের কারণ প্রারব্ধ বা প্রাক্তন কর্ম। যার যেমন কর্ম, যেমন সুকাজ, যাঁর আছে সুকৃতি, তিনি খুব একটা চেষ্টা না করলেও হতে পারেন কারণ-চিত্তময়। যেন কর্দমমুক্ত পুকুরের জল। একটু নাড়া পড়লেও তেমন ঘোলাটে হয় না। একটু

পরেই কাদা নিচে পড়ে জল আবার টলটল করে। আবার কোন চিত্ত কর্দমাক্ত জলাশয়ের মত। সংসারের কাঠি একবার সেই জল নাড়িয়ে দিলে জলের কাদা সহজে তলাতে গিয়ে জমতে চায় না। এই কাদাই হল প্রারব্ধ বা সংস্কার বা বাসনা। জন্ম জন্মান্তরের বাসনার স্তর পড়ে চিত্ত এত জটিল হয়ে থাকে:যে, সে জট ছাড়ানো অতি দুঃসাধ্য। এ-জন্য যোগসাধনাও সবার জন্য একরকম নয়। পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা। বাসনার প্রকৃতি অনুসারেই হয় মানুষের দেহের গঠন। এক জীবনের সঞ্চয় তো বাসনা নয় যে, তার স্বরূপ জেনে এক জীবনের সাধনাতেই তাকে যাবে উৎপাটিত করা! সুতরাং যোগীকে যেমন জ্ঞাত বাসনার বিরুদ্ধে তৈরি করতে হবে নিজেকে, তেমনই তৈরি করতে হবে অজ্ঞাত বাসনার বিরুদ্ধেও। জ্ঞাত মনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উৎপাটিত করলেই চলবে না, অজ্ঞাত মনের নেশা আকাঙ্ক্ষার বা বাসনার খবর রাখতে হবে। পাকা চুল তোলার মত ধৈর্য ধরে হাতড়ে বেড়াতে হবে আপন চিত্তের গহন অন্ধকারে। এক এক করে সমূলে তুলে ফেলতে হবে এই বাসনাগুলিকে। তাদের পুড়িয়ে ফেলতে হবে বিবেকের আগুনে।

যোগ হল চিত্তবৃত্তি-নিরোধ। বাসনা লালিত চিত্তের সমস্ত কার্য-কলাপ বন্ধ করতে হবে এই যোগের সাহায্যে। জন্ম-জন্মান্তরের বাসনা যেন একটি গাছের তলায় জড়িয়ে থাকা অসংখ্য বীজ। এর কোনটা বা চারা হয়ে দেখা দিয়েছে, কোনটা দেয়নি। চারা গাছ-গুলিকে তুললেই যে হল, তা নয়। দেখতে হবে কোথাও কোন বীজ পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে কি না। যোগের লক্ষ্য সেই গভীর চিত্তে যেখানে রয়েছে সুপ্ত বাসনার বীজ। যোগীকে হতে হবে কেবলিন। দৃশ্য শত্রুকে জয় করলেই তাকে চলবে না, অদৃশ্য শত্রুর দিকেও যেতে হবে আক্রমণ নিয়ে এগিয়ে। যিনি এটা পারেন তিনিই অর্হত। এইজন্য যোগের মধ্যে আছে নানা সমাধি ও ভূমির উল্লেখ। আক্রমণ যেমন আত্মরক্ষার বড় উপায়, তেমনি যোগীকেও জয় করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকলেই চলবে না থাকতে হবে আক্রমণ উদ্যত করেই।

চিত্তই বড় শত্রু, বড় প্রতিবন্ধক, চিত্ত পাঁচরকম যথা ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, মূঢ়, একাগ্র, নিরুদ্ধ। ক্ষিপ্ত চিত্ত উন্মাদ। কিন্তু ক্রোধ বিক্ষিপ্ত চিত্ত দুর্বল ও চঞ্চল। এই চিত্র ইচ্ছা করে অনিত্য সুখভোগ। অহংকার ও কামনাপুষ্ট হল মূঢ়চিত্ত। লক্ষ্যে স্থির হল একাগ্র চিত্ত। নিরুদ্ধ চিত্ত হল স্বজ্ঞাত চিত্ত অর্থাৎ অনুভূতি দ্বারা যা জ্ঞান সঞ্চয় করে অর্থাৎ নিরলম্ব স্থির চিত্ত। যার চিত্ত যেরকম, সাধনার পথে তার জন্য ব্যবস্থাও সেরকম।

চিত্তের বা মনের চিন্তারও আছে নানা পদ্ধতি, যেমন, পঞ্চচিত্তবৃত্তিঃ প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। নানা ভাবেই এর চিন্তা এত বিভ্রান্তিকর যে, কোন্ চিন্তা সত্য পথে চলছে, কোন্ চিন্তা মিথ্যা পথে। বোঝা দুষ্কর। যথার্থ চিন্তা হল প্রমাণ, ভ্রান্ত চিন্তা বিপর্যয়, অনুচ্চারিত চিন্তা বিকল্প, এবং স্বপ্নে নিদ্রামগ্ন চিন্তাকে বলে নিদ্রা। ঘটিত ঘটার স্মরণরূপ যে চিন্তা তাই হল স্মৃতি। এ-সব চিন্তাই আত্মাকে করে বিভ্রান্ত। কারণ এ-সব চিন্তা দ্বারা শুধুমাত্র প্রাকৃত বিষয় সম্পর্কেই জ্ঞান হতে পারে। এ সব চিন্তার সবই রুদ্ধ করতে হবে যদি পুরুষকে পেতে হয় আপন স্বরূপ। এই সব চিন্তার পথ রুদ্ধ করে বলেই যোগের নাম চিত্তবৃত্তিনিরোধক।

প্রাকৃত জ্ঞানের পথ রুদ্ধ করতে হবে কেন? এর কারণ এই যে প্রাকৃত জ্ঞান আসে সেই সবের মাধ্যমে যা নিজেরাই সত্য নয়, অধ্যাত্ম নয়। প্রাকৃত জ্ঞান তখনই হয় যখন জ্ঞানময় অথচ নির্গুণ অর্থাৎ নিষ্কর্ম পুরুষ অজ্ঞান অথচ এসেছেন কর্মক্ষম প্রকৃতির সান্নিধ্যে। পুরুষের সংযোগ প্রকৃতি এগিয়ে চলে ক্রমাভিব্যক্তির পথে। বুদ্ধি, অহংকার ও মনকে যদিও মনে হয় না বাস্তগ্রাহ্য বলে তবুও কিন্তু সূক্ষ্মভাবে তারা বস্তু দ্বারাই তৈরি। প্রকৃতির ক্রমবিকাশের কয়েকটি পর্যায় মাত্র তারা। সূক্ষ্ম পর্যায়ে মনে হয় তারা বস্তুগুহ্য নয়। বরং আত্মিক। পুরুষের সমগোত্রীয় পুরুষ এখানেই ভুল করে। প্রকৃতিকে নিজের গুণবলে ধরে নিয়ে প্রকৃতির মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। ভিন্নমতে পুরুষ প্রতিফলিত হয় বুদ্ধিতে আবার প্রকৃতিও প্রতিফলিত হয় পুরুষের মধ্যে।

প্রকৃতির এই আত্মিক অবস্থার সঙ্গে পুরুষ নিজেকে ভাবতে থাকে একাত্ম বলে। বুদ্ধিকে নিজের বলে ধরে নিয়ে পুরুষ যে ভুল করে ত এই রকম : যেন বীচিমালাতোলা কোন জলাশয়। সেখানে কেউ যেন তার মুখ দেখছে। ছোট ছোট ঢেউ কখনও তার স্পষ্ট করে তুলে ধরে আবার কখনও করে দেয় অস্পষ্ট। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ ছোট ছোট ঢেউ তোলা জলাশয়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে মনে করে যেন সেই নাচছে, অথচ সে আছে স্থির হয়ে। পুরুষও এই ভুল করে। নিজের স্থির চরিত্রকে সে-ভাবে কর্মচঞ্চল বলে। প্রকৃতির সূক্ষ্ম উপাদান দিয়ে গড়া বুদ্ধিকে সে যদি নিজের বলে না ভাবত, তাহলে এই ভ্রান্তি হত না। তাহলে তার বুঝতে অসুবিধা হত না যে, সে স্থির। তার মধ্যে নেই কোন চাঞ্চল্য। এ হল সাংখ্য এবং যোগ দর্শনের কথা, একালের বিচার বিশ্লেষণের কথা নয়। একালের হলে প্রশ্ন উঠত। যে পুরুষের চিত্তবৃত্তি নেই সে ভাববে কেমন করে? কিন্তু সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। তা ছাড়া পুরুষকে নিজের চেষ্টায় যদি প্রকৃতিবন্ধন থেকে মুক্ত হতে হয় নিষ্কর্ম ও নির্গুণ-পুরুষ সে চেষ্টা করবেই বা কি করে? কিন্তু সে সব বিচার বিশ্লেষণ এখন থাক।

পুরুষের কর্মক্ষমতা নেই। তবে যোগের ধারণা, নির্ভেজাল চৈতন্যের জাগরণ কোন কর্ম দ্বারা হয়ও না। সুতরাং প্রকৃতিকেও স্বরূপ বোঝার জন্য করতে হয় না কোন কাজ। যোগ বলেছে ধ্যানের কথা যে-ধ্যানে সকল কর্মক্ষমতাকে দুর্বল করে ফেলতে হয়। কর্মক্ষমতা অর্থাৎ প্রকৃতি যদি নিশ্চল হয়ে পড়ে তখন পুরুষ আপনা থেকেই বিরাজ করতে থাকেন নির্মল চৈতন্যে। প্রকৃতি হল চক্র। তার কেন্দ্র হল পুরুষ। চক্র ঘুরছে বটে, কিন্তু কেন্দ্র রয়েছে নির্বিকার স্থির। পুরুষ কর্মগুণহীন, নির্গুণ, কিন্তু তবু তিনিই প্রকৃতির কেন্দ্র হিসেবে তাকে বিবর্তিত করছেন। পুরুষের এই যে নির্গুণ স্থির অবস্থা মাত্র একাগ্রতা দ্বারাই সেই স্থির অবস্থার কাছে যাওয়া যায়। যোগ-ব্যবস্থা সেই একাগ্রতার পথেই নিয়ে যায় সাধককে।

চিত্তবৃত্তির মধ্যে একটি হল ক্লিষ্ট ও আর একটি অক্লিষ্ট। একটি হল প্রকৃতির ঘাতে সংঘাতে ক্লান্ত, আর একটি হল এসবের উর্ধ্বে অবিচলিত। ক্লেশযুক্ত চিত্তকেই বলে ক্লিষ্টচিত্ত। এই ক্লেশ পাঁচ ধরনের : –মনোবেগ থেকে জন্মলাভ করে, যেমন, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। ক্লিষ্ট চিত্তবৃত্তি অবিদ্যার দিকে ঠেলে দেয়। অক্লিষ্ট বৃত্তিই শুধু প্রজ্ঞার দিকে পরিচালিত করে। অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা থেকেই আসে ভ্রান্ত ধারণা অস্মিতা। অস্মিতা থেকেই আসে রাগ অর্থাৎ যার ফলে মিথ্যাকে সত্য বলে প্রতীয়মান হয়। আসে দ্বেষ, অর্থাৎ যার ফলে বেদনাদায়ক জিনিসকে মনে হয় আনন্দদায়ক। আসে অভিনিবেশ অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী জিনিসকে স্থায়ী বলে ভ্রান্ত ধারণা। এই অস্মিতা দেয় দৈহিক আনন্দকে আত্মিক আনন্দ বলে বিশ্বাস। অসত্যকে দেয় সত্য বলে ধারণা।

যোগসাধনা করতে যাবার আগে এই কারণেই যোগদর্শনের দরকার। কারণ, এ দর্শন জানা না থাকলে কার উদ্দেশ্যে দেহকে করতে হবে নিয়ন্ত্রিত? প্রকৃতি ও পুরুষের যথার্থ স্বরূপ বোধ হলে পাপপুণ্য বোধেরও লয় হবে। পাপপুণ্য তো প্রাকৃত জিনিস। অতিপ্রাকৃত সত্য নয়। এ হল তুলনামুলক জগতের কথা। সেই অতুলনীয় একের কথা এ নয়। তবে পাপপুণ্য বোধ অবলুপ্ত হয়ে গেলেই যে সব হয়ে গেল, তা নয়। অবচেতন বা অচেতন বলে আশা আকাঙ্ক্ষা সুপ্ত থাকে। শাস্ত্রে একে বলা হয়েছে প্রসুপ্ত বাসনা। কেউ কেউ বলেছেন কর্মাশয়, অর্থাৎ যেখানে কর্ম সঞ্চিত থাকে। সমূলে এ-সবকে উৎপাটিত করতে না পারলে কোন লাভ নেই। যোগসাধনায় এ সবের উর্ধ্বে ওঠার জন্য, মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তির বাইরে যাবার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। মানুষ স্বভাবতই চায় চিরকাল বেঁচে থাকতে। ধ্বংস হতে চায় না কেউই। সুতরাং অভিজ্ঞতার সংগ্রহশালায় যা কিছু সঞ্চিত হয়েছে কোন কিছুই সে ছাড়তে চায় না। আশা আকাঙ্ক্ষারূপে এসবই তার নিজের অজ্ঞাতসারে থেকে যায় মনের কোন গোপন স্তরে। এ-জন্য

সে দেবত্বের স্তরে উন্নীত হতে চায় না। কারণ সেখানে তার দেহ থাকবে না, সে হবে বিদেহলীন প্রকৃতিলীন! তবে মানুষের মধ্যে থেকে মানুষকে দেবতা করা সম্ভব হলে সে তাতে রাজি আছে, 'ভাষা ও ছন্দে' কবিগুরুর সেই ব্যাখ্যার মত :

'দেবতার স্তবগীতি দেবেরে মানব করি আনে,
গড়িব দেবতা করি মানুষেরে মোর ছন্দে গানে।'

মানুষের প্রাকৃত সত্তার প্রতি এই আকর্ষণ থাকে বলেই মরে গেলেও সংস্কার রূপে তার মধ্যে থেকে যায় প্রাকৃত সত্তার আশা আকাঙ্ক্ষাগুলি। সেই জন্যই আবার তার পুনর্জন্ম। জন্ম মানেই বন্ধন। ব্রাহ্মণ্য হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন সবাই তাই পুনর্জন্ম রোধ করার জন্য ব্যস্ত হয়েছে। আর এ-জন্য সবাইকে শেষ পর্যন্ত হতে হয়েছে যোগেরই দ্বারস্থ। তন্ত্র সাধনা, যার বিশ্বরহস্য সম্পর্কিত ধারণা যোগসূত্রের ধারণার চাইতে পৃথক সেও উপস্থিত হয়েছে এই যোগব্যবস্থার দুয়ারে। তবে দেহকে সুন্দর ও নীরোগ রাখার জন্য, যৌবনকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য যে দেহ মোচড়ানো সে যোগ অধ্যাত্ম যোগ নয়। অধ্যাত্মমুক্তির জন্য চাই মনের যোগ আগে। যোগ তাই বলেছে, অধ্যাত্মমুক্তি পেতে হলে আগে চাই মনের বৈরাগ্য। বৈরাগ্য মানে মনের মধ্যে যে-কোন পার্থিব জিনিসের প্রতি নিরাকর্ষণ ভাব। সেটা হঠাৎ হবার নয়। সে জন্য প্রয়োজন অনুশীলন। যাকে যোগশাস্ত্রে বলা হয়েছে অভ্যাস, অভ্যাস যোগ। অভ্যাস যোগ দ্বারা নিরাকর্ষণ ভাবকে যদি প্রবলতর করা যায়, তাহলে হওয়া যায় দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয়, অর্থাৎ দৃষ্ট বা প্রতীত বিষয়সম্পর্কে মোহমুক্ত হওয়া। পার্থিব অর্থে যাকে বলে মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা মৈথুন, ইত্যাদির লোভও ত্যাগ করা যায়, যোগবলে। এজন্য প্রথম দরকার আবেগ দমন। কোন বস্তুর প্রতি আকর্ষণ থাকলে না দেখলেই যে তাকে অস্বীকার করা যাবে তা নয়। মনে যদি আকাঙ্ক্ষা থাকে তার প্রতিচ্ছায়া সত্তার দুয়ারে হানা দিতে থাকবেই। এ-জন্য প্রথম দরকার ইন্দ্রিয়কে অকেজো করা। এই যে ইচ্ছা তাকে বর্ণনা করা হয়েছে

যতমান বলে। এর পরেই হল ব্যাতিরেক পর্যায় অর্থাৎ কোন্ কোন্ বিষয়ে নিরাকর্ষ ভাব এসেছে, কোন্ কোন্ বিষয়ে আসেনি তা জানা। তার পরেই একেন্দ্রিয় ভাব, যেখানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা আর থাকবে না। স্থুলবস্তু দেহকে কোন কিছু উত্তেজিত করতে পারবে না। তবে এ-সময়ও আশা আকাঙ্ক্ষা চিন্তা ভাবনার তলানিটুকু থেকে যায় মনের মধ্যে। এই পর্যায়কে অতিক্রম করতে পারেন তবেই হওয়া যায় দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয়। তখনই হয় বশীকার ভাব, অর্থাৎ স্থুলজগতের আশা আকাঙ্ক্ষা পদে ঘটে ছেদ। আসে শাস্ত্রমতে অপর বৈরাগ্য। চূড়ান্ত নিরাকর্ষণ ভাব আসে এর পর যাকে শাস্ত্রে বলা হয়েছে পরবৈরাগ্য। এ অবস্থায় আত্মজ্ঞান হলে হয় ত্রিগুণাতীত ভাব, উঠা যায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণেরও উর্ধ্বে। তবে এই আত্মজ্ঞান লাভ প্রকৃতির অভিঘাতে চঞ্চল হয়ে উঠতে না পারে কখনও সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। . চৈতন্যকে রাখতে হবে অবিপ্লবা করে। অর্থাৎ আর যাতে তার মধ্যে কোন চাঞ্চল্য সৃষ্টি না হতে পারে। তবেই সম্ভব মুক্তিলাভ।

মনের আবেগকে যত দমন করা যাবে ততই আত্মার উর্ধ্বগতি হবে। বস্তুজগতে জ্ঞানের জন্য চাই তিনটি জিনিস গ্রহীতৃ, অর্থাৎ যিনি জানবেন। গ্রহণ অর্থাৎ জানবার পদ্ধতি এবং গ্রাহ্য অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বিষয়। চিত্তবৃত্তি সব সময়েই চায় গ্রাহ্য বিষয়ের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করতে। এ হলে মুক্তি নেই কখনও। মিথ্যা বিষয়ের সঙ্গে একাত্ম হলে হয় চির তমসা। সুতরাং সত্য কি তা জানতে হবে। তারই উপর করতে হবে চিত্তবৃত্তিকে একাত্ম। মনের স্বভাবই হল এই যে, সে যা চিন্তা করে তার সঙ্গেই একাত্ম হতে চায়। সত্য চিন্তা করলে সে হবে সত্যের সঙ্গেই একাত্ম। এই জন্যই বেদান্ত বলেছে, ব্রহ্মণকে যিনি জেনেছেন তিনি হয়েছেন স্বয়ং ব্রহ্মণ।

যোগশাস্ত্র বলে যে, বস্তুজগতে মনকে কোন একটি বিষয়ের দিকে নিবিষ্ট করলেই স্বরূপশূন্য ভাব আসে, অর্থাৎ বিষয়ময় হওয়া যায়।

কিন্তু কোন বিষয়বিহীন অবস্থার সঙ্গে মনকে একাত্ম করানো যায় কি ভাবে? এই বিষয়হীন মনের অবস্থাকে বলা হয়েছে বীতরাগবিষয়। যোগশাস্ত্র বলেছে, স্বপ্ন ও নিদ্রাকে মনে রাখ। স্বপ্নে বাহ্য জগৎ থাকে না থাকে শুধু তার অন্তরের প্রতিচ্ছবি। গভীর নিদ্রায় কিছুই থাকে না। বস্তুছাড়া মানসিক বস্তুতে মনকে নিবিষ্ট করতে শেখ। তারপর নির্বিকার গভীর নিদ্রাকে আদর্শ করে মনকে ঠেলে দেবার চেষ্টা কর শূন্যতার মধ্যে। ধীরে ধীরে দ্বৈতভাব কেটে গিয়ে হতে পারবে কেবলিন।

কিন্তু মনকে শূন্যতার মধ্যে নিয়ে যাওয়া যাবে না একবারেই। কি ভাবে তাহলে তাকে বাঁধতে হবে? কি ভাবে তাকে একমুখী করতে হবে? প্রকৃতির মধ্যে থেকে প্রকৃতিকে উপেক্ষা করা যাবে কি ভাবে? বিষে যেমন বিষক্ষয় হয় যোগশাস্ত্রের মতে প্রকৃতি দিয়েই তেমন জয় করতে হবে প্রকৃতিকে। যোগ এজন্য বলেছে সবিতর্ক সমাধি ও নির্বিতর্ক সমাধির কথা। সবিতর্ক সমাধিতে রাখতে হবে বস্তুর ঘন প্রতিচ্ছায়াকে মনের মধ্যে একটা লোকই হোক বা ফুলের টবই হোক মনকে স্থাপন করতে হবে তার মধ্যে। এমন করে স্থাপন করতে হবে যাতে বস্তু, শব্দ অর্থ সব একাকার হয়ে যায়। অভিজ্ঞতা শুধু মানসিক হবে না, হবে এখন ঘনীভূত অভিজ্ঞতা যাকে বলা যাবে বাস্তবিক। দ্বৈত তখনও থাকবে। আমার মন দেখছে অন্য আর কিছুকে, থাকবে এই দ্বৈত ভাব। এই অবস্থাতে মন যখন বস্তুর শব্দ ও অর্থকে দেখবে তার সঙ্গে এক করে, যখন মন সরাসরি অনুভব করবে বস্তুকে, এজন্য দরকার হবে না শব্দের বা অর্থের, এবং বস্তুর সঙ্গে হবে আত্মিক একতা, থাকবে না কোন রকম দ্বৈত, তখন আসা যাবে নির্বিতর্ক সমাধির পর্যায়ে। শব্দ অনেক সময় বস্তুর যথার্থ স্বরূপকে আবৃত করে রাখে, অনেক সময় ভ্রান্তি সৃষ্টি করে বস্তু সম্পর্কে। এর ফলেই আসে মনের বিকল্প পর্যায়। সুতরাং বস্তুকে যথার্থ বুঝতে হলে উঠতে হবে তার শব্দ ও অর্থগুণের উর্ধ্বে। জানতে হবে শব্দার্থহীন

স্তুর যথার্থ স্বরূপ। বোবারা যেমন করে বোঝে বুঝতে হবে তেমন করে। এমন করে বুঝতে শিখলেই পার হওয়া যাবে সবিকল্প অধ্যায়। নির্বিকল্প সমাধির পর্যায়ে আসা যাবে এর পরেই।

কিন্তু এই নির্বিতর্ক সমাধির মধ্যেও থাকে মূল প্রকৃতির ছায়া। যোগীকে উঠতে হবে এরও উর্ধ্বে। প্রথমতঃ স্থূল প্রকৃতির উর্ধ্বে প্রকৃতির সূক্ষ্ম উপাদানকে আশ্রয় করতে হবে যাকে বলা হয়েছে তন্মাত্র। এই তন্মাত্র বিষয়ে মনোনিবেশ করতে গেলেও প্রথম দিকে অসুবিধা তৈরি করে শব্দ ও অর্থ। তারপর ধীরে ধীরে প্রতিবন্ধকতা পার হয়ে বস্তুর সূক্ষ্ম উপাদানকে লক্ষ্য করা যায় তার স্বরূপে। তন্মাত্রের ক্ষেত্রে মনের এই ক্রমোন্নতির পর্যায়কে বলা হয়েছে সবিচার ও নির্বিচার পর্যায়। অর্থাৎ চিন্তামূলক ও অতিচিন্তামূলক পর্যায়।

যোগীর যোগসাধনার ধারা স্থিতধী হলে তিনি বস্তুর তন্মাত্রকে সরাসরি জানতে পারেন সবিচার সমাধিতে যোগীরা এই তন্মাত্রকে দেখেন অণু হিসেবে। এই অণুকে বলা হয়েছে ত্রসরেণু অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র দৃষ্টি-যোগ্য আকৃতি। শুধু এই ত্রসরেণু নয়, দেশ, কাল, বায়ু, মন সব কিছুকেই তারা এই সময় দেখতে পান সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে সবিতর্ক জ্ঞানে জানা যায় প্রত্যক্ষভাবে, সবিচার জ্ঞানে জানা যায় পরোক্ষভাবে। তবে যোগী পুরুষের কাছে উভয় ক্ষেত্রেই জ্ঞান হয় প্রত্যক্ষ। নির্বিচার পর্যায়ে যোগীপুরুষ শব্দ অর্থহীন তন্মাত্রকে অনুভব করতে পারেন।

অধ্যাত্ম সত্যের জন্য এ-সব পর্যায়ও কোন পর্যায় নয়। যোগীকে উঠতে হবে আরও উর্ধ্বে আনন্দ পর্যায়ে। তাকে বুঝতে হবে যে, প্রকৃতির স্থূল ও সূক্ষ্ম অবস্থার কোনটাই সত্য নয়। তাঁকে যেতে হবে 'সমাপত্তি'র পর্যায়ে, অর্থাৎ যেখানে শুধুমাত্র থাকবে লক্ষিত বস্তুই, আত্মবোধ থাকবে না। এগিয়ে যেতে হবে আরও। উঠতে হবে আরও সূক্ষ্মতর পর্যায়ে। দেখতে হবে, আত্মবোধের সামান্যমাত্র ইঙ্গিতও সেখানে পাওয়া যায় কিনা। এই সূক্ষ্মতর পর্যায়ে প্রকৃতি প্রতীয়মান

হবে তার সর্বাধিক সূক্ষ্মতায়। যোগীর ধ্যাননেত্রে বিশেষ কোন বস্তু হিসেবে সে থাকবে না। রজঃ ও তমোগুণপূর্ণপ্রধান বস্তু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এর ফলে অহংকার ও বুদ্ধিপ্রসূত যে জ্ঞানেন্দ্রিয় সেই জ্ঞনেন্দ্রিয় আসবে সত্ত্বগুণের অধীনে। যোগী পুরুষ বস্তুর তন্মাত্র ছেড়ে প্রবেশ করবেন আত্মার আপন জগতে। তিনি লাভ করবেন সানন্দ সমাধি। তবে তখনও যে তিনি সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতিমুক্ত হবেন তা নয়। তখনও তাঁর সঙ্গে থাকবে প্রকৃতিজাত বুদ্ধি। সানন্দ সমাধিতে যোগী হন জ্ঞানের উপায়ের সঙ্গে একাত্ম। সবিতর্ক ও সবিচার জ্ঞানে হয় গ্রাহ্যের সঙ্গে গ্রহীতৃর একাত্মবোধ। তবে প্রকৃতির সঙ্গে সূক্ষ্ম সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও একে যে আনন্দ পর্যায় বলা হয়েছে কেন সেটা ভাববার বিষয়। বস্তুজগতের জ্ঞানের সঙ্গে যে রাগ দ্বেষ যুক্ত, সূক্ষ্মমনে যার তলানিটুকু থেকেই যায়। আনন্দ পর্যায়ে কি তাকেও অতিক্রম করা যায়? তা যদি না হয় তাহলে আত্মার ক্লিষ্ট পর্যায়ের সঙ্গে পঞ্চ পদ্ধতির সমাধির কিছু না কিছু সম্পর্ক থেকেই যাবে (ক্লিষ্ট পর্যায়—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ : পঞ্চ সমাধি : সবিতর্ক, নির্বিতর্ক, সবিচার, নির্বিচার ও সানন্দ)। সবিতর্ক ও সবিচার সমাধির সঙ্গে যুক্ত থাকে অভিনিবেশ (ক্লিষ্টের একটি অংশ)। সানন্দের সঙ্গে থাকে রাগ ও দ্বেষ (ক্লিষ্টের দুটি পর্যায়)। সাস্মিত ও অসম্প্রজ্ঞাতের সঙ্গে যুক্ত থাকে অস্মিতা ও অবিদ্যা। সুতরাং সানন্দ পর্যায়েও বন্ধনের তলানিটুকু থেকেই যায়, সর্বাংশে মুক্তি পাওয়া যায় না। ব্যক্তি-বোধের সামান্যতম অবশিষ্ট থাকলেও আত্মজ্ঞান সম্ভব নয়। সম্পূর্ণভাবে আত্মবোধকে মুছে ফেলতে হবে।

সাস্মিত সমাধি সানন্দ পর্যায়ের পরে। সানন্দ সমাধিতে আছে চেতনাবোধের সঙ্গে একাত্ম হবার চেষ্টা, বস্তু এখানে অপ্রয়োজনীয়। আত্মার নিজস্ব অবস্থার দিকে সানন্দ সমাধিতে অগ্রসর হওয়া যায়। লক্ষ্য হিসেবে প্রাকৃত বস্তুর কিংবা তার সূক্ষ্ম তন্মাত্রেরও কোন প্রয়োজন থাকবে না। কিন্তু মনে হয় না এ ধরনের বর্ণনা আনন্দের প্রতি যথাযথ

সম্মান প্রদর্শন করেছে। তবু বাচস্পতি মিশ্রের মত লোকও চেষ্টা করেছেন একে সমর্থন করবার। তিনি একে বলেছেন—জ্ঞানপদ্ধতির সঙ্গে একাত্মতা।

কিন্তু যোগী এখানেই থামেন না। তিনি আরও এগিয়ে যান। তিনি বস্তু ও জ্ঞানপদ্ধতি সব কিছুকেই অতিক্রম করে পরমাত্মার নির্ভেজাল চৈতন্যে নিজেকে নিবিষ্ট করতে পারেন। আমরা দেখেছি যে, সানন্দ সমাধিও প্রকৃতি মুক্ত নয়। কারণ এখানেও পুরুষপ্রকৃতি-জাত বুদ্ধির দর্পণেই সবকিছু প্রতিবিম্বিত। বুদ্ধির পর্যায়ে প্রকৃতি এত সূক্ষ্ম যে, পুরুষ সেখানে 'আমিত্ব' থেকে তাঁর যথার্থ 'আমি'কে মুক্ত করতে বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। প্রকৃতিজাত বুদ্ধি এত সূক্ষ্ম আকার ধারণ করতে পারে এই কারণে যে, তখন প্রকৃতির মধ্যে শুধু থাকে সত্য গুণেরই প্রাধান্য। বুদ্ধি ও অহংকার মিলেমিশে কাজ করে এমনভাবে যে, এতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ স্বতন্ত্র অস্তিত্বে নিজেকে চিন্তা করলেও সহজে সে বুঝতে পারে না সেই স্বাতন্ত্র্যের কথা। বুদ্ধিই প্রকৃতিকে দেয় বুঝবার ক্ষমতা। এই বুদ্ধি না হলে প্রকৃতি থাকত অব্যক্ত। এই বুঝবার ক্ষমতাই জন্ম দেয় অহংকারের। অহংকার বুঝবার ক্ষমতাকে চালনা করে স্বাতন্ত্র্যের পথে। করে আমিত্বের ভিত্ রচনা। সাস্মিত সমাধিতে পুরুষ ব্যক্তি-জ্ঞান ও চেষ্টার উপরই জোর দেয়। এ জোর দেয় এই ব্যক্তিজ্ঞান ও চেষ্টাকে অতিক্রম করার জন্যই। সাস্মিত সমাধিতে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আত্মবোধও প্রকৃতিযুক্ত। যোগী বুঝতে পারেন যে প্রকৃতি-জাত বুদ্ধি ও অহংকারের দর্পণে পুরুষ নিজেকে দেখে 'আমি' হিসেবে। তবে এই আমিত্ব অতিক্রম করা অত্যন্ত দুরূহ। বুদ্ধি ও অহংকার বিরাজ করে এত সূক্ষ্মভাবে যে, পুরুষের পক্ষে তাকে প্রকৃতি বলে সনাক্ত করাই কঠিন। যোগী পুরুষরা এখানে এসেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থেমে যান। তাঁরা আরও উচ্চ লক্ষ্যকে ধারণার মধ্যেই আনতে পারেন না। এইজন্য যোগসূত্র বলেছে দু ধরনের সাধকের কথা, বিদেহ-লীন ও প্রকৃতিলীন। উভয়েই ভবপ্রত্যয় শ্রেণীর। এই ভবপ্রত্যয়

শ্রেণীর লোক সাধারণ মানুষের মত দেহ নিয়ে জন্মায় না। অজ্ঞানতা সামান্য দূর হলেই তাঁরা বুঝতে পারেন যে, মুক্তি থেকে কি তাদের দূরে রেখেছে।

যিনি সম্যক পথ অবলম্বন করে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন যোগ-সূত্রে তাঁকে বলা হয়েছে—'উপায়প্রত্যয়' যোগী। তিনিও বিদেহলীন ও প্রকৃতিলীন যোগীদের অপেক্ষা কম নন কোন অংশে। তিনিও পারেন সানন্দ ও সাস্মিত সমাধি অতিক্রম করে পরম মুক্তি অর্জন করতে। 'এই পৃথিবী কিছু নয়' এই বলে একে ত্যাগ করলেই কিছু হবে না। কঠিন তপস্যা করলেও নয়। আত্ম এবং বিশ্বের মধ্যে প্রভেদ কি তা জানতে হবে। এই দুইয়ের মধ্যে যথার্থ ভেদ করতে পারলে তবেই মুক্তিলাভ করা সম্ভব। যোগ মনে করে যে, দেবতা হল সূক্ষ্ম প্রকৃতির দ্বারা গঠিত দেহ। সুতরাং এই ধরনের দেবত্ব অর্জন করলেও মুক্তি নেই। বুদ্ধি পরিচালিত অন্তর্দৃষ্টি দ্বারাও কিছু হবে না। যতক্ষণ বুদ্ধি ততক্ষণ পুরুষের যথার্থ আত্মজ্ঞান হবে না।

সবিতর্ক সমাধি পর্যায়েও সাধক থাকেন সূক্ষ্ম প্রকৃতির পর্যায়েই। এই সূক্ষ্ম পর্যায়ে প্রকৃতির মধ্যে থাকে সত্ত্ব গুণের প্রাধান্য। রজঃ ও তমঃ গুণ থাকে নিস্তেজ হয়ে। চার ধরনের সমাধিকে বলে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। এখানে যে জ্ঞান হয় সে জ্ঞানে দ্বৈত থাকে। থাকে বিষয় এবং বিষয়ী। বস্তুর সীমা এখানে তন্মাত্রে থাকে এই যা। তন্মাত্র হোক বা যত সূক্ষ্মই হোক না কেন বস্তু তবু থাকেই, প্রকৃতি তবু থাকেই। যোগ-ব্যবস্থা কিছুটা বৌদ্ধ ঝান অর্থাৎ ধ্যানের মতন। 'সানন্দ' শব্দটিও সম্ভবতঃ বৌদ্ধ তত্ত্ব থেকেই ধার করা। কারণ বৌদ্ধ অনুপদ সূক্তে বলা হয়েছে মনোযোগের নিম্নলিখিত পর্যায়ের কথা : স্থূল ইন্দ্রিয়ের কামনা থেকে দূরে থাক, বাজে চিন্তা থেকে মুক্ত হও, এর ফলে পৌঁছুবে প্রথম ঝান বা ধ্যান পর্যায়ে। নির্জন স্থানে বসে এই অবস্থাতে কোন বিশেষ লক্ষ্যে মন রাখলে একটা অদ্ভুত আনন্দবোধ হয়। এ দেবে বিতর্ক, বিচার, পীতি, সুখ, এবং চিৎ একাগ্রতা।

দেবে চিত্ত, (অর্থাৎ অনুভব, ইচ্ছা, শক্তি, চৈতন্য) দেবে ছন্দ (অর্থাৎ সৎ ইচ্ছা, মনসিকর (অর্থাৎ যথার্থ পছন্দ, চেষ্টা, মনোযোগিতা, উদাসীনতা, মনঃসংযোগ) ইত্যাদি। এই যে ক্রমবোধ, বুদ্ধের মতে ভিক্ষু নিজেই বুঝতে পারেন এ-সব।

এ সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে আরও স্পষ্ট করে, যেমন, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য চিন্তা থেকে বিরত থাকলে, কু-চিন্তা থেকে মুক্ত থাকলে ভিক্ষু পৌছান প্রথম ঝানে (ধ্যান পর্যায়ে)। এখানে মনোযোগকে ধরে রাখা যায়। এ হল সবিতর্ক ও সবিচার পর্যায়। এই পর্যায় আসে নির্জনতা থেকে। আনন্দ ও আগ্রহ বোধ করা যায়। এর পরে ভিক্ষু প্রবেশ করেন দ্বিতীয় পর্যায়ে ; দ্বিতীয় ঝান বা ধ্যান পযায়ে। দ্বিতীয় ঝান পর্যায় হল অন্তর্মুখিন। মনকে এ পর্যায় প্রশান্ত করে। আত্মস্থ করে। মনোযোগ থেকে জন্মে গভীর মনঃসংযোগের ক্ষমতা। এ মনঃসংযোগ হয় সাগ্রহ আনন্দপূর্ণ। তারপর আগ্রহও নির্বাপিত হয়, মন পায় সাম্য অবস্থা। ভিক্ষু মনোযোগী হয়, তীক্ষ্ণদৃষ্টি হয়। দেহের মধ্যেও একটা আনন্দ শিহরণ অনুভব করে। এর পর আসে চতুর্থ ঝান বা ধ্যান পর্যায়। এই পর্যায়ে ব্যথা ও আনন্দবোধ দুইই চলে যায়। মনে হয় স্বচ্ছ, নিষ্কলঙ্ক ও নিরাকর্ষণ। উচ্চতর পর্যায়ের জন্য হল এই ব্যবস্থা।

বৌদ্ধদের অহংবোধের এই অসারতা বোধ হল যোগের অস্মিতা পর্যায়ভুক্ত। উভয়েই মনে করে যে, যে চিন্তাপ্রবাহ অহংবোধের জন্ম দেয় তাকে রোধ করতে হবে। বৌদ্ধরা এই অহংবোধ অতিক্রম করে পৌছান নির্বাণ স্তরে। যোগীরা যান আত্মস্বরূপবোধে।

যোগের বিশ্লেষণ এখানেই শেষ। এর পরই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি—যে সমাধিতে 'বিষয়' হয় সংস্কারে রূপান্তরিত। এর ফলে বিষয় বিষয়ীর দ্বৈতভাবও থাকে না। তবে যোগসূত্রে আছে আত্মার আরও বিভিন্ন পর্যায়ে অগ্রগতির ইঙ্গিত। তবে এই অগ্রগতির কথা সম্ভবতঃ যোগসূত্র ধার করেছিল বৌদ্ধসাহিত্য থেকে। সুতরাং বৌদ্ধ সাহিত্যেরই একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক আগে। চারটি ঝান বা

ধ্যান পর্যায়ের কথা বলেছি পূর্বেই। তবে আত্মার অগ্রগতির জন্য আছে আরও কতকগুলি পর্যায়। গৌতম বুদ্ধ মহানির্বাণের আগে নির্বাণ লাভের জন্য তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন এই ধরনের কথা : আশীর্বাদধন্য ব্যক্তি প্রথম পৌঁছান সমাধি পর্যায়ে। প্রথম এই পর্যায় থেকে তাঁকে উঠতে হয় দ্বিতীয় পর্যায়ে। দ্বিতীয় পর্যায় থেকে যেতে হয় তৃতীয় পর্যায়ে। তারপর চতুর্থ পর্যায়ে। চতুর্থ পর্যায় পার হয়ে তিনি যান অনন্ত দেশে (space)। এই অনন্ত দেশ থেকে তিনি উন্নীত হন অনন্ত চৈতন্যলোকে। অনন্ত চৈতন্যলোক থেকে যান শূন্যতায়। এই শূন্যতা অতিক্রম করে তিনি যান বোধ এবং অ-বোধ উভয় পর্যায়েরই উর্ধ্বে। এই বোধ-অ-বোধ পর্যায় অতিক্রম করে তিনি পৌঁছান বোধহীন এবং অনুভবহীন পর্যায়ে।

বিশুদ্ধিমাগ্‌গ-এর মতে এই অবস্থাতে নিবিষ্ট মনের সাহায্যে সময়ের একটা সীমা বেঁধে দেওয়া যায়। অবশ্য যদি না এর মধ্যে মৃত্যু হয় বা সঙ্ঘপ্রীতি বা গুরুর আহ্বান সাধককে বিচলিত না করে। এই অবস্থাকে অতিক্রম করেও যখন সাধক এগিয়ে যান তখন তিনি গিয়ে পৌঁছুতে পারেন এমন এক পর্যায়ে যেখান থেকে আর কখনও জন্মের বৃত্তে ফিরে আসতে হয় না তাঁকে। অর্থাৎ সাধকের আর পুনর্জন্ম হয় না। তখনই তিনি নির্বাণ লাভ করেন। নির্বাণের অর্থ এই নয় যে, মরে যাওয়া। মৃত ব্যক্তি ও নির্বাণ লাভ করা ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য হল এই যে, নির্বাণ লাভ করে ব্যক্তির দৈহিক কর্মক্ষমতা, কণ্ঠস্বর, মানসক্রিয়া ইত্যাদি স্তব্ধ হয়ে যায় বটে কিন্তু প্রাণশক্তি যায় না। যায় না দেহের স্বাভাবিক তাপ। মৃত দেহের ইন্দ্রিয়ের মত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতার শক্তিও ভেঙে পড়ে না। কিন্তু নির্বাণ অবস্থাতে সাধক লাভ করেন তিন ধরনের মুক্তি—তিনি সীমিত জ্ঞান থেকে যান অসীমে। করেন আকাঙ্ক্ষা থেকে আকাঙ্ক্ষারহিত জগতে প্রবেশ, এবং অহংকারের মিথ্যা থেকে গিয়ে পৌঁছান শূন্যতার সত্যে।

যিনি আত্মার এই সত্যে পৌঁছান তিনি হলেন পূতকরণ। এটা

হয় কোন্ কোন্ স্তর অতিক্রম করলে যোগসূত্রে আছে তার একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনি। কারণ, বলা হয়েছে যে, যোগী দেহবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারেন মনোযোগ বা ধারণার পর্যায়ে, যাকে বলা হয়েছে মহাবিদেহ। এই ধারণা দু' রকমের, কল্পিত ও অকল্পিত। কল্পিত ধারণাতে ধারণা হল আপেক্ষিক। সেখানে দেহবন্ধন থেকে মুক্ত হলেও দেহবোধ থাকে। অকল্পিত পর্যায়ে এ-বোধও থাকে না। 'বিশোকা' পর্যায়ে (যাকে জ্যোতিষ্মতীও বলা হয়েছে) অনন্ত চৈতন্যের স্বাদ অনুভব করা যায়। এমন এক অবস্থার কথাও বলা হয়েছে যেখানে দেহ-বোধকে অনন্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। শাস্ত্রে যার উল্লেখ রয়েছে অনন্ত সমাপত্তি নামে। দেহ এসময় থাকতে পারে আসনে স্থির ভাবে উপবিষ্ট। এ হল অনেকটা বৌদ্ধ অরূপ-ঝান কল্পনার মত।

প্রজ্ঞাতত্ত্বে বলা হয়েছে যে, এই প্রজ্ঞা বা অন্তর্দৃষ্টি হল ক্রমোন্নতির পথে সাত ধরনের। এর সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায়কে বলা হয়েছে—প্রান্তভূমি। যোগীকে প্রথম যেতে হয় চারটি মুক্তির মধ্য দিয়ে। যাকে বলা হয়েছে কার্যবিমুক্তি অর্থাৎ ফলাফল থেকে অন্তর্দৃষ্টির মুক্তিলাভ। তারপর যেতে হয় আরও তিনটি স্তর অতিক্রম করে—যাকে বলা হয়—চিত্তবিমুক্তি অর্থাৎ মানসক্রিয়া থেকে মুক্তিলাভ। এই মুক্তিলাভ হয় অসত্য থেকে জাত সে অজ্ঞানতা, তা দূর হয়ে বিশেষ জ্ঞান দেখা দিলে তবেই। যোগী জানেন যে, কি বর্জনীয়, বা বর্জনীয় বিষয়ের উৎপত্তির কারণই বা কি। তিনি তা জেনে সে কারণকেও এড়িয়ে চলেন। এ জ্ঞান যে এসেছে সীমিত মানসিক ক্ষমতা বা নিরোধ-সমাধি থেকে তাও তিনি বুঝতে পারেন। বন্ধন এড়াবার জন্য যে বিশেষ জ্ঞান বা বিশুদ্ধ জ্ঞান, সে জ্ঞানচর্যা সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিবহাল। মুক্তির চারটি পর্যায় লাভ করা যায় মনঃসংযোগ দ্বারা বশীকার স্তরে উন্নীত হলে তারপর।

চিত্তবিমুক্তির জন্য প্রথম দরকার আত্মসচেতন হওয়া। আত্মার স্বরূপ কি, তাই জানা। প্রকৃতি কিভাবে আত্মাকে, পুরুষকে আচ্ছন্ন করে আছে না জানা গেলে তাকে প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত করা

যায় না। আত্মার স্বরূপ জানা গেলে প্রকৃতির বন্ধন স্থূল থেকে সূক্ষ্মতম পর্যায়ে কিভাবে ছড়িয়ে আছে তা বোঝা যায়। তখন যোগের সাহায্যে এই প্রাকৃত জগৎকে পুরুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করা সহজ হয়। প্রকৃতির সূক্ষ্মতম যে বন্ধন, বুদ্ধি, তখন এই বুদ্ধিকেও অতিক্রম করা সহজেই যায়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ, জলে ট্যাবলেট গলে যাবার মত গলে যায়। পুরুষ সমস্ত কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হন কেবলিন। তিনি নির্ভেজাল আপন অস্তিত্বে বিরাজ করতে থাকেন। যাকে বর্ণনা করা হয়েছে 'অমল' নামে। যোগীকে এই পর্যায়ে বলা হয় কুশল।

যোগী যখন সিদ্ধ হন তখন তাঁর সিদ্ধির শেষ দিকে আছে তিনটি পর্যায়। সে তিনটি পর্যায়ের জন্য তাঁকে কোনরকম চেষ্টা করতে হয় না। তা আপনা আপনিই অতিক্রান্ত হয়। 'কুশল' পর্যায়ের পরে কি অবস্থাতে যে উপনীত হন যোগী। পুরুষের নির্ভেজাল সত্তা কি, তা প্রাকৃত ভাষায়, প্রাকৃত জ্ঞানের মাধ্যমে বলা অসম্ভব। কারণ এ পর্যায়েও পুরুষ হলেন প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। সুতরাং শেষ পর্যায়ের কথা কাউকে যদি বুঝতে হয়, কোন প্রকৃতিবদ্ধ পুরুষ যদি নিজের সত্তা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে চান, তবে তাকে নির্ভেজাল পুরুষত্বে গিয়ে পৌঁছুতে হবে। নিজেকে হতে হবে পুরুষ। শুধু এইটুকু বলা যায় যে, এই অবস্থা প্রাপ্ত হলে যোগীর চৈতন্যে কোন তরঙ্গ থাকে না, থাকে না দুঃখ এবং সংস্কার, তা ভাল অথবা মন্দ যা-ই হোক না কেন। তখন আর জন্মের বৃত্তে ফিরে আসার প্রশ্ন থাকে না। বৌদ্ধদের 'লোকুত্তর' পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছানো যায়।

আত্মার মুক্তি কোন্ পর্যায়ে এটা বোঝা গেলেও যোগের সাহায্যে মনোনিবেশ করে এ পর্যায়ে পৌঁছুবার পথে প্রতিবন্ধকতা আছে অনেক। যোগসূত্র বলে দিয়েছে এই প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করার পথের কথা।

মনঃসংযোগের পথে আছে নানারকম প্রতিবন্ধকতা। এই প্রতি-বন্ধকতার স্বরূপ যে যোগসূত্রই আমাদের প্রথম দিয়েছে তা নয়।

ভারতীয় মানসে এ-বোধ ছিল অনেকদিন আগে থাকতেই। এই প্রতিবন্ধকতাগুলি হল এই ধরনের : যেমন,

(১) **অসুস্থতা**। অসুস্থতা সাধনার পক্ষে বিরাট বাধা। অধ্যাত্ম সাধনার জন্যও অসুস্থ দেহ অনুপযুক্ত। এজন্য রাখতে হবে দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য। দেখতে হবে স্নায়ুতন্ত্রীগুলো যাতে হয় উপযুক্ত রস-নিঃস্রাবী। এজন্য অবশ্য যোগ-ব্যবস্থাই অবলম্বনীয়। হঠযোগ প্রদীপিকাতে বলা হয়েছে, যোগই পারে যোগ সাধনার জন্য দেহকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে। দেহের সুস্থতার উপর নির্ভর করে মনেরও সুস্থতা। হঠযোগে দেহকে বিশুদ্ধ করে তোলার জন্য তাই আছে নানা ব্যবস্থার কথা। এর ফলে দেহের স্নায়ুশক্তি বৃদ্ধি পায়। দেহের উপর বেশী করে আসে নিয়ন্ত্রণ। দেহকে নিয়ন্ত্রণ করলে জীবনী শক্তি বাড়ে। মৃত্যুও নির্ভর করে দেহী ব্যক্তির ইচ্ছার উপর। এজন্য আহারেও বলা হয়েছে সংযমী হতে। অতিভোজন ও অপর্যাপ্ত ভোজন দুইই হল ক্ষতিকর। উপবাস করতে হবে তখনই যখন দেহের পক্ষে ও জীবনের পক্ষে তা ক্ষতিকর না হচ্ছে। যথাযথ যোগাভ্যাস করলে লোকে দিব্যদৃষ্টি লাভ করে। সে হয় সর্বশ্রুত। দূরবর্তী অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্বচ্ছ দৃষ্টি জন্মে। দেহ সুস্থ হলে মনও সুস্থ ভাবে চিন্তা করতে পারে। মনকে স্থির নিবদ্ধ করতে হলে যোগীকে বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীতে বহুক্ষণ আসনে বসে থাকতে হয়। দেহ দুর্বল হলে তা অসম্ভব।

(২) **অমনোযোগ : আলস্য ও ক্লান্তি**। মনঃসংযোগের পথে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বাধা হল অমনোযোগ, আলস্য ও ক্লান্তি। দেহ দুর্বল হলে দেখা দেয় কফের প্রাধান্য। দেহ ভার হয়। দেখা দেয় তমোগুণের প্রাধান্য। মনে যখন প্রেরণা থাকে না তখন তা হয় আলস্যের জন্য। যখন মন সক্রিয় হতে চায় না তখন বুঝতে হবে, দেখা দিয়েছে ক্লান্তি। শুধু মনঃসংযোগের ক্ষমতা থাকলেই হবে না— মনঃসংযোগ করার মত ইচ্ছাও থাকতে হবে। এই ইচ্ছাশক্তি ও সুস্থ দেহের অভাব হলে যোগী ব্যর্থ হতে পারেন।

(৩) **সন্দেহ : অমনোযোগিতা।** শুধু ইচ্ছাশক্তি থাকলেই চলবে না, দেহে প্রেরণা থাকলেই চলবে না, এজন্য চাই একাগ্রতা। চাই সংকল্প। নিশ্চিত একটা বিশ্বাস না থাকলেই সমস্যা দেখা দেয়। তখন মনে দেখা দেয় বিভ্রান্তি। আসে সন্দেহ। যোগ পদ্ধতির উপর আস্থার অভাবে দেখা দেয় প্রমাদ। ফলে মনঃসংযোগের জন্য যথাযথ পথ অবলম্বন করা যায় না।

(৪) **মনোযোগে ব্যর্থতা ও অস্থিরতা।** ইচ্ছে আছে, ক্ষমতা প্রয়োগের শক্তি আছে, তথাপি দেখা যায় অনেকে পারছেন না প্রয়োজনীয় মনঃসংযোগ করতে। এ-জন্য অধ্যাত্ম জগতে কোন উন্নতি হচ্ছে না তাদের। কেন যে ঠিক এমন হয় যোগসূত্রে এর ব্যাখ্যা নেই। তবে অবচেতন মনের প্রভাবেই তা হয় বলে বিশ্বাস। এইজন্যই যোগসূত্র বারে বারে দৃষ্টি দিতে বলেছে সংস্কারের দিকে (অতীত আকাঙ্ক্ষার অবশিষ্টকেই বলে সংস্কার)। কখনও কখনও এমন হয় যে, মনঃসংযোগ করে, যোগসাধনা করে অনেকটাই যেন ফল মেলে। কিন্তু সে ফল দীর্ঘদিন আয়ত্তে থাকে না। সেই কারণে অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে শুধু এগিয়ে গেলেই চলবে না, যে ফল লাভ করা গেছে, তাকে ধরেও রাখতে হবে। সাধককে, যোগীকে এগিয়ে যেতে হবে ক্রমশঃ। অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে এগিয়ে না যাওয়ার অর্থ হল পেছানো। সুতরাং একের পর এক পর্যায় পার হয়ে শেষ পর্যায়ে যেতে হবে এগিয়ে যেখানে পৌঁছলে সংস্কার যাবে ধুয়ে মুছে। আর পুনর্জন্ম হবে না, পুরুষ মুক্ত হবে ; প্রকৃতি আর পারবে না তাকে বিভ্রান্ত করতে।

(৫) **পার্থিব আকর্ষণ : ভ্রান্ত জ্ঞান।** লোভ এবং ঐহিক সুখের প্রতি আকর্ষণ পতনের একটি বড় কারণ। যোগের উদ্দেশ্য এই পার্থিব আকর্ষণ থেকে মনকে সরিয়ে নেওয়া। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা হল প্রকৃতি-বন্ধন থেকে উর্ধ্বে উঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা। এইজন্য যোগীকে করতে হবে সৎ চিন্তা এবং এমন কর্মযোগের অভ্যাস, যা নাকি তাঁকে নিয়ে যাবে অধ্যাত্ম সত্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে। আবেগকে সংযত করতে হবে।

চিন্তা ও কর্মেও পালন করতে হবে সংযম। উপভোগের আকাঙ্ক্ষা প্রবল থাকলে বুদ্ধির সাহায্যে কখনই পাওয়া যাবে না উর্ধ্ব জগতের সন্ধান। কারণ আকাঙ্ক্ষা থাকলে বৈরাগ্য আসবে না কখনই, অসংযত মনকে কিছুতেই সংযত করা যাবে না।

সুতরাং যোগীকে জানতে হবে আকাঙ্ক্ষার মূল কারণ কি, তা। কারণ জেনে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে তাকে। এই উৎপাটন করার জন্য প্রয়োজন সম্যক জ্ঞান অর্জন ও ভ্রান্ত জ্ঞান বিসর্জন। 'সত্য' সম্পর্কে যথার্থ রূপে ওয়াকিবহাল না হতে পারলে আত্ম ও অনাত্মের মধ্যে, পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করা অসম্ভব। যতক্ষণ না হচ্ছে সত্যজ্ঞান, আসবে না মনের স্থিরতা। সুতরাং সত্যজ্ঞান অর্জন করতে হবে আগে। অনেক সাধকই মুক্তি অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছেন এই কারণে যে, তারা কিছুদূর এগিয়েই ভেবেছেন যে সিদ্ধি অর্জিত হয়েছে। এরকম ভাবার কারণ, সত্য সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের অভাব। কেউ কেউ মনের ধারণা অনুযায়ী সাধনার স্তরে গিয়ে পৌঁছেই হয়েছেন পরিতৃপ্ত। এক্ষেত্রে তিনিও ব্যর্থ হয়েছেন যথার্থ জ্ঞানের অভাবে। প্রকৃতির সূক্ষ্ম পর্যায়েই তিনি আটকে থেকেছেন। কেউ কেউ বা সামান্য কিছু বিভূতি লাভ করেই তৃপ্ত। আরও অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছেন। কেউ কেউ পথটাকেই সত্য বলে ধরে নিয়ে থেকে গেছেন পথের মধ্যেই। যেমন, কিছুসংখ্যক হঠযোগী। তারা নির্ভুল ভাবে শিখেছেন দেহকে নিয়ন্ত্রণ করতে। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত দেহকে কাজে লাগিয়ে অধ্যাত্ম সত্যে গিয়ে পৌঁছুতে পারেন নি। যেন দেহ নিয়ন্ত্রণ করাটাই যোগের উদ্দেশ্য, এই মনে করে থেকেছেন দেহ নিয়েই। যোগসূত্র সাধককে দিয়েছে এ-সমস্ত বিপদ সম্পর্কেই সাবধান করে। সাধনার পথে সামান্য প্রাপ্তির তৃপ্তি থেকে নিবৃত্ত থাকতে বলেছে। বলেছে সত্যকে জেনে, লক্ষ্য স্থির রেখে এগিয়ে যেতে।

সাধনার পথে যেসব বিঘ্নের কথা আলোচিত হল—তা ছাড়া যোগ-সূত্রে আছে আরও কিছু বিঘ্নের কথা—যেমন, (১) মানসিক, জাগতিক

ও দৈবিক বেদনা অর্থাৎ যে বেদনার জন্ম মন থেকে, বহির্জগৎ থেকে ও দেবতা থেকে (২) অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা থেকে হতাশা। (৩) দৈহিক দুর্বলতা ও (৪) নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস। অবশ্য মন শক্ত হলে এগুলো আর থাকে না। এ-জন্য যোগ যে বিধান দিয়েছে, বিশেষ করে দেহ নিয়ন্ত্রণের বিধান, সেটা হল বিজ্ঞান ভিত্তিক।

মানসিক চাঞ্চল্যকে দমন করার জন্য নানা ধরনের আছে যোগাভ্যাসের উল্লেখ। মনের অবস্থা যেমন যেমন নির্দেশের মাত্রাও তেমনি। যোগাঙ্গ স্থির করেছে—ধীরে ধীরে চিত্ত স্থির করার নানা পদ্ধতি। যদি দৈহিক দৌর্বল্য, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দুর্বলতা ও নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট মনকে দুর্বল করে দেয় মনঃসংযোগে যদি বাধা সৃষ্টি করে, এ-সব দূর করতে হবে। এজন্য দরকার দেহ ও মন উভয়েরই শৌচ। যোগীকে জানতে হবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ন্ত্রণের কলাকৌশল। ঘাড়, মেরুদণ্ড এবং মাথা সোজা করে তাঁকে বসতে হবে যোগাসনে। মনঃসংযোগের জন্য করতে হবে নানা ধরনের আসন। যোগসূত্রে মুদ্রার অর্থাৎ হাতের অঙ্গুলি, হাত বা দেহের বিশেষ বিশেষ ভঙ্গী করার কোন উল্লেখ নেই। এ-সব এসেছে পরে। তন্ত্রে যেসব দেহভঙ্গীমার উল্লেখ করা হয়েছে বা বলা হয়েছে ন্যাসের কথা, যোগসূত্রে এসবও নেই। এসব এসেছে তন্ত্র থেকে ঈশ্বরবাদ থেকে। ন্যাস অনেকটা ড্রিলের মত। দেহের নানা স্থানের মাংসপেশীর এতে ব্যায়ামের হয়। কিন্তু সাধারণ ব্যায়াম ক্ষেত্রে যে বিশ্বাস ন্যাসের পেছনে কাজ করে সেরকম কোন বিশ্বাস নেই। এতে মনে করা হয় যে, সমস্ত দেহ ন্যাসের ফলে দৈব প্রেরণায় ভরে যায়। সাধক এখানে তাঁর পূজ্য দেবতার সঙ্গে এক হয়ে যান। দেহ ভরে ওঠে অধ্যাত্ম গুরুত্বে। মুদ্রার মধ্যে এ ধরনের কোন পুণ্য তত্ত্ব নেই, প্রথম দিকে তো মোটেও ছিল না, এসেছে পরে। যোগসূত্রে বরং এর বিরোধিতা করে। দেহকে চঞ্চল করলে মন স্থির হয় না বলেই যোগ-সূত্রের বিশ্বাস। এ-জন্য হঠযোগ যে বলেছে চুরাশীটি আসনের কথা, যোগসূত্র তাও সমর্থন করেনি। এতে আসনের বিঘ্ন ঘটে বলেই যোগসূত্রের

ধারণা। ব্যাস ভাষ্যের মতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের এই বিভিন্ন ভঙ্গী পশুকুলের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভঙ্গী থেকেই অনুকরণ করা। তবে ন্যাস বা মুদ্রার উল্লেখ না থাকলেওযোগসূত্রপ্রাণায়ামকে অনুমোদন করেছে। যোগসূত্রের মতে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিতে হবে এমন ভাবে যাতে দেহের অত্যন্ত স্বল্পপরিসর স্থান এর ফলে বিক্ষুব্ধ হয়। সুতরাং বলা হয়েছে ছোট ছোট নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কথা। প্রাণায়ামে দ্রুত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস মানা। যত ধীরে ধীরে ও আস্তে আস্তে সম্ভব সারতে হবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের বিরতির সময় হওয়া উচিত দীর্ঘ। যত কম নিঃশ্বাস নেওয়া যায় ততই ভাল। যত আস্তে তা সম্ভব, ততই দেহের নড়াচড়া হবে কম। অবশ্য এমন কাজ করলে চলবে না যাতে শ্বাস রোধ হয়ে যায়। স্বাভাবিক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসকে এইভাবে নিয়ন্ত্রণ করার কলা-কৌশল হল যোগসূত্রের একটি বড় দান।

যোগসূত্রের উপর তন্ত্রের অবদান হল এই যে, তন্ত্র বলেছে দেহের ছয়টি চক্র নিয়ন্ত্রিত করার কথা। এই চক্রগুলো থাকে মেরুদণ্ডের ভেতর। যোগসূত্রে বিভিন্ন নাড়ির কথা তেমন নেই, কিন্তু তন্ত্রে নাড়িজ্ঞান একটি প্রধান বিষয়। এ বিশ্বাসও পরে এসেছে যে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত হলে দেহের অশুদ্ধি দূর হয়। যাকে বলা হয়েছে ভূতশুদ্ধি। প্রথম দিকে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত হত এই কারণে যে, যাতে দেহে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বাধা সৃষ্টি করতে না পারে মনোযোগে। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত হলে মনঃসংযোগ সহজ হয়। বিশেষ জ্ঞানের পথে বাধাগুলিও দূর হয়। যোগসূত্র যে মনঃসংযোগ ও মুক্তির জন্য প্রাণায়ামের উপর বেশি জোর দিয়েছে, এর কারণ হয়তো উপনিষদের শিক্ষা। উপনিষৎ বলেছে যে, মানুষ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে সব সময়ই বলিদান করে চলেছে দেবতাদের কাছে। এ তত্ত্ব দিয়েছিলেন রাজা প্রতর্দন। এজন্য একে বলা হয় প্রতর্দনবলি। উপনিষদের ধারণা, সমস্ত শাস্ত্রই সেই পরম ব্রহ্মণ কর্তৃক পরিত্যক্ত নিঃশ্বাস। এইজন্যই তন্ত্র সাহিত্যে দেখা যায় যে, শাস্ত্রকারেরা নিঃশ্বাসকে

স এবং প্রশ্বাসকে তুলনা করেছেন হং এর সঙ্গে। তারা মনে করেন যে, অজ্ঞাতেই প্রত্যেকটি জীব উচ্চারণ করে চলেছেন অজপা মন্ত্র অর্থাৎ সোঽহং বা হংস শব্দটি। অর্থাৎ জীবাত্মা (হং) যে পরমাত্মার (স) সঙ্গে এক, একথাই বলেছেন। 'প্রাণায়ামে দেহ সুস্থ হয় সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়' যোগসূত্র যে শুধু এ কথাটাই বলবার চেষ্টা করেছে তা নয়, যদিও কায়া-সম্পদ অর্থাৎ সুস্থ দেহের উপর জোর দেওয়া হয়েছে খুবই। সুস্থ বজ্রকঠিন দেহ যে অতীন্দ্রিয় শক্তির ধারক, তাতে সন্দেহ নেই। মনঃসংযোগ করার পথেই যোগীরা অর্জন করেন এই শক্তি বা বিভূতি। তবে তপস্যার মূল্য যোগসূত্রে তেমন নেই। এটা একটা ক্রিয়াযোগ মাত্র। সাধনার জন্য যে আছে পাঁচটি নিয়ম, এ হল তারই একটি অঙ্গ। যোগসূত্রে দেহচর্চা সম্পর্কিত ধারণা এসেছে প্রাচীন কতকগুলি পদ্ধতির ধারা বেয়ে। যোগ বৈদিক যজ্ঞপদ্ধতি সমর্থন করে না, বরং সাংখ্যের মত এর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করে। বরং বৌদ্ধ ও জৈনদের মত অহিংসার প্রতিও যোগসূত্রের রয়েছে যথেষ্ট পক্ষপাত। অহিংসাকে যোগসূত্রও মনে করে মুক্তি লাভের প্রধান একটি পথ বলে। শরীরকে কষ্ট দিয়ে যোগসূত্র যেমন অধ্যাত্ম সাধনাকে সমর্থন করেনি, তেমনই বৈদিক বলিদান প্রথাকেও অনুমোদন করেনি। বরং উপনিষদের ওঁ শব্দটি যোগসূত্রকে বেশী করে আকর্ষণ করেছে। এর ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি যোগসূত্রের মতে মনঃসংযোগের সহায়ক। চিন্তা-প্রবাহকে সম্পূর্ণ স্তব্ধ করতে না পারলেও যোগসূত্র 'ওঁ' শব্দকে মনে করে ঈশ্বরের সমতুল্য। ঈশ্বরের প্রতীক হিসেবে যোগসূত্রের মতে 'ওঁ' শব্দের কোন জুড়ি নেই।

যোগসূত্র মনে করে যে, যদিও সাধনার জন্য দেহনিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন আছে তবু শুধুমাত্র দেহকে নিয়ন্ত্রণ করেই বন্ধ করা যাবে না মানবিক কার্যকলাপ। জ্ঞানেন্দ্রিয় বুদ্ধির প্রভাবে বার বার আত্মাকে আক্রমণ করে। সেইজন্য মনকে ইন্দ্রিয় থেকে মুক্ত না করতে পারলে মুক্তি নেই। কিংবা ইন্দ্রিয়কেই রাখতে হবে নিষ্ক্রিয় করে। এ সম্ভব

না হলে মন বিচলিত হতেই থাকবে। সেইজন্য 'প্রত্যাহার' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে রুদ্ধ করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সেজন্য যে ইন্দ্রিয়গুলিকে তুলে ফেলতে হবে তা নয়, দেহের কোন অংশকে কেটে বাদ দিলেও চলবে না। কারণ চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে ইন্দ্রিয়কে উৎপাটিত করলেও ফল হবে না। ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করলে, নিষ্ক্রিয় করলে ফল হয় এই যে, বাহ্য জগতের সঙ্গে তার যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়, ফলে মনকে আলোড়িত করতে পারে না বাইরের কোন প্রভাব। দেহনিয়ন্ত্রণ মানে ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে এমন অবস্থায় নিয়ে আসা যাতে বাইরের কোন প্রভাব না পড়তে পারে তার উপর। দেহ নিয়ন্ত্রণের অর্থ হল অন্তরের দিকে দৃষ্টি ফেরানো, অর্থাৎ নিরাকর্ষণ বোধ করা। এইজন্যই যোগশাস্ত্রে বলা হয়েছে, ধ্যান করো, মনঃসংযোগ করো, জয় করো। বিভিন্ন লক্ষ্যে মনঃসংযোগ করতে পারলে বিভিন্ন ধরনের যোগবিভূতি অর্জন করা সম্ভব। নবীন সাধকেরা অনেকেই এই বিভূতি অর্জন করে অহংকারে উন্মত্ত হন। তাঁরা অর্জিত ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু যাঁরা অভিজ্ঞ সাধক, তাঁরা বিভূতিকে মনে করেন অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে একটি উর্ধ্বধাপ মাত্র। এবং এই বিভূতির সাহায্যেই অগ্রসর হন সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয় জয় করতে। ত্রিকালজ্ঞ হয়ে দেশকালের সব কিছুকে নখদর্পণে আনাই অধ্যাত্ম সাধনার চূড়ান্ত কথা নয়। সিদ্ধি অর্জন করে বস্তু-জগতের উপর প্রাধান্য বিস্তারও এর লক্ষ্য নয়। বস্তু-জগৎকে অতিক্রম করাই অধ্যাত্ম সাধনার লক্ষ্য। বস্তু-জগতে যে চিরন্তন সত্য নেই, এ কথাটা জানাই হল সাধকের মূল উদ্দেশ্য। দেহনিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই পার্থিব জগতের উপর আকর্ষণ কমে যায়। ইন্দ্রিয়-নিয়ন্ত্রণ যে ভাবে, মনের নিয়ন্ত্রণও সেই অনুপাতে। যোগের পথে কে কতটা এগুবে তা নির্ভর করে জীবন সম্পর্কে তার অনুসন্ধিৎসা কিরকম তার উপর। জ্ঞানান্বেষা এ পৃথিবীতে আত্মমুখ উপভোগের জন্যই বেশি। আত্মজ্ঞানের লক্ষ্য কম, ঐহিক সুখের লক্ষ্যই বেশি। সুতরাং যোগের দ্বারা

অধ্যাত্ম সাধনার পথে কে কতদূর এগুবে তা নির্ভর করে তার দৃষ্টির উপর।

প্রশ্ন হল, ঐহিক সুখের উপর আকর্ষণ কমানো যায় কিভাবে? ভারতে অবশ্য এ সম্পর্কে হিন্দু-সংস্কৃতি, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম সবাই আলোচনা করেছে বিস্তৃতভাবে। এসব সংস্কৃতি বা ধর্মে প্রায় প্রত্যেক দার্শনিকই পার্থিব সুখের প্রতি আকর্ষণের নিন্দা করেছেন। এ-জন্য কি ধরনের চিন্তায় নিজেদের নিবিষ্ট করা উচিত এ সম্পর্কেও তাঁরা বলেছেন বিস্তৃতভাবে। বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে পার্থিব সুখের প্রতি নিরাকর্ষণ ভাব তৈরি করার কথা। মৃতদেহ যেমন বিতৃষ্ণা তৈরি করে, বিচার করে দেখলে দেখা যাবে জীবন্ত দেহও তেমনি বিতৃষ্ণার বিষয়। দেহের নগ্নতা সাজসজ্জায় ঢাকা থাকে বলে দেহের ঘৃণার দিকটি নজরে পড়ে না। দেহটা কি? শ' তিনেকের বেশী হাড়, যা একশ আশিটি গাঁট দিয়ে যুক্ত। শ' নয়েক নাড়ির বাঁধন ধরে রেখেছে একে। স্নায়ু ও পেশীও রয়েছে ন'শর মতন। এ সবই একটি চামড়ার আবরণে ঢাকা। চর্মকূপ দিয়ে তাপ বের হয় যেন কেট্‌লি থেকে ধুঁয়া বের হবার মতন। এ দেহে উকুনের বাসা, রোগের বাসা। এ-দেহ নানারকম রোগশোকের আশ্রয়। দেহের ন'টি ছিদ্র দিয়ে বার হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় অংশ। চোখ থেকে বের হচ্ছে পিচুটি, কান থেকে খোল, নাক থেকে সর্দি, মুখ থেকে বের হয় বমি, কফ্‌ এবং রক্ত, কী নয়! নিম্নাঙ্গ থেকে বের হয় মলমূত্র। লোমকূপ থেকে ঘাম!

এ-সবই তো ঘৃণার জিনিস। এ-সব বের হচ্ছে দেহ থেকেই। তবু দেহকেই মনে হয় কত মনোরম! মনোরম বোধহয় তার কারণ, দেহের সমস্ত কুৎসিত দিক ঢাকা পড়ে আছে সাজসজ্জাতে। আর এ-সব চোখে পড়ে না বলেই, পুরুষ আকর্ষণ বোধ করে নারীর প্রতি, নারী পুরুষের প্রতি। কেউ একটু যদি দেখে বিচার বিশ্লেষণ করে, তাহলে দেখবে, দেহের প্রতি আকর্ষণের কিছুই নেই। দেহের কোন অংশ যদি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, যেমন চুল, দাঁত, নখ ইত্যাদি, সঙ্গে সঙ্গেই তা

হারিয়ে ফেলে আকর্ষণ। দেহের ভেতরে আছে মলমূত্র, কিন্তু তবু দেহকে ঘৃণা নেই, অথচ তা দেহের বাইরে এলেই বিবমিষা। দেহের আকর্ষণ আসে ভ্রান্ত ধারণা থেকে। মলমূত্র যদি ঘৃণ্য হয় তবে দেহটাও ঘৃণার জিনিস। কিন্তু মোহান্ধ বলেই মানুষ বুঝতে পারে না সে কথা।

শুধু বৌদ্ধশাস্ত্র নয়, আরও প্রাচীন সাহিত্যেও আছে এ সম্পর্কে উল্লেখ। দু'মুখো কলসীতে যেমন নানারকম শস্য থাকে, ধান, চাল, ইত্যাদি, চতুর লোক যেমন তার ঢাকনা খুললেই বলতে পারে, এটা ধান, এটা চাল, তেমনি দেহতত্ত্বজ্ঞানী মানুষও সহজেই বলতে পারে দেহের এখানে চুল, এখানে নখ, এখানে দাঁত, এখানে হাড়, এখানে মুত্রাশয় বা যকৃত। এবং এ সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে দেহকে তখন আর মনে হয় না সুন্দর বলে।

এ সম্পর্কে আছে সুন্দর সুন্দর উদাহরণও। যেমন, কোন স্ত্রৈণ ব্যক্তি যদি দেখে যে, তার স্ত্রী পরপুরুষের সঙ্গে হাস্য পরিহাসে লিপ্ত, তার সঙ্গে অন্যায় সম্পর্কে যুক্ত, তখন সে যেমন তার প্রতি ভুলে যায় আকর্ষণ, তাকে মনে করে পরিত্যাজ্য বলে, তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবার পর তার ভালমন্দ নিয়ে আর মাথা ঘামায় না, তাকে যেমন আপন বলে ভাবে না, তেমনি চিন্তাশীল ব্যক্তিও দেহ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জেনে দেহবন্ধন থেকে মুক্ত হতে চান। দেহটাকে তিনি তখন আর ভাবতে চান না নিজের বলে। দেহের আনন্দ ও দুঃখের প্রতি তার তখন আর থাকে না কোন আকর্ষণ ও সমবেদনা। দেহ সম্পর্কে তিনি হন উদাসীন। তার মন তখন বাইরে থেকে ডুব দেয় ভেতরে। হয়ে যায় সংকুচিত। পার্থিব অস্তিত্বের কোন পর্যায়ের প্রতিও তার আর থাকে না কোন টান। দেহবোধ সম্পর্কে তখন তার বিরাগ জন্মে।

এই ধরনের বোধকে যোগসূত্রে বলেছে 'প্রতিপক্ষভাবনা' অর্থাৎ বিপরীত দিক সম্পর্কে ভাবনা। এই ধরনের ভাবনার সাহায্যে যোগ-সূত্র বলেছে মন থেকে বাসনা কামনাকে একে একে উৎপাটিত করতে।

যদি না পার্থিব সত্তা সম্পর্কে ঘৃণা জন্মে, যদি না এর তুচ্ছতা সম্পর্কে ধারণা হয়, তবে মনকে বিরাগ ভাবাপন্ন করা যাবে না এ পৃথিবী থেকে। এটা পারলে তবেই 'রাগ' হবে 'বিরাগে' পরিণত। নিজের দেহকে কত সযত্নচেষ্টা করে শুদ্ধ রাখতে হয় এ-কথা মনে পড়লেই অপর দেহের সঙ্গে মিলনের জন্য কেউ উন্মাদ হবে না।

কি এ সম্পর্কে বিরাগ বা বৈরাগ্য আনা সহজ নয়। আসতে পারে সাময়িক বৈরাগ্য। আবার তা চলেও যেতে পারে। স্থায়িভাবে যদি মনের মধ্যে বৈরাগ্য আনতে হয় তবে মনকে অভ্যস্ত করতে হবে এই ধরনের চিন্তাতে। কি করে মনকে অভ্যস্ত করানো যায় এ ধরনের চিন্তাতে, তাকে করা যায় প্রকৃতিমুখী হওয়া থেকে বিরত, যোগসূত্র বলেছে সে-কথাও। এজন্য উত্তরোত্তর কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে বলেছে মনকে স্থির করতে যাতে মনের মধ্যে বাইরের অভিঘাতে সৃষ্টি না হয় কোন চাঞ্চল্য। সেই নির্দিষ্ট লক্ষ্য হতে পারে নাভিদেশ, নাসাগ্র, জিহ্বাগ্র বা হৃদপদ্ম কিংবা মূর্ধাজ্যোতি অর্থাৎ মস্তিষ্কের ভিতরের জ্যোতি, বা ভ্রূমধ্যস্থ আলো। বাইরের কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে মন স্থির করা অভ্যাস হলে তবেই সম্ভব হয় দেহের বিশেষ বিশেষ অংশে বা দেহাভ্যন্তরে মনঃ-সংযোগ করা। মনকে কোন বিশেষ লক্ষ্যে আবদ্ধ করার নাম যোগ-শাস্ত্রে বলেছে ধারণা বা স্থির মনোযোগ। এ ধরনের মনঃসংযোগ করতে পারলে শেষপর্যন্ত স্বতই জন্মে একটা সম্মোহনের ভাব। এ-জন্য বাইরের কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। এ ধরনের মনঃসংযোগকে বলে একতানতা। এই একতানতা পর্যায়ে যেতে পারলেই মন পৌঁছায় ধ্যান পর্যায়ে। অধ্যাত্ম সাধনায় এই ধ্যানের প্রয়োজনই বিশেষভাবে। ধ্যেয় বস্তুতে সাধক যখন নিজেকে হারিয়ে ফেলেন তিনি হয়ে যান লক্ষ্যবস্তুময়। মনঃসংযোগ তখনই করে চূড়ান্ত সিদ্ধিলাভ। তখনই বলা যায়, হয়েছে সমাধি। ধারণা, ধ্যান ও সমাধির মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। পার্থক্য কম এতই যে যোগসূত্র এই তিন পর্যায়কে একত্রে বলেছে সংযম। সংযম যত স্থায়ী হবে, মনঃসংযোগগত অন্তর্দৃষ্টিও

বে ততই স্বচ্ছ। যাকে বলা হয়েছে 'সমাধিপ্রজ্ঞা'। ধারণা, ধ্যান ও
ধি সচেতন মনঃসংযোগ বা 'সম্প্রজ্ঞাত' সমাধির সহায়ক। যম, নিয়ম,
াসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার হল এক্ষেত্রে পরোক্ষ সহায়। তবে 'নির্বীজ-
সমাধির' ক্ষেত্রে এরা সবাই হল পরোক্ষ। বাচস্পতির মতে ঈশ্বর চিন্তা
থেকেও হতে পারে এই 'নির্বীজ-সমাধি' বা 'অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি'।

মানসিক কার্যকলাপ, চিন্তা, বুদ্ধি; এদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে কি করে? মন বড় চঞ্চল। নানা লোভ, নানা আকর্ষণ তাকে ব্যতিব্যস্ত করে। বল্গাহীন ঘোড়ার মত এই মন। তাকে সংযত না করতে পারলে অধ্যাত্মমুক্তি দূর অস্ত্। বন্ধন তখন চিরদিনের জন্য। যে চিন্তা মনকে সহজে আকৃষ্ট করে, তার ঠিক বিপরীত চিন্তায় মনকে করতে হবে আকৃষ্ট। মন যদি হিংসার দিকে সহজে আকৃষ্ট হয়, তাকে দেখাতে হবে অহিংসা। যদি মিথ্যার দিকে ঝুঁকে, অভ্যাস করাতে হবে সত্য। যদি চৌর্যের দিকে মন যায়, অস্টেয় অর্থাৎ অচৌর্য শেখাতে হবে। যৌন আকর্ষণ বোধ করলে তাকে অভ্যস্ত করতে হবে ব্রহ্মচর্যে। লোভ হলে শেখাতে হবে অপরিগ্রহ। মনকে শেখাতে হবে সন্তোষ। কথায় বলে 'শরীরের নাম মহাশয়, যা সহানো যায় তাই সয়'। মনও সূক্ষ্ম শারীরিক উপাদানে গঠিত। সুতরাং যেমন অভ্যাস তাকে করানো যাবে, তেমন ভাবেই সে অভ্যস্ত হবে। যোগসূত্র বলেছে, এজন্য প্রয়োজন যম এবং নিয়ম। অহিংসা, সত্য, অস্টেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহের জন্য দরকার যম। সন্তোষের জন্য নিয়ম। যম ও নিয়মে মনকে বাঁধতে না পারলে বিপথে সে যাবেই। একে একে তার উপর জমে উঠতে থাকবে কর্ম-ফলের বন্ধন।

মনকে যেমনি শেখাও তেমনি শেখে, দাঁড়ের ময়নার মত। নীতি অভ্যাস করতে হবে। নীতি হল মনের সংশোধনী। অপরের সুখে করতে হবে আনন্দবোধ। মনে আনতে হবে মৈত্রী ভাব। অপরের দুঃখে বোধ করতে হবে করুণা। প্রতিবেশীর ধর্মমূলক কাজে করতে হবে আনন্দ। মুদিতা ভাব আনতে হবে মনে। দুষ্টের প্রতি দেখাতে হবে উপেক্ষা। এ করতে পারলে অপরের অগ্রগতি ও উন্নতিতে হবে না

আমাদের কোন ঈর্ষাবোধ। মনকে সংযত করতে হবে এই কারণে, যে যাতে মনের কোন পার্থিব বাসনা ডালপালা ছড়িয়ে মহীরুহ হবার সুযোগ না পায়। যদি একটু তাকে বল্গা টেনে ধরতে পারি, তাহলেই দেখা যাবে যে, বহু আশা আকাঙ্ক্ষা হয়ে পড়েছে দুর্বল। তবে ভাল-মন্দ মনের এই দুই অবস্থাই যোগের মূল লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে। ভাল ও মন্দ যে-চিন্তাই করি না কেন, মন তা থেকে কিছু না কিছু আহরণ করেই। এই চিন্তাই তাকে সংস্কার হয়ে বাঁধে শেষপর্যন্ত। জন্ম জন্মান্তরের বাঁধনে সে বাঁধা পড়ে। কিন্তু যোগের লক্ষ্য মনকে সম্পূর্ণ-ভাবে নিষ্ক্রিয় করা। ভাল মন্দ কোন বোধই মনের যখন থাকবে না, যখন ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ হয়ে যাবে এক, যখন বীতরাগ ভয়ক্রোধ হওয়া যাবে—বাইরের খোঁচা খেয়েও মন পড়ে থাকবে ঘুমন্ত অজগরের মত, নড়বেও না চড়বেও না, তখন ভাবতে হবে যোগীর একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। তখন আসবে একাগ্রতা, মনোযোগ দিয়ে একটা বই পড়ার মত; অনেক কিছুই পাশ দিয়ে চলে যাবে, নজরে পড়বে না কিছুই। অনেক শব্দই অর্থহীন হয়ে বয়ে যাবে। মনকে এই অবস্থায় আনতে পারেন তবেই তার একাগ্রতা হয়েছে বুঝতে হবে। মনে তখন আসবে শুধু একটিই ভাবনা, একদেবতা ভাব। বিক্ষিপ্ত মনকে সংযত করার জন্য মনের প্রথম লক্ষ্য তাই একাগ্রচিত্ততা।

যোগ যে ঈশ্বর বলে কোন বিশেষ কিছুকে মানে তা নয়, তবু ঈশ্বর নামধেয় কোন কিছুকে একাগ্রতার জন্য মনের সামনে রাখা প্রয়োজন। এতে মানুষ হয় ঈশ্বরময়, রক্ষা পায় অপবিত্রতা থেকে। মানুষের আসে উদয়ব্যয় ভাব। ক্লেশ থেকে সে মুক্তি পায়। ধর্মাধর্মের হাত থেকেও সে লাভ করে অব্যাহতি। দুর্ঘটনা থেকেও রক্ষা পায়। যোগী হয় জাত্যায়ুর্ভোগ। ঈশ্বরে আকৃষ্ট হয়ে ক্রিয়াযোগের ফলে যোগ-সাধনার প্রাথমিক পর্যায় আয়ত্তে আসে। আসলে জ্ঞানযোগই হল শ্রেষ্ঠ যোগ। জ্ঞানই মুক্তি লাভের একমাত্র উপায়। ঈশ্বরানুরাগ যোগের একটি নিয়ম মাত্র। যেমন শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, চর্চা ইত্যাদি। যোগ

সাধনায় ঈশ্বরকে সামনে রেখে একাগ্রতার চেষ্টা সম্ভবতঃ এসেছে পরে। যোগের মূল লক্ষ্য কিন্তু তা নয়। দ্বন্দ্বাতীত যে আত্মা, তার লক্ষ্য হতে পারে না ঈশ্বর বলে কোন কিছু। এই অপরিণামিন 'আত্মা' নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কেও সচেতন থাকে না। তাঁকে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হয় সম্পূর্ণ। ঈশ্বর হল উপলক্ষ্য, যাঁকে লক্ষ্য করে লক্ষ্যাতীত সত্যে গিয়ে পৌঁছানো যায়।

প্রকৃতিকে অস্বীকার না করেও তাকে বশীভূত করা যায়, যোগ বিশ্বাস করে এই তত্ত্বে। কখনও কখনও প্রকৃতিকে বশীভূত করতে গিয়ে যোগী যে সিদ্ধি অর্জন করেন, সেই সিদ্ধিই হতে পারে তাঁর বন্ধনের কারণ। সিদ্ধির ক্ষমতা অহংকারকে জাগ্রত করতে পারে দারুণ ভাবে, শক্তিমদে মত্ত হয়ে ওঠাও অসম্ভব নয় কিছু। আসন, মুদ্রা, ন্যাস, প্রাণায়াম ইত্যাদির সাহায্যে অনেক সময়ই প্রচণ্ড ক্ষমতা করায়ত্ত হয়। তখনই অহংকার এগিয়ে আসে ভ্রান্ত পথে পরিচালনা করার জন্য। কিন্তু সিদ্ধযোগীরা বার বার সাবধান করে দিয়েছেন এই বলে ঃ—শক্তি করায়ত্ত হলে সংযত থাক, না হলে প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নিতে পারে। সুতরাং যোগশাস্ত্রের নির্দেশ সত্য হলে যে-সব যোগী তাঁদের যোগবিভূতি প্রদর্শন করেন, তাঁরা হলেন লক্ষ্যভ্রষ্ট। এই বিভূতি প্রদর্শনই অধ্যাত্ম সাধনার চূড়ান্ত কথা নয়। সুতরাং বিভূতিপ্রদর্শক সাধক নন যথার্থ সাধক। যথার্থ সাধক মুক্তাত্মা। শক্তিই লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হল মুক্তি। শক্তি যেমন মুক্তির সহায় তেমনি বড় একটা প্রতিবন্ধকও।

এই যোগসাধনা কার জন্য ? বীরের জন্য, সাহসীর জন্য। যোগের লক্ষ্য কোন দেবতা নয়, দেবতারও বড় হওয়া। যোগ করতে হলে চাই যোগ ব্যবস্থার উপর শ্রদ্ধা, চাই বীর্য। এই বীর্য আসে যোগের উপর বিশ্বাস থেকে। চাই স্মৃতি, অর্থাৎ স্মরণ মাত্র মনের দুয়ারে লক্ষিত বস্তুর আবির্ভাব। চাই সমাধি অর্থাৎ এক লক্ষ্যে মন স্থির রেখে অন্য সব কিছুকে চিন্তা থেকে দূর করা। চাই প্রজ্ঞা, অর্থাৎ সত্যের যথার্থ চরিত্র সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান। বিশেষ জ্ঞানের জগতে পৌঁছুতে হলে, মুক্তি পেতে হলে, এ ভাবেই যেতে হবে এগিয়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এতক্ষণ যে যোগ বিষয়ে আলোচনা করলাম তা হল পতঞ্জলির যোগদর্শনের ভিত্তিতে, তাঁর যোগসূত্রের ভিত্তিতে। কিন্তু যোগ তো সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। যোগ এগিয়েছে আরও। যোগ আরও এগিয়ে শক্তি প্রয়োগ করে সত্যকে জানবার চেষ্টা করেছে তন্ত্রে। যে সর্পসন্ধান আমরা করছি তা তন্ত্রেরই সর্প, দেহের অভ্যন্তরে একটা ঘুমিয়ে থাকা শক্তি। এই শক্তির সন্ধান পেতে হলে, একে জাগরিত করতে হলে যে যোগের সন্ধান করতে হবে তা হল তন্ত্রের যোগ। দেখা যাক তন্ত্র যোগ সম্পর্কে কি বলেছে? তন্ত্রযোগ কি যোগকে আরও এগিয়ে নিয়েছে না পিছিয়েছে? যে দর্শনের ভিত্তিতে সাংখ্য-যোগ, পতঞ্জলির যোগসূত্র, সে-দর্শন তন্ত্র স্বীকার করে না কখনও। পুরুষ এবং প্রকৃতি দুটো ভিন্ন জিনিস, তন্ত্র বলে না এ-কথাও। তন্ত্র বেদান্তেরই মত 'এক ব্রহ্মণে' বিশ্বাসী। সেই একব্রহ্মই হয়েছেন দুই। শিবরূপ সেই ব্রহ্মশক্তি শক্তিরূপে হয়েছেন জগৎকারণ। নানা স্তরে স্তরে শক্তি তৈরি করেছেন বস্তুজগৎ। পুরুষ অব্যক্ত ইচ্ছায় নিজের মধ্যে করেছেন তরঙ্গ সৃষ্টি। সেই তরঙ্গ তার কম্পনের তারতম্যে বস্তুজগতে এসে লাভ করেছে শেষ পরিণতি। পুরুষের ইচ্ছারূপ যে শক্তি, সেই সৃজনশীল শক্তিই বস্তুজগতে এসে নিজেকে নিয়েছে গুটিয়ে। শক্তিতরঙ্গোদ্ভূত বস্তু পারস্পরিক যোগাযোগে হয়েছে কর্মতৎপর। শক্তি বস্তুজগতের প্রাকৃত আবরণে পুরুষকে রেখেছে আচ্ছন্ন করে। জগৎ তার উৎসকে গেছে ভুলে, দেখতে পাচ্ছে না। তন্ত্র সেই উৎসের দিয়েছে সন্ধান। ঘুমন্ত শক্তিকে জাগরিত করে কি করে সেই উৎসে ফিরে যাওয়া যাবে বলেছে সেই কথা। তন্ত্রের যোগসাধনা এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই।

যোগ মানে কি? আমি আগে যা বলেছি, এখনও বলি তাই। যোগ মানে বিয়োগ। যে পদ্ধতি মনকে অবিদ্যা থেকে বিচ্ছিন্ন করে,

নিত্য থেকে দূরে রাখে তাই যোগ। সুতরাং একে বিয়োগ বললে যায় কি ? অবিদ্যা থেকে, অনিত্য থেকে মন বিচ্ছিন্ন হলে দেহাভ্যন্তরস্থ পরমাত্মা হন স্বরূপে প্রকাশিত। মেঘ সরে গেলে যেমন সূর্য প্রকাশিত হয় ঠিক সেই রকম আর কি।

মেঘ সূর্যকে ঢাকে বটে, সূর্যের তাতে হেরফের হয় না কিছুই। মেঘ সরে গেলেই যে-সূর্য সেই সূর্যই আবার ফুটে ওঠে। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত মতামত যা-ই হোক না কেন, এ বিষয়ে নানা শাস্ত্রের নানা মত। শাস্ত্রমতে যোগ হল জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন, সংযোগ। সেইজন্যই এর নাম যোগ। কিন্তু মিলন হল কি করে ? জীবাত্মা আর পরমাত্মা তো এক ? মিলন কথাটা উঠলেই তো জীবাত্মা পরমাত্মার দ্বৈত রূপ বোঝা যায়। কিন্তু তন্ত্র মতে, বেদান্ত মতে এই দুইই তো মিলিত অভিন্ন, তাহলে ? আসলে যোগ হল আপন স্বরূপ অনুভব। যা দেখা যায় বাইরে তা-ই হল ভ্রান্ত। আসলে সবই এক। সেই 'এক'কে অনুভবের নামই হল যোগ। জীবাত্মা পরমাত্মা যে 'এক' এই বোধটা জানাই হল যোগের লক্ষ্য। তবে যোগ নিজে এই লক্ষ্য নয়, যোগ হল এই লক্ষ্যের পথে একটি উপায় মাত্র। যোগ হল কতকগুলি দৈহিক কলা-কৌশল যার সাহায্যে দেহের অভ্যন্তরের আসল সত্যকে জানা যায়।

প্রত্যেক জীবই হল পরম সত্তা। যে দেহগত বোধ তাকে দেয় পৃথক আকৃতি, সেই দেহও পরম সত্তার সঙ্গে এক। 'আমি' 'তুমি' 'প্রাণ' 'অপ্রাণ' সবই এক। সবই সেই পরম সত্তার প্রকাশ মাত্র। এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য অদ্ভুত মায়াবলে রেখেছে এই বোধ তৈরি করে। কিভাবে এই দ্বৈত, কিভাবে অরূপ থেকে রূপ তা আমার সর্প তান্ত্রিকের সন্ধানে প্রথম খণ্ডে ব্যাখ্যা করেছি। এবার যা থেকে উৎপত্তি সেই উৎসে, আপন যথার্থ সত্তাতে ফিরে যাওয়ার কথা।

দুর্জ্ঞেয় মায়ার জন্যই এই দ্বৈত বোধ, আপন সত্তা সম্পর্কে অজ্ঞতা। এই অজ্ঞতার জন্ম হল অবিদ্যা থেকে। বিদ্যা দ্বারাই আবার অজ্ঞতা পার হয়ে সেই যথার্থ জ্ঞানে যাবে ফিরে যাওয়া।

তন্ত্রের মতে জ্ঞানই দিতে পারে মুক্তি। যাকে বলে সদ্যোমুক্তি জ্ঞান হল দু' রকমের—স্বরূপ-জ্ঞান ও ক্রিয়া-জ্ঞান। প্রথম জ্ঞান হল নির্মল চৈতন্য, এই চৈতন্যই হল যোগের লক্ষ্য। দ্বিতীয়টি হল বুদ্ধিগ্রাহ্য। এই বুদ্ধিগ্রাহ্য জ্ঞান ও সক্রিয় প্রচেষ্টা দ্বারাই প্রথমটিকে অর্থাৎ নির্মল চৈতন্যকে অর্জন করা যায়। ক্রিয়া-জ্ঞান দ্বারাই আমরা বুঝি ব্রহ্মণ কি, অব্রহ্মণই বা কি? মনকে এমন করে নিবিষ্ট রাখতে হয় সেই ব্রহ্মণের দিকে যাতে অব্রহ্মণ দূর হয়ে যায়। শেষপর্যন্ত ব্রহ্মণ ফুটে ওঠে আপন সত্তায়। অর্থাৎ মনই তখন প্রকৃতির আবরণ ভেদ করে হয়ে যায় ব্রহ্মণ। মন, অহংকার, চিত্ত, বুদ্ধি সব লোপ পায়। যতক্ষণ না ব্রহ্মণ হওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ যোগ হল ক্রমমুক্তির সাধনা।

মানুষ শুধু যে বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী তাই নয়, তার রয়েছে আরও নানা মানসিক স্তর। এ ছাড়া রয়েছে দেহ। এ-সবের দিকে লক্ষ্য রেখেই যথার্থ 'সত্য' হবার জন্য নানা যোগপদ্ধতির অবতারণা।

মন ও দেহের জন্য দ্বৈত বোধ। অথচ যা হল একমাত্র সত্য তা হল অদ্বিতীয়। 'একম সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। সুতরাং দেহ ও মনই হল সেই যথার্থ 'সত্য'-বোধের পথে প্রধান অন্তরায়। যোগ হল সেই পদ্ধতি যা দ্বারা মন, চিত্ত, অহংকার, বুদ্ধি সব কিছুকেই করা যায় নিয়ন্ত্রণ। প্রথম এসব হয় নিয়ন্ত্রিত, তারপর হয় নিষ্ক্রিয়। চিত্তবৃত্তি যখন নিষ্ক্রিয় হয় তখনই মেঘ কেটে গিয়ে সূর্য হাসে। মন, চিত্ত, অহংকার, বুদ্ধি সবই হয়ে যায় সূর্য। যে সিঁড়ি বেয়ে মন সেই উপরে উঠে গিয়ে সূর্য হতে পারে যোগ হল সেই সিঁড়ি। ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যখন ফুটে ওঠে নির্মল চৈতন্য তখনই হয় 'সমাধি'। সমাধি হল এক পরম নিস্তরঙ্গ সাম্য যাতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক হয়ে যায়। তখন মন বল, বাহ্য প্রাণ বল, কোন কিছুরই কোন ক্রিয়া থাকে না। 'আমি' এবং 'তুমি' এই বোধও লয় পায়। যে মেঘ সূর্যকে ঢেকে রাখে সেই মেঘও সূর্য হয়ে যায়। যেন নুন মিশে যায় জলে। স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্বই আর থাকে না।

কুলার্ণব তন্ত্রের মতে সমাধি হল সেই ধরনের ধ্যান—যেখানে
়খানে' 'সেখানে' বলে কোন কথা নেই। সেখানে আছে এক নিস্তরঙ্গ
ালোর সমুদ্র—জ্যোতির্ময় শূন্যতা। সমাধি হলে নিস্তরঙ্গ গভীর
মুদ্রের মত যেখানে গেলে গম্ভীর হয়ে যায় মানুষ।

মায়াতন্ত্রের মতে যোগ হল জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন, যার ফলে
ীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হয়ে যায়। কেউ একে বলেন শিব ও
ীবাত্মার মিলন। কেউ কেউ বলেন শক্তি সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানই হচ্ছে
াগ। কারো কারো ভাষায় প্রাণপুরুষ অর্থাৎ অনন্তপুরুষের জ্ঞানই
চ্ছে যোগ। কেউ বলেছেন, শিবশক্তির মিলনই হচ্ছে যোগের লক্ষ্য।
হল নির্বিকার পরম এক শান্ত অবস্থা—যে সম্পর্কে উপনিষদের
াহ্ব ঋষি রাজা বাসকলিকে বলেছিলেন—'শান্তো ইয়ম আত্মা'।

'শান্তো ইয়ম আত্মা'র স্বরূপ বোঝা যায় অশান্তবৃত্তিকে দমন করতে
ারলে তবেই। যোগ পদ্ধতির দ্বারাই তা সম্ভব। এই যোগ হল চার
রনের—মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ ও রাজযোগ। এ-সবই হল এক
াক ধরনের অভ্যাস বা সাধনা। এইসব সাধনা দ্বারা চিত্তবৃত্তিকে
ামনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যাতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার ঘটে—অর্থাৎ
রম অদ্বৈত অনুভূতি আসে।

চার রকম যোগের প্রত্যেকটির আবার আছে আটটি করে অধীনস্থ
কছু অঙ্গ—যাকে বলে অষ্টাঙ্গ। প্রত্যেকটি যোগেরই উদ্দেশ্য এক,
াদ্ধতিই শুধু পৃথক। মন্ত্রযোগে যে সমাধি তার নাম—মহাভাব।
ঠযোগ দ্বারা সমাধির নাম মহাবোধ। লয়যোগ দ্বারা সমাধির নাম হল
হালয়। রাজযোগ এবং জ্ঞানযোগের দ্বারা সমাধির নাম কৈবল্য-
ুক্তি। মন্ত্রযোগে পূজা ও ভক্তির প্রাধান্য, হঠযোগে দেহ নিয়ন্ত্রণের,
ঠ-লয় যোগে ক্রিয়া জ্ঞানের। জ্ঞানযোগে যোগী স্বরূপ-জ্ঞান লাভ
রেন মানসিক ক্রিয়ার সাহায্যে। হঠযোগী স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করেন
ুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করে শিবশক্তির মিলন ঘটিয়ে।

যোগের জন্য প্রথম প্রয়োজন অষ্টাঙ্গ, অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন,

প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। অধ্যাত্ম সাধনায় এরই সঙ্গে চাই নৈতিক মানের উন্নতি ও ধর্মীয় মানসিকতা। যোগের উদ্দেশ্য সীমিত বোধ, স্থূলবোধ, এমনকি সূক্ষ্মবোধও অতিক্রম করে দ্বৈতের উর্ধ্বে যাওয়া। আত্মবোধ (জীবাত্মবোধ) হল পূর্ণবোধের পক্ষে প্রধান অন্তরায়। এই অন্তরায়কে অতিক্রম করতে হবে। তবে যে যোগের সাহায্যে এই অন্তরায়কে অতিক্রম করতে হবে সে যোগসাধনা ধর্মবোধ না থাকলে অসম্ভব।

যোগসাধনার আগে করা চাই অষ্টাঙ্গসাধন। এই অষ্টাঙ্গসাধন হলে তবেই গুরুর কাছে যোগ শিক্ষা। অষ্টাঙ্গ সাধনার দরকার ক্রোধ লোভ, মোহ, মাৎসর্য, কাম ইত্যাদি যেসব রিপু মনকে বিব্রত করে—সে সবের হাত থেকে মনকে রক্ষা করা। তবে কারো যদি পূর্ব জন্মের পুণ্যফল থাকে তাহলে এ-জন্মে তাকে অষ্টাঙ্গ সাধনা না করলেও চলে।

প্রশ্ন হল—পূর্বজন্ম আছে কি ? জানি না, হয়তো জানা যাবে যোগ করলে। অনেক কথাই তো আমরা ভুলে যাই। একা কখনও চুপ করে মনের ভেতর ডুব দিলে মনের মধ্যে ফিরে আসে অনেক হারানো কথার স্মৃতি। যদি তেমনভাবে নিশ্চুপ হয়ে বসা যায় তাহলে হয়তো পূর্ব-জন্মের স্মৃতিও মনের মধ্যে ভেসে উঠতে পারে। তবে সে ধরনের চিন্তা আমরা করি কই ?

যোগ সাধনার আগে চাই অষ্টাঙ্গ সাধন। আবার এই অষ্টাঙ্গ সাধনের মধ্যে একটি অঙ্গ 'যম'ই হল দশ প্রকার। যেমন (১) অহিংসা, (২) সত্যম, (৩) আস্তেয়ম অর্থাৎ লোভহীনতা, (৪) ব্রহ্মচর্য, (৫) ক্ষমা অর্থাৎ ভাল বা মন্দ সব জিনিসকেই সমানভাবে নেওয়া (৬) সুখদুঃখ কোন কিছুতেই অস্থির না হওয়া, (৭) দয়া, (৮) সরলতা, আর্যবম (৯) মিতাহার ও (১০) শৌচম অর্থাৎ পবিত্রতা, অর্থাৎ সত্ত্বগুণের বিকাশ-সাধন। দেহ ও মন উভয়েরই শৌচ দরকার।

যম যেমন দশ রকমের, নিয়মও তাই। নিয়মেরও আছে দশটি প্রকার, যেমন (১) তপ, অর্থাৎ দেহ মন শুদ্ধকরণের জন্য উপবাসাদি

পালন। (২) সন্তোষ, অর্থাৎ যা পাওয়া যায় তাতেই খুশি থাকা। (৩) বিশ্বাস, আস্তিকতা। (৪) দান, দানের যোগ্য ব্যক্তিকে সৎ উপার্জন থেকে দান করা। (৫) পূজা, অর্থাৎ ঈশ্বর বা ঈশ্বরীকে ইষ্টদেবতা হিসেবে তাঁর যে-কোন রূপকে আরাধনা করা। (৬) সিদ্ধান্ত বাক্য শ্রবণ, অর্থাৎ বেদান্ত পাঠের পর শাস্ত্রবাক্যে আস্থা স্থাপন। (৭) বিনয় এবং অন্যায় কাজের জন্য অনুশোচনা। (৮) মতি, ঋষি ব্যক্তিদের লব্ধ জ্ঞানের উদ্দেশ্যে মনকে শাস্ত্রমতে ধাবিত করা। (৯) জপ বা মন্ত্র উচ্চারণ করা এবং (১০) ব্রতপালন।

তন্ত্রযোগ মতে দেহের পবিত্রতা খুব দরকার। এই দেহই হল জীবের অস্তিত্ব ও ক্রিয়াকলাপের বাহন। দেহের যদি পবিত্রতা না আসে তবে মনের পবিত্রতা অসম্ভব। বর্তমান সভ্যতা সবদিক থেকেই মনকে আকর্ষণ করার অর্থাৎ বিচলিত করার উপাদানে ভর্তি। যথাযোগ্য কর্ম ও চিন্তাই হল সাধন পথে অন্তরায় দূর করার সর্বপ্রথম পদক্ষেপ। এতে করেই মন নানা বৃত্তি থেকে মুক্ত হয়। এইসব বৃত্তিই পরমাত্মাকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

দেহ মন শুদ্ধকরণের জন্যই করা হয়েছে আসন ও প্রাণায়ামের ব্যবস্থা। আসন হল একটা নিয়ম করে বসা, যেমন পদ্মাসন। আর প্রাণায়াম হল শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ। এ দুইই হঠযোগের সঙ্গে যুক্ত। প্রত্যাহারকরণ অর্থ হল শুদ্ধ মনের কাছে ইন্দ্রিয়কে বশ্যতা স্বীকার করানো। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় থেকে মন তখন সরে যায়। মন স্বভাবতই দুর্বল। দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ সব কিছুতেই মনের মধ্যে ঘটে যায় বড় রকমের আলোড়ন। সুতরাং ইন্দ্রিয় থেকে মনকে বিচ্ছিন্ন করতে না পারলে মনের স্থৈর্য আনা অসম্ভব। মনের স্থৈর্য ও ধৈর্য আনাই হল প্রত্যাহারের উদ্দেশ্য।

মনের শৃঙ্খলা চূড়ান্ত হবে তখনই যখন তিন অন্তরঙ্গ অর্থাৎ অন্তরের তিনটি অঙ্গকে যাবে নিয়ন্ত্রিত করা। অন্তরের এই তিনটি অঙ্গ হল ধ্যান, ধারণা ও সবিকল্প সমাধি। ধারণা হল কোন বিশেষ বিষয়ে মনকে

কেন্দ্রীভূত করা। যেমন, হৃদপদ্মে, মস্তকের কোন কেন্দ্রে বা দেহের অন্য কোন স্থানে। প্রত্যাহারের দ্বারা মনকে সরিয়ে নিতে হবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় থেকে। তারপর ধারণার দ্বারা মনকে স্থির নিবদ্ধ করতে হবে চিন্তাযোগ্য বিষয়ের উপর। মনকে বিশেষ স্থানে স্থির রেখে এক বিশেষ ধরনের বৃত্তিতরঙ্গ উত্থিত করা যেতে পারে। এই একাগ্রচিত্ত চিন্তার ফলে যে তরঙ্গ সৃষ্টি হয় অন্য কোন ধরনের তরঙ্গ তাকে আচ্ছন্ন করতে পারে না। ধীরে ধীরে তখন বিশেষ একটি তরঙ্গই হয়ে ওঠে প্রবলতম। শেষপর্যন্ত অন্য তরঙ্গগুলি হারিয়ে যায়। অবশেষে মনের অবজ্ঞায় অন্য সব বৃত্তিগুলি মরে যায়। তখন একাগ্রচিত্ত চিন্তা ধ্যানরূপে দেখা দেয়। এই ধ্যানে ধ্যেয় বিষয় মনের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। এই ধ্যান করা যায় দু' ধরনের—(১) সগুণ ধ্যান, অর্থাৎ কোন মূর্তি কল্পনা করে ধ্যান ও (২) নির্গুণ ধ্যান, অর্থাৎ যে ধ্যানে মনকে ধাবিত করা হয় আত্মার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধির জন্য নিস্তরঙ্গ কোন মহাশূন্যতার দিকে।

শেষ অঙ্গ হল সমাধি। এটা হল অষ্টম অঙ্গ। এই সমাধি হল এমন জিনিস যেখানে নুন ও জলের মিশে যাবার মত আত্মা এবং মন মিশে যায় এক পরম অদ্বৈতে। তখন শুধুমাত্র একটি তরঙ্গ। সমাধি মানেই পরা সংবিত অর্থাৎ পরম চৈতন্য হয়ে যাওয়া। সমাধি আছে দু' ধরনের—(১) সবিকল্প ও (২) নির্বিকল্প। ধ্যেয় বস্তুর সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে মন যখন অপার আনন্দে স্থির হয় তখন হয় সবিকল্প সমাধি। ধ্যেয় বস্তুর সঙ্গে মিশে গিয়ে মনের যখন পৃথকভাবে আর কোন অস্তিত্বই থাকে না তখন হয় নির্বিকল্প সমাধি। তখন এক নিস্তরঙ্গ অমৃত-সমুদ্র। মহাশূন্যতায় সে এক তূরীয়াতীত অবস্থা।

অদ্বৈত বেদান্তের মতে সবিকল্প বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধির তিন অবস্থা—(১) ঋতম্ভরা অবস্থা (২) প্রজ্ঞালোকা অবস্থা ও (৩) প্রশান্ত-বাহিতা অবস্থা। প্রথমটিতে মানসিক বৃত্তির অবস্থা হল সচ্চিদানন্দ অবস্থা। তখনও জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র সম্পর্ক, অর্থাৎ মনের তখনও

সামান্য পৃথগাবস্থা। দ্বিতীয়টিতে সমস্ত আবরণ সরে গিয়ে উদয় হয় ব্রহ্মজ্ঞানের। তৃতীয় অবস্থাতে সকল বৃত্তির ক্রিয়া শান্ত এবং স্থির। বৃত্তিহীন চিত্তে তরঙ্গ আসে নিস্তরঙ্গ হয়ে। জীবাত্মা হয়ে ওঠে শুদ্ধ ব্রহ্মের সমার্থক। নির্বিকল্প সমাধির এই হল প্রবেশ পথ। তারপরই পরম নির্বিকল্প অবস্থা যেখানে পরম নিস্তরঙ্গ অস্তিত্ব স্থির সমুদ্রের মত মহাশান্ত। আত্মা তখন 'শান্তো ইয়ম আত্মা'। এই নির্বিকল্প সমাধি অর্জন করা যায় রাজযোগের সাহায্যে।

ধারণা, ধ্যান ও সবিকল্প সমাধি, যাকে বলে সংযম, এ-সবই হল মন-সংযোগের কয়েকটি ধাপ মাত্র। হঠযোগের মতে এ হল প্রাণায়ামের ক্রমোন্নতি—প্রাণশক্তির দীর্ঘ ধারণ—a longer period of retention of Prana. যম, নিয়ম ও আসন দ্বারা হয় দেহ নিয়ন্ত্রণ। এর সঙ্গে প্রাণায়ামযোগে হয় প্রাণের নিয়ন্ত্রণ। এগুলির সঙ্গে প্রত্যাহার মিলে ইন্দ্রিয়কে করে নিয়ন্ত্রিত ও বশীভূত। এর পরই ধারণা, ধ্যান ও সবিকল্প সমাধিযোগে মনের ক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে শুধু থাকে বুদ্ধি। এরপর আনন্দদুঃখরহিত হবার সাধনা করলে হয় বুদ্ধিরও লয়, তখন যোগী লাভ করেন আত্মার অবিকৃতরূপ। বুদ্ধি মিশে যায় প্রকৃতি ও ব্রহ্মণে—যেমন নুন মিশে যায় জলে বা কর্পূর উবে যায় আগুনে।

মন্ত্রযোগে মন নিয়ন্ত্রিত হয় নিজেরই বিষয়ে। বাইরের যে বিষয়ীভূতজগৎ সে তো মনেরই নাম এবং রূপ। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই তৈরি নাম ও রূপ দিয়ে। নিজের মনের প্রক্ষেপকেই মন দেখে পৃথক করে। এর প্রমাণ, মন যদি নিষ্ক্রিয় হয় বিষয় থাকে না। গভীর মনঃসংযোগে বসে থাকলে, কোন একটা বিশেষ বিষয়ে চিন্তা করলে, অন্যবিষয় আশেপাশে থাকা সত্ত্বেও তার কোন অস্তিত্ব থাকে না মনের কাছে। সুতরাং বাহ্য বিষয় মনের প্রক্ষেপ ছাড়া আর কি? যদিও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব কোন স্বতন্ত্র মনের প্রক্ষেপের উপর নির্ভর করে না। এসব হল কারণ-মন বা মহামানসের মানস প্রক্ষেপ। যেহেতু স্বতন্ত্র মন সেই মহামানসের সঙ্গে এক, সুতরাং বিষয় বা বস্তু মনের প্রক্ষেপ ছাড়া

আর কি? তবে স্বতন্ত্র মনও তখন মহামানসেরই একটি প্রক্ষেপ মাত্র। ধরতে গেলে মনের প্রক্ষেপ ছাড়া বাইরের অস্তিত্বের অন্য কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। মনই রূপান্তরিত হয়েছে বস্তুতে। মনের এই রূপান্তরই হল বৃত্তি। মন কখনই তার ভাব বা অনুভব থেকে মুক্ত নয়। যে স্তরে তার যে ভাব বস্তুর অস্তিত্ব সেই অনুযায়ী। মনের এই ভাবের উপরই মানুষের চরিত্র। যে মন সংসারে আকৃষ্ট সে মন সংসারী-চরিত্রের। যে মন অধ্যাত্মতায় আকৃষ্ট সে মন অধ্যাত্ম-চরিত্রের। এইজন্য সত্যকে জানতে হলে ভাবশুদ্ধি প্রয়োজন প্রথম। মাটিতে পড়ে গেলে মাটিতে ভর করেই যেমন লোকে ওঠে তেমনই পার্থিব বন্ধন ছেড়ে মুক্তি পেতে হলে পার্থিব বন্ধনকেই উপায় হিসেবে ব্যবহার করতে হবে প্রথম।

মন বিভ্রান্ত হয় নামরূপের দ্বারাই সর্বাগ্রে। সুতরাং নামরূপকেই মুক্তির প্রথম কারণ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। মন্ত্রযোগ হল নামরূপেরই একটা আকার। নামরূপ জপ করতে করতেই আসে শুদ্ধ ভাব। নামরূপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য ধ্যানের বিষয়রূপে নামরূপকেই দেওয়া হয় প্রথম। এই নামরূপের ধ্যানই হল পঞ্চদেবতার স্থূল ধ্যান বা সগুণ ধ্যান।

বিভিন্ন যোগের অষ্টাঙ্গের বাইরেও আরও কিছু আছে পূজার ব্যবস্থা বা দেহ মনকে তৈরি করার ব্যবস্থা। এতে আছে স্থূল জগৎকে ব্যবহার করে স্থূল জগৎকে অতিক্রমের উপায়। এই স্থূল থেকে শেষ পর্যন্ত যাওয়া যায় সূক্ষ্মে। বস্তু থেকে বস্তুর অতীতে। এই স্থূল সাধনার পরেই জ্ঞানযোগ সাধনা সহজ হয়ে ওঠে। স্থূলকে অতিক্রম করার জন্য স্থূল সাধনার ভিত্তি হল—(১) মূর্তি, (২) প্রতীক, লিঙ্গ, শালগ্রাম ইত্যাদি। (৩) চিত্র, (৪) ভিত্তিরেখা, (৫) যন্ত্র, (৬) মুদ্রা ও (৭) ন্যাস। এর সঙ্গে রয়েছে মন্ত্র, যা সশব্দেও উচ্চারণ করা চলে বা মনে মনেও বলা চলে।

বীজমন্ত্রের উৎস 'প্রণব' হল আদি শব্দের সমান। যে শব্দের উদ্ভব হয়েছিল মূল প্রকৃতিতে গুণক্ষোভের ফলে। সেই প্রথম শব্দের

পর স্তরে স্তরে যেমন দেখা দিয়েছিল সৃষ্টি তেমনই নানা বীজমন্ত্র এসেছিল প্রকৃতির সেই সগুণ আকারের সৃষ্টির সঙ্গে তাল রেখে। এসেছে বহু দেবতা ও দেবী। সুষম বা গুণসাম্য প্রকৃতি যখন লাভ করে বৈষম্য বা গুণক্ষোভ তখনই এসেছে এইসব দেবদেবী। বৈদিক ঋষিরা দেবতাকল্পনা এই বিশ্বাসের প্রভাবেই করেছিলেন কি না কে বলবে, কারণ বৈদিক দেবতারাও নানা স্তরে শক্তি হিসেবে পূজিত। মন্ত্রযোগের মাধ্যমে যে সমাধি তাকেই বলে মহাভাব। অন্য কোন যোগ পদ্ধতি যাদের পক্ষে উপযুক্ত নয় তাদেরই জন্য মন্ত্রযোগের ব্যবস্থা।

স্থূল শরীরকে নিয়ন্ত্রণের জন্য যে যোগ তারই নাম হঠযোগ। স্থূল শরীরই সূক্ষ্ম শরীরের সঙ্গে যুক্ত। স্থূল শরীর হল সূক্ষ্ম দেহের কোষ মাত্র। সূক্ষ্ম দেহ যেন তরবারি যাকে আবরিত করে রেখেছে স্থূল শরীর। দুইয়ের যোগ যখন অবিচ্ছেদ্য তখন একক নিয়ন্ত্রিত করলে অপরের উপর তার প্রভাব পড়বেই। এই সূক্ষ্ম শরীরের মধ্যেও রয়েছে বুদ্ধি, ভাব, কামনা, বাসনা ইত্যাদি। নিজের কর্মফল ভোগ করার জন্য সূক্ষ্ম শরীরই সৃষ্টি করে প্রয়োজন অনুপাতে স্থূল শরীর। সুতরাং এই স্থূল শরীরকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, সূক্ষ্ম শরীরও সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে। এই স্থূল শরীরের উপর সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর উপাদান দিয়ে গঠিত আছে আরও পাঁচটি কোষ। পাঁচটি কোষের শেষ পর্যায় পার হওয়া যায় যদি সংস্কারকে অতিক্রম করা যায়। সংস্কার বা প্রারব্ধ স্থূল থেকে সূক্ষ্মে নানা ভাবে ছড়িয়ে থাকে। স্থূল দেহ নিয়ন্ত্রিত হলে তা আশ্রয় নেয় সূক্ষ্মে। সেখানে তাকে ধাওয়া করলে সে পালায় সূক্ষ্মতরে। এইভাবে ষষ্ঠ পর্যায় পার হলে তবেই প্রারব্ধ থেকে, পূর্বজন্মের বা জন্ম জন্মান্তরের কর্মফলের হাত থেকে মুক্তি। সেইজন্যই বোধহয় তন্ত্রে হঠযোগে ষটচক্রভেদের ব্যবস্থা। এই চক্রগুলি থাকে স্থূল থেকে সূক্ষ্ম দেহের স্তরে স্তরে সাজানো। চক্রভেদ মানে একে একে দেহের প্রতিটি কোষকে অতিক্রম করা। হঠযোগে বলা হয়েছে এই অতিক্রম করার পদ্ধতির কথা।

হঠযোগে আছে বাহ্যদেহ অর্থাৎ স্থূলদেহ নিয়ন্ত্রণের এমন ব্যবস্থা যাতে সূক্ষ্মদেহও নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহের বৃত্তিরও পরিবর্তন হয়। অবশ্য এই দেহ-নিয়ন্ত্রণ নিজেই কোন উদ্দেশ্য নয়, এ হল উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক। এইজন্য কুলার্ণবতন্ত্র বলেছে 'পদ্মাসনে বসলেও হবে না, নাসাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেও যোগ সাধনা হবে না। যোগ হবে জীবাত্মার ও পরমাত্মার মিলন হলে তবেই।'

মন্ত্রযোগেই কেবল বাইরের জিনিসের সঙ্গে সংযোগ—(যদিও নাম এবং রূপ বাইরের নয়)। যার ফলে এসেছে কতকগুলি পূজো-পার্বণের ব্যবস্থা। এসেছে নিয়মকানুন। এ-সবই এসেছে ব্যক্তির যোগ্যতা অনুসারে, যেমন সমাজের চার বর্ণের লোকের এক একজনকে দেওয়া হয়েছে এক একটি দায়িত্ব। আবার পুরুষকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নারীকে তা দেওয়া হয়নি। মন্ত্রযোগের সাহায্যে বাইরের উপাসনার ফলে আসে মহাভাব।

মন্ত্রযোগ যা-ই বলুক, হঠযোগ তার কোন মূল্য দেয় না। হঠযোগ মনে করে দেহ সাধনার দ্বারা সূক্ষ্মকে প্রভাবিত করে পরম স্থানে যেতে হবে। দেহ উপযুক্ত না হলে এ সাধনা অসম্ভব। সেজন্য দেহশুদ্ধি প্রয়োজন প্রথম। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য হঠযোগ দেয় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের উপর বেশি জোর। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত হলেই মনও নিয়ন্ত্রিত হয়। এইজন্য মন্ত্রযোগের জন্য যে আসন আর প্রাণায়ামের দরকার, হঠযোগের জন্যও দরকার সেই আসন আর প্রাণায়ামের। মন্ত্রযোগীরা যদি হঠযোগের ক্রিয়াকৌশল আয়ত্ত করেন তাহলে মন্ত্রযোগের ঊর্ধ্বেও লাভ করবেন অধ্যাত্ম সাধনার ভিন্ন সোপান। আবার হঠযোগীরা যদি মন্ত্রযোগ করেন তাঁরাও লাভবান হবেন মন্ত্রযোগ থেকে। হ এবং ঠ এই নিয়ে হঠ। হ অর্থ সূর্য, ঠ অর্থ চন্দ্র অর্থাৎ প্রাণ এবং অপান বায়ু। প্রাণ থাকে হৃৎপিণ্ডে। সে অপান বায়ুকে টেনে তুলে মূলাধার থেকে। আবার অপান বায়ুও টানে প্রাণ বায়ুকে। যেন একটা বাজপাখির পায়ে সুতো বাঁধা। সুতো হল

অপান বায়ু, বাজপাখি প্রাণবায়ু। প্রাণবায়ু উড়ে যাবার চেষ্টা করলে অপান বায়ু তাকে টানে। আবার অপান বায়ু নিচে নেমে গেলে প্রাণবায়ু তাকে টেনে তুলে। দুয়ে যখন আসে একটা সমঝোতায়, তখনই মুক্তি।

সুষুম্নাতে এই দুই বায়ুর মিলনই হল যোগ। যে পদ্ধতি এই সংযোগ সাধন করে তার নাম প্রাণায়াম। হঠযোগ অর্থ এইজন্যই হঠবিদ্যা অর্থাৎ প্রাণবিদ্যা। কারণ, নানা ধরনের প্রাণবায়ু নিয়েই এর কারবার। ব্যক্তিদেহের প্রাণ সেই মহাবিশ্বের প্রাণেরই একটা অংশ মাত্র। এই যোগের মাধ্যমে হয় সেই ব্যক্তিপ্রাণ বা ব্যষ্টিপ্রাণের সঙ্গে বিশ্বপ্রাণের একটা যোগাযোগ করিয়ে দেবার চেষ্টা। এ দুয়ের সংযোগ হলেই শক্তি এবং স্বাস্থ্য।

নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত হলেই মন দৃঢ় হয়। এর ফলে মনঃসংযোগ হয় নিবিড়তর। অধ্যাত্ম, অধিভূত এবং অধিদৈব এই তিনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে রয়েছে, মন, প্রাণ এবং বীর্য। মনকে নিয়ন্ত্রিত করলেই নিয়ন্ত্রিত হয় প্রাণ এবং বীর্য। প্রাণকে নিয়ন্ত্রিত করলে হয় বীর্য ও মন নিয়ন্ত্রিত। বীর্য নিয়ন্ত্রিত হলে, স্থূলবীজ হিসেবে তার অধোগতি নিয়ন্ত্রিত হলে আরম্ভ হয় ঊর্ধ্বগতি। বীর্য ঊর্ধ্বগতি হলেই মন এবং প্রাণের উপর আনে সহজ নিয়ন্ত্রণ। প্রাণায়াম করলে বীর্য যায় শুকিয়ে। তখন নিচে তার গতি না হয়ে গতি হয় ঊর্ধ্বমুখী। নিম্নগামী বীর্য পঙ্কিল। ঊর্ধ্বগতি বীর্য অমৃত, যে অমৃতরস শিবশক্তির।

যোগের জন্য যে অষ্টাঙ্গ ব্যবস্থা তার একটি হল প্রাণায়াম। মন্ত্রযোগ, লয়যোগ ও রাজযোগ, যে যোগই করা যাক না কেন—প্রাণায়ামের ব্যবহারে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণই হল মোক্ষলাভের বড় উপায়। প্রাণপ্রবাহের গতির সঙ্গে সঙ্গে চিত্তবৃত্তির চরিত্র। প্রাণপ্রবাহ যদি নিম্নমুখী হয় চিত্তবৃত্তিও হবে নিম্নমুখী। আবার প্রাণপ্রবাহ যদি ঊর্ধ্বমুখী হয় চিত্তবৃত্তিও হবে ঊর্ধ্বমুখী। সুষুম্নাতে হ এবং ঠ-এর মিলন হলে—অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য মিলে গেলে প্রাণপ্রবাহ ঊর্ধ্বে উঠে চলে ব্রহ্মরন্ধ্রের দিকে। তখনই হয় সমাধি।

এই যে হঠযোগ, যা দেহকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে প্রাণ এবং মনকে উর্ধ্বমুখী করে—সেই হঠযোগ অভ্যাসের জন্য স্থান কাল ও আহার-বিহারের জন্য বিজ্ঞানসম্মত কিছু নির্দেশও আছে। হঠযোগের যোগ-পদ্ধতি সাত ভাগে বিভক্ত। যেমন (১) শোধন (অর্থাৎ ছয়টি বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে দেহের পরিচ্ছন্নতা, যাকে বলে ষটকর্ম)। (২) দৃঢ়তা (আসন দ্বারা শক্তি বা দৃঢ়তা সঞ্চয়)। (৩) স্থিরতা (মুদ্রা দ্বারা স্থৈর্য অর্জন)। (৪) ধৈর্য (প্রত্যাহার দ্বারা অর্থাৎ ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ দ্বারা মনের দৃঢ়তা)। (৫) লাঘব (অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা হাল্কাবোধ)। (৬) ধ্যান (মনঃসংযোগ দ্বারা লক্ষ্যবস্তুর অনুভব)। এবং (৭) নির্লিপ্ততা (সমাধিতে বহির্বিশ্ব থেকে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করা)।

বায়ুপিত্তকফে যাদের সাম্য নেই, তাদের দরকার ষটকর্ম করে দেহশুদ্ধি, যাতে প্রাণায়াম সহজ হয়। যাদের এই সাম্য আছে তাদের ষটকর্মে দরকার নেই। প্রাণায়ামই তাদের পক্ষে যথেষ্ট। দেহশুদ্ধ হলে, পরিশুদ্ধ হলে স্বাস্থ্যের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী! ভেতরের অগ্নি তখন অনেক বেশি শক্তিশালী। তখন নিঃশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে কুম্ভক করা যায় অত্যন্ত সহজে। দুর্বল দেহকে সুস্থ করার জন্য ওষুধ প্রয়োগেরও ব্যবস্থা আছে, যাকে বলে ঔষধি যোগ।

ষটচক্র অর্থাৎ যা দ্বারা দেহশুদ্ধি হয়, তা হল এইগুলি, যেমন, (১) ধৌতি। ধৌতিও চার রকম যেমন, (ক) অন্তর ধৌতি, (খ) দন্ত ধৌতি, (গ) হৃৎ ধৌতি অর্থাৎ গলা ও বুক ধোয়ানো। (ঘ) মূল ধৌতি। অন্তর ধৌতিও আবার চার রকম যেমন, (১) বাতসার। এতে উদরে বায়ু টেনে নিয়ে আবার তাকে বের করে দেওয়া হয় বাইরে। (২) বারিসার, এতে দেহে জল নিয়ে দেহকে পরিপূর্ণ করা হয়। তারপর গুহ্যদ্বার দিয়ে আবার বের করে দেওয়া হয় সেই জল। (৩) বহ্নিসার (এতে নাভিদেশকে স্পর্শ করানো হয় মেরুদণ্ডে)। এবং (৪) বহিষ্কৃতি (এতে কাকিনী মুদ্রার সাহায্যে উদর ভর্তি করা হয় বায়ুতে। এই বায়ুকে ঘণ্টাদেড়েক রেখে দেওয়া হয় দেহের মধ্যে। একে শাস্ত্রে বলা হয়েছে অর্ধযাম।)

দন্তধৌতিও চার রকম, যেমন, দন্তমূল, জিহ্বা, কান এবং কপালরন্ধ্র পরিষ্কারকরণ। নাসাপানের সাহায্যে করা যায় এটা।

হৃৎধৌতি দ্বারা করা যায় কফ, পিত্ত ও মল নিষ্কাষণ। এটা করা হয় দন্ত ধৌতি ও বাস ধৌতির সাহায্যে। বাস ধৌতিতে একটি কাঠি বা কাপড় ঢুকিয়ে দেওয়া হয় গলা দিয়ে কিংবা একখণ্ড কাপড় শেষ দিকটা বাকি রেখে সম্পূর্ণ টা গিলে ফেলা হয়, তারপর টেনে টেনে বের করা হয় বাইরে। ভেতরের যত গলদ তা বেরিয়ে আসে কাপড়ের সঙ্গে। প্রচুর জল খেয়ে গলায় আঙুল দিয়ে বমি করেও করা যায় ধৌতিকার্য।

মূল ধৌতি করা হয় অপান বায়ুর নিষ্ক্রমণের পথ পরিষ্কার রাখতে।

ষটকর্মের দ্বিতীয় কর্ম হল বস্তি। বস্তি হল দু' রকমের শুষ্ক ও সিক্ত। এই দ্বিতীয় কর্মে যোগী বসেন উৎকটাসনে। বসেন নাভি পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে রেখে। অশ্বিনীমুদ্রা দিয়ে গুহ্যদ্বার সংকুচিত করেন এবং বিকোচিত করেন। কখনও কখনও করেন পশ্চিমোত্তান আসনও। নাভির নিচে তলপেটকে ধীরে ধীরে সঞ্চালন করা হয়। এমনি করে নেতিতে করেন নাসারন্ধ্র পরিষ্কার। লাউলিকিতে পেটের মধ্যে ঘূর্ণন সৃষ্টি করা হয় বারে বারে একদিক থেকে আর একদিকে। ত্রাটক যোগে যোগী নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন কোন কিছুর দিকে। তাকিয়ে থাকেন ততক্ষণ যতক্ষণ না চোখ দিয়ে জল ঝরছে। এতে নাকে দিব্যদৃষ্টি হয়। কফ নিষ্ক্রমণের জন্য করা হয় কপালভাতি। এই কপালভাতিও তিন রকম: (১) বাতক্রম: নিঃশ্বাস নেওয়া ও নিঃশ্বাস ছাড়া। (২) ভূতক্রম: নাক দিয়ে জল নিয়ে মুখ দিয়ে বের করে দেওয়া। (৩) শিৎক্রম: মুখ দিয়ে জল নিয়ে নাক দিয়ে বের করা। এসব ক্রিয়া দ্বারা দেহকে করা হয় শুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন। এর পরই আসন।

আসন হল হঠযোগের তৃতীয় পর্যায়। এই আসনের দ্বারাই লাভ করা যায় দৃঢ়তা ও শক্তি। আসন হল দেহের কতকগুলি ভঙ্গী, অর্থাৎ বসার ভঙ্গী। তবে আসন বলতেই যে বসে বসে অঙ্গের কতকগুলি ভঙ্গী করতে হবে তা নয়। এমন আসন আছে যা করতে হয় পেট

দিয়ে, বুক দিয়ে, হাত দিয়ে। আসন কত বলা শক্ত। কারো কারো মতে যত জীব তত আসন। শাস্ত্রে আছে এর সংখ্যা ৮৪০০০০০! এর মধ্যে ১৬০০ আসন হল সবচাইতে ভাল। এর মধ্যেও আবার মানুষের পক্ষে কল্যাণকর হল ৩২টি। সবচেয়ে বেশী প্রচলিত হল দুটি আসন। মুক্ত পদ্মাসন ও বুদ্ধ পদ্মাসন। মুক্ত পদ্মাসনে ডান পা রাখা হয় বাম জানুর উপর। আড়াআড়িভাবে হাতও রাখা হয় সেই-ভাবে জানুর উপর। চিবুক রাখা হয় বুকের উপর। দৃষ্টি রাখা হয় নাসিকাগ্রে। বুদ্ধ পদ্মাসনেও বসার ভঙ্গী এক। শুধু হাত যায় পেছন দিক দিয়ে। ডান হাতে ধরা হয় ডান পায়ের আঙুল, বাঁ হাতে বাঁ পায়ের। এর ফলে মূলাধারের উপর পড়ে বিশেষ রকমের চাপ।

যোগের যে কুণ্ডলী-যোগ, তা করা হয় আসন এবং মুদ্রাতে। এমন করে আসন করা হয় যাতে পায়ের চাপ পড়ে লিঙ্গকেন্দ্রে, গুহ্যদ্বারের কাছাকাছি। হাত চাপ দেয় চোখ, কান ও নাসারন্ধ্রে। এ মুদ্রার নাম যোনিমুদ্রা। ডানপায়ের গোড়ালি দিয়ে চাপ দিতে হয় মলদ্বারে আর বাঁ পায়ের গোড়ালি দিয়ে লিঙ্গকেন্দ্রে। খেচরী মুদ্রা করে উল্টে দেওয়া হয় জিব্ যাতে কণ্ঠ রোধ হয়ে যায়।

তন্ত্রে আছে আরও কয়েকটি আসনের কথা যেমন, মুণ্ডাসন, চিতাসন ও শবাসন। মুণ্ড দিয়ে তৈরী আসনের নাম মুণ্ডাসন। চিতার মধ্যে তৈরি আসন হল চিতাসন অর্থাৎ শ্মশানে তৈরি আসন। শবের উপর তৈরি আসন হল শবাসন, শবাসনে শবের অর্থাৎ মৃতদেহের পিঠের উত্তরমুখী আসনে বসেন সাধক। মৃতের পিঠে আঁকেন যন্ত্র। তারপর মন্ত্রজপ করেন ষোড়শন্যাস করে। শবের মাথায় পুজো করেন। আসনের জন্য মৃতদেহ নির্ধারণ করা হয় এই কারণেই, যে এর চাইতে পবিত্র দেহ আর নেই। এতে তখন আর কোন মানসিক ক্রিয়া থাকতে পারে না। ইন্দ্রিয়গুলিও নিষ্ক্রিয় থাকে। দেহের মধ্যে শুধুমাত্র থাকে ধনঞ্জয় বায়ু। কারণ দেহ যতক্ষণ ততক্ষণ দেহের মধ্যে এ বায়ু থাকবেই। যে দেবতাকে আহ্বান করা হয় এই মৃত দেহে,

তিনি হলেন মহাবিদ্যা। মহাবিদ্যার স্বরূপ হল নিগুণ ব্রহ্মণ। মন্ত্র দ্বারাই তিনি হয়ে উঠেন সগুণ। নিক্রিয় পবিত্র দেহে দেবতা আবির্ভূত হন মন্ত্রের জোরে। উপযুক্ত ক্রিয়া হলে মৃতের মুণ্ড ঘুরে যায়। সাধকের দিকে ফিরে তাকিয়ে সে তখন কথা বলতে আরম্ভ করে। বলে, বর প্রার্থনা করতে! সাধক চাইতে পারেন অধ্যাত্মমুক্তি বা পার্থিব সম্পদ। যা চাইবেন তাই পাবেন। নীলসাধনার এক অঙ্গ হল এই সাধনা। একমাত্র বীরই করতে পারেন এই সাধনা। কারণ ভয়ঙ্কর সব দৃশ্য এসে বিঘ্ন ঘটায় এই সাধনার সময়।

কিন্তু আমি ভাবি দেহের ভিতরই যখন রয়েছে সবকিছু তখন বাহ্যিক এই শব সাধনার কি প্রয়োজনীয়তা! মুণ্ডাসন না পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে সাধনারই বা দরকার কি? মুণ্ড মাটিতে রেখে যদি শীর্ষাসন করেন, তাহলে ধ্যানশক্তি বেড়ে যেতে পারে এত যে অভীষ্ট লক্ষ্যকে লাভ করা যায় অতি সহজেই। বৈরাগ্য না হলে নিগুণকে পাওয়া যাবে কি করে? সকল বৃত্তির নাশ হয় চিতাগ্নিতে। শোক, দুঃখ বেদনার চিতাগ্নিতে মানুষের হৃদয়ও পরিণত হয় শ্মশানে। হৃদয়কে বৃত্তিশূন্য করলেই তো তা চিতা। তখন সেখানে শূন্যতা থাকতে পারে অনায়াসেই। যথার্থ শবাসন আছে যৌগিক ব্যায়ামে মনকে চিন্তারহিত করে শবের মত পড়ে থাকাতে। দেহের মধ্যে সেই নিগুণকে ধরবার জন্যই তো সাধনা, তন্ত্র, ষটচক্রভেদ। মনকে যদি সত্যিই নির্লিপ্ত করতে পারেন তাহলে শবের পিঠে বসার প্রয়োজন কি? তখন এই বৃত্তিহীন দেহই শব হবে। জাগ্রত কুণ্ডলিনী তখন মন্ত্রের কাজ করে ব্রহ্মরন্ধ্রে। শবের মুণ্ডে মন্ত্রাচারের প্রয়োজন নেই। আকাঙ্ক্ষিত অধ্যাত্ম আনন্দ পাওয়া যায় নিজেকে শব করলে তবেই, শবের পিঠে বসে নয়।

আসলে বাহ্যিক আসন হল সুস্থ চিন্তার জন্য দেহকে পরিচ্ছন্ন করা, উপযুক্ত করা। মেশিন যদি ভাল না হয় তাতে নিখুঁত কাজ পাওয়া অসম্ভব। মেশিনকে ঠিকঠাক রাখাই হল আসন। আসনে প্রথম প্রথম কষ্ট হয়। অভ্যাস হলে আসন হল নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতই সহজ

ও আনন্দের। তমঃ ও রজঃগুণ বিশেষ করে রজঃগুণ, মনে তৈরি করে চাঞ্চল্য। সেই চাঞ্চল্য দূর হয় আসনে। সঠিক আসন তৈরি করে চিত্তসাম্য।

হঠযোগ বলেছে নানা আসনের কথা। এক একটি আসনের এক একটি গুণ। কিন্তু শুধুমাত্র দেহের কলাকৌশলে হয় ব্যায়াম, আসন নয়। সাধনার জন্য আসনে আছে একটি স্থির লক্ষ্য। এধরনের ব্যায়ামাসনে শরীর রোগমুক্ত হয়। এতে দেহের বিভিন্ন অংশ সরাসরি প্রাণ বায়ুর স্পর্শ লাভ করতে পারে। এ আসনে প্রাণায়াম সহজ হয়, সহজ হয় কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ। কিন্তু শুধু আসনেই তো হবে না, চাই অহিংসা, চাই মিতাহার। আসনও পারে অনেকটা এগিয়ে দিতে। যেমন, সিদ্ধাসনে বসে যদি মূলাধারে পায়ের গোড়ালি দিয়ে চাপ সৃষ্টি করা যায়, আরেক গোড়ালি দিয়ে স্বাধিষ্ঠানে, তাহলে উন্মনী অবস্থা আসতে পারে অতি সহজেই।

সাধনার জন্য চাই চিত্তের ধৈর্য, স্থিরতা। এ স্থিরতা আনা যায় মুদ্রার সাহায্যে। মুদ্রা হল দেহের কতকগুলি ভঙ্গী। এ হল এক ধরনের স্বাস্থ্যপ্রদ ব্যায়াম। রোগ নাশক, আঘাত নাশক। অগ্নির দাহিকা জলের সিক্ততা, বায়ুর প্রকোপ সবার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে মুদ্রা। মুদ্রার দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি হলে মনের উপরও তার প্রভাব পড়ে। ভাল স্বাস্থ্য মনকে নানা ভাবে ভারমুক্ত করে। সুস্থদেহ এবং সুস্থ মনের সংযোগ হলেই সিদ্ধি। এই জন্যই মুদ্রাকে বলা হয় কুণ্ডলিনী শক্তির দুয়ার খোলার চাবি। সব যোগের জন্য প্রত্যেকটি আসন, প্রত্যেকটি মুদ্রার প্রয়োজন নেই। যেমন কুণ্ডলিনী যোগের জন্য প্রয়োজন দশ ধরনের মুদ্রার। এর মধ্যে খেচরী মুদ্রা হল প্রধান। সিদ্ধাসন হল সর্বোত্তম, সিদ্ধাসনে বসে যোনিমুদ্রার সাহায্যে যোগী চোখ কান নাক মুখ সব আবৃত করেন, যাতে বাইরের কোন প্রভাব পড়তে না পারে দেহের উপর। যোনিমুদ্রাতে পায়ের গোড়ালি দিয়ে চাপ দেওয়া হয় লিঙ্গ বা মলদ্বার অঞ্চলের সামান্য একটু উর্ধ্বে। এর

পরই যোগী কাকিনীমুদ্রা দ্বারা নেন প্রাণবায়ু। প্রাণবায়ুর সঙ্গে যোগসাধন করেন অপান বায়ুর। তারপর চিন্তা করতে থাকেন দেহের মধ্যে ছয়টি চক্রের। স্তরে স্তরে চক্রে চক্রে উঠতে থাকে কুণ্ডলিনী 'হুং হংসঃ' এই মন্ত্রের সাহায্যে। হং-এর সঙ্গে জেগে ওঠে সূর্যতেজ। কুণ্ডলী শক্তিতে সৃষ্টি হয় উত্তাপ। 'সঃ' শব্দে জেগে ওঠে কাম বা ইচ্ছা। মূলাধারে বায়ু থাকে সোমসূর্যরূপী হয়ে অর্থাৎ চন্দ্র-সূর্য-একত্রে। হং কুণ্ডলিনীকে জাগরিত করে উত্তাপে। সং তাকে টেনে তুলে ঊর্ধ্বে। যোগী কুণ্ডলিনীকে নিয়ে চলেন সহস্রারের দিকে। তখন নিজেকে মনে হয় সর্বত্র প্রসারিত, সর্বত্র শক্তি সঞ্চারিত। তারপর সেই শক্তি আর শিবে যখন মিলন হয়, অর্থাৎ কুণ্ডলিনী শক্তি সহস্রারে গিয়ে মেশেন, তখন যোগী যান আনন্দময় হয়ে। সেই আনন্দই হল উপনিষদের ব্রহ্মণ, সাংখ্য-যোগের পুরুষ, বৌদ্ধদের শূন্যতা, তন্ত্রের শিব।

অশ্বিনীমুদ্রায় পর পর মলদ্বার সংকোচন ও বিকোচন করা হয়। এমন করা হয় দেহ শোধনের জন্য। মলদ্বার সংকুচিত করে অপান বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় ষট্‌চক্রের উদ্দেশ্যে। এ মুদ্রা দ্বারা হয় শক্তিচালান। যতক্ষণ পর্যন্ত না বায়ু সুষুম্নাতে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই মুদ্রা করা হয়। শক্তিচালান হল তলপেটের মাংসপেশী একবার বাঁয়ে একবার ডাইনে চালান দেওয়া। এই আন্দোলনের ফলেই জেগে ওঠে কুণ্ডলিনী। এরই সঙ্গে চলে সিদ্ধাসনে প্রাণবায়ু গ্রহণ এবং প্রাণবায়ুর সঙ্গে অপান বায়ুর সংযোগ সাধন।

যোনিমুদ্রার সঙ্গে চাই শক্তিচালান মুদ্রা। শক্তিচালান মুদ্রা প্রয়োজন যোনিমুদ্রার আগে। অশ্বিনীমুদ্রার সময় তলপেট অঞ্চলে শোনা যায় বিশেষ রকম শব্দ। কুম্ভকের সাহায্যে কুণ্ডলিনীকে তখন নিয়ে যাওয়া হয় সহস্রারে। সঙ্গে মন্ত্র জপ করতে 'হুং হংসঃ'। যোগীকে তখন চিন্তা করতে হয় সর্বত্র তিনি শক্তিসঞ্চারিত। শিবের সঙ্গে শক্তির মিলনে নিস্তরঙ্গ আনন্দময় তিনি। মনে করতে হয় 'আমিই সেই আনন্দ। আমিই সেই ব্রহ্মণ।' কখনও কখনও গূঢ় চেতনাকে মহাবিশ্বে

ছড়িয়ে দিলেও হয় এমন ধরনের অভিজ্ঞতা। এই জন্য অনেক মহৎ কবির মধ্যে এই বোধ লক্ষ্য করা যায়। তবে কবি আর মহৎ যোগীর মধ্যে এই আনন্দে প্রভেদ হল এই যে, কবির ঘরে এ হল জানালা দিয়ে ঢুকেপড়া কোন পাখি। যেমনি সে আসে তেমনি সে উড়ে যায়। কিন্তু যোগীর ঘর হল খাঁচা। একবার ঢুকে পড়লে বের হওয়া কষ্ট। যতক্ষণ খুশি যোগী তাকে আটকে রাখতে পারেন। কবি যদি বলেন 'তোমার আনন্দ' যোগী বলেন 'আমিই আনন্দ'। ঋগ্বেদের সেই মহিলা ঋষি বাক্ বোধহয় কোন যোগিনী ছিলেন তাই সেই পরম আনন্দের স্বাদ পেয়ে বলে উঠেছিলেন 'আমিই সমগ্র-জগতের অধীশ্বরী, সর্বসম্পদ প্রদায়িনী। আমিই সত্যদ্রষ্টা, পূজনীয়দের মধ্যে আমিই সর্বাগ্রা। দেবতারা আমাকে দেখেন নানা লোকে স্থাপন করে, কারণ, আমার অধিষ্ঠান নানা লোকে। বিভিন্ন প্রাণের মধ্যে আমিই বাস করি।' মহাবন্ধ মুদ্রার সঙ্গে করা হয় মহামুদ্রা ও মহাবেধ। প্রথমটিতে যোগী বাঁ পায়ের গোড়ালি দিয়ে চাপ সৃষ্টি করেন মূলাধারে। দক্ষিণ পা ছড়িয়ে দিয়ে দু'হাতে ধরেন দু'পায়ের অঙ্গুলি। এর পরই করা হয় জালন্ধর বন্ধ। কুণ্ডলিনী যখন জাগেন প্রাণ তখন প্রবেশ করে সুষুম্নাতে। ইড়া ও পিঙ্গলা হয়ে পড়েন প্রাণহীনা, কারণ প্রাণ তখন তাদের পরিত্যাগ করে। মুদ্রার সময় নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয় ধীরে ধীরে। মহামুদ্রাতে ডান পা ও বাঁ পা ছড়িয়ে করতে হবে সমান সংখ্যক মুদ্রা। যোগীদের মতে মহামুদ্রা রোগ ও মৃত্যুকে জয় করে। যোগীরা বোধহয় এ মুদ্রা করেই দীর্ঘায়ু হন ইচ্ছামত।

মহাবেধ মুদ্রাতে যোগী নেন মহাবন্ধ মুদ্রার ভঙ্গী। মনকে করেন নিবিড়ভাবে নিবিষ্ট। মনের সংযোগে প্রাণের ওঠা নামাকে স্তব্ধ করেন। তারপর হাতের তালু মাটিতে রেখে পেছন দিয়ে মাটিতে দেন ঠোক্কর। ফলে সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না হয়ে যায় এক। প্রাণ প্রবেশ করে সুষুম্নাতে। দেহ ও মনকে মনে হয় মৃতবৎ। কুণ্ডলিনী জাগরণের আছে আরও পদ্ধতি। পদ্মাসনে বসে পায়ের গোছ

ধরতে হয় দৃঢ়ভাবে। তার পর ধীরে ধীরে কণ্ঠ ঠুকতে হয় পায়ের সঙ্গে, একে বলে ভস্ত্রিকা কুম্ভক। এতে তলপেট সংকুচিত হয়।

খেচরী মুদ্রাতে জিব্ বের করে আনা হয় বাইরে, দুই ভুরুর মাঝখান অবধি। সেখান থেকে সেই জিব্ ফিরিয়ে নেওয়া হয় কণ্ঠনালির মূলে এমন করে, যাতে নিঃশ্বাস না বাইরে বেরুতে পারে। কুণ্ডলিনী উঠতে থাকেন যোগের মাধ্যমে। মনকে নিবদ্ধ রাখা হয় আজ্ঞাচক্রে। কুণ্ডলিনীর তড়িৎপ্রবাহ জয় করে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে। যোগী লাভ করেন আত্মস্বরূপ। সম্ভবী মুদ্রাতে মনকে মুক্ত রাখা হয় সমস্তরকম বৃত্তি থেকে।

মুদ্রার মধ্যে আছে 'বন্ধ' বলে আর একটি জিনিস। অর্থাৎ প্রাণকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য কয়েকটি দৈহিক ব্যবস্থা। বন্ধের মধ্যে তিন ধরনের 'বন্ধ' বিশেষভাবে খ্যাত। যেমন, উড্ডীয়ান বন্ধ, মূলবন্ধ ও জালন্ধর বন্ধ। মহাবন্ধ বলে আরও একটা বন্ধও গুরুত্বপূর্ণ। উড্ডীয়ান বন্ধে নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ফুসফুসকে শূন্য করা হয়। ফুসফুস নেমে আসে নিচের দিকে। সেই সঙ্গে নেমে আসে বুক ও পেটের মধ্যবর্তী ঝিল্লী। ফলে প্রাণ উঠে যায় উপরে। প্রবেশ করে সুষুম্নাতে। মূলবন্ধে প্রাণ ও অপান বায়ু মিশে যায় একত্রে—এবং ঢুকে পড়ে সুষুম্নাতে। তখন ভিতরে হয় সূক্ষ্ম এক শব্দতরঙ্গ। প্রাণ এবং অপান বায়ু হৃৎ-পর্যায়ে স্থিত অনাহত চক্রের নাদের সঙ্গে মিশে প্রবেশ করে হৃদয়ে, তার পর এগিয়ে যায়-আজ্ঞাচক্রের বিন্দুতে গিয়ে মিলতে। মূলবন্ধে পা দিয়ে চাপ সৃষ্টি করা হয় লিঙ্গদেশে—শাস্ত্রে যাকে বলে যোনি। মলদ্বারের মাংসপেশীকে অশ্বিনীমুদ্রা দিয়ে সংকুচিত করা হয়। তখন অপানবায়ু উঠে আসে উপরে। অপানবায়ুর গতি সাধারণতঃ নিচের দিকে, কিন্তু মূলাধারে সংকোচনের ফলে সে বায়ু উঠে যায় উপরের দিকে। প্রাণের সঙ্গে মিলে সুষুম্না দিয়ে চলে এগিয়ে। নাভির নিচে অগ্নিদেশ। অপানবায়ু সেই অগ্নিদেশে হয়ে ওঠে আরও প্রজ্বলিত, সমস্ত দেহ হয় প্রচণ্ড রকমে উত্তপ্ত। ঘুমভেঙে যায় কুণ্ডলিনীর। লাঠি দিয়ে আঘাত করলে সাপ যেমন হিস্‌হিস্ করতে করতে সোজা

হয়ে ওঠে, কুণ্ডলিনীর অবস্থাও হয় তেমনি। কুণ্ডলিনী ঢুকে পড়ে সুষুম্নাতে।

জালন্ধর বন্ধে বুক ভরে নেওয়া হয় নিঃশ্বাস। তারপর দেহের মধ্যঅঞ্চল, যেখানে আছে বিশুদ্ধচক্র, তাকে করা হয় সংকুচিত। হৃৎ-পিণ্ডের চার আঙুল উপরে কণ্ঠমূল চেপে ধরা হয় চিবুক দিয়ে। এতে বাঁধা পড়ে ষোলটি আধার যেমন, মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, ও আজ্ঞাচক্র, বিন্দু, কলাপদ, নিবোধিকা, অর্ধেন্দু, নাদ, নাদান্ত, উন্মনী, বিষ্ণুবক্ত্র, ধ্রুবমণ্ডল এবং শিব। তালুমূলের উপর আছে যে রন্ধ্র সেখান থেকে ঝরে পিযুষ অর্থাৎ অমৃত। নিঃশ্বাস লয় পায় সুষুম্নাতে। যদি কণ্ঠ ও মধ্যাংশ থেকে লিঙ্গ ও মলদ্বার পর্যন্ত অঞ্চলকে একই সঙ্গে সংকুচিত করা যায় এবং প্রাণবায়ুকে নিচে নামানো যায় এবং অপানবায়ুকে উর্ধ্বে উঠানো যায় তখন বায়ু প্রবেশ করে সুষুম্নাতে। এতে তিনটি নাড়ি মিলে যায়—ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। মহাবন্ধতেও মেলানো যায় এই তিন নাড়িকে। এর ফলে মন নিবদ্ধ হয় আজ্ঞাচক্রে। মলদ্বার ও লিঙ্গের মাঝখানে বাঁ পায়ের গোড়ালি দিয়ে চাপ দেওয়া হয়, ডানপা থাকে বাম জঙ্ঘায়। নিঃশ্বাস নিয়ে চিবুককে দৃঢ় করে বসানো হয় কণ্ঠমূলে, কিংবা জিব্ দিয়ে চাপ দেওয়া হয় দাঁতের গোড়াতে। মনকে নিবদ্ধ করা হয় সুষুম্নাতে। এতে বায়ু হয় সংকুচিত, যতক্ষণ পারা যায় নিঃশ্বাস রাখা হয় আটকে, তারপর ধীরে ধীরে ছাড়া হয়। নিঃশ্বাসের খেলা প্রথম চলে বাম নাসারন্ধ্রে, তারপর দক্ষিণে (ডানে)। একমাত্র সুষুম্না বাদে আর কোন নাড়ি দিয়ে বায়ু উপরে উঠতে পারে না।

ধ্যানবিন্দু উপনিষদে বলা হয়েছে জীবাত্মা ওঠানামা করে প্রাণ ও অপানবায়ুর প্রভাবে। সেজন্য সে কখনও স্থির নয়, যেন হাতের তালু দিয়ে একটা রবারের বলকে মাটিতে ঠুকে দিচ্ছে কোন এক দুষ্টু ছেলে। বল লাফিয়ে উপরে উঠলেই আবার তাকে ঠেলে নামিয়ে দিচ্ছে নিচে। কিংবা সুতোয় বাঁধা পাখি উড়ে যাচ্ছে উপরে আবার তাকে টেনে

নামানো হচ্ছে নিচে। এই ওঠানামার খেলা বন্ধ হয় যোগে। সহস্র প্রাণপ্রবাহ তখন হয়ে যায় এক।

দেহ যখন যোগের দ্বারা শুদ্ধ তখনই আসে প্রত্যাহার। অর্থাৎ বহির্জগৎ থেকে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাবর্তন। এর ফলে দেখা দেয় ধৈর্য। বাহ্যদেহ থেকে মুক্ত হয়ে যোগী তখন সূক্ষ্মদেহের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেন। দেহ মন নিয়ন্ত্রিত হলে সাধক এগিয়ে যান আপন লক্ষ্যে। দেহ মনের উপর নিয়ন্ত্রণ এলে প্রাণায়াম আনে লঘুতা। যে বায়ু নেওয়া হয় মুখ দিয়ে, নাক দিয়ে, তা হল স্থূল বায়ু। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস হল দেহের মধ্যে প্রাণবায়ুর প্রকাশ। স্থূল বায়ু নিয়ন্ত্রিত হলে প্রাণবায়ু অর্থাৎ সূক্ষ্ম বায়ুও নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রাণ এবং যম অর্থাৎ নিঃশ্বাস এবং প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ থেকেই শব্দ সৃষ্টি হয় না। শব্দ আসে প্রাণ ও অযম থেকে। অর্থাৎ যাতে করে স্বল্প প্রাণবায়ুর প্রকাশকে দীর্ঘতর এবং শক্তিশালী করা হয়। প্রাণবায়ুকে প্রথম শক্তিশালী করা হয় প্রাণের মধ্যেই অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যে তার প্রবাহকে। তার পর সেই বায়ুকে সুষুম্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারলেই ঘটে স্ফূর্তি। অর্থাৎ প্রাণবায়ু সুযোগ পায় পূর্ণরূপে কাজ করার। প্রাণায়াম অভ্যাস করে শরীর যখন পবিত্র হয়, হাল্কা হয়, তখন সহজেই প্রাণবায়ু প্রবেশ করতে পারে সুষুম্নাতে। নিত্যদিনের ক্ষুদ্রাপথ পরিত্যাগ করে প্রাণবায়ু চলতে থাকে রাজপথে অর্থাৎ সুষুম্নার মধ্য দিয়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রাণবায়ুর প্রবাহ অনুভব করা যায় সমস্ত দেহে ততক্ষণ পর্যন্ত করা হয় সূর্যভেদ কুম্ভক। উজ্জয়ী অভ্যাস করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না কণ্ঠ থেকে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত নিঃশ্বাস পূর্ণ হয়ে যায়। ভস্ত্রা করে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কাছে চলে দ্রুত তালে, কর্মকার যেমন তার হাপর চালায় তেমনি ভাবে। প্রাণায়ামে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের অর্থ এই নয় যে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসকে করা হয় সীমিত। বরং তাকে বাড়িয়ে দেওয়া হয় আরও। নিঃশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে তাকে আরও বাড়ানো হয় প্রাণায়ামে যাতে করে মিলন হতে পারে প্রাণবায়ুর ও অপানবায়ুর। প্রাণায়াম

প্রথম করা হয় প্রাণবায়ুকে নিয়ন্ত্রিত ও শক্তিশালী করার জন্য, যাতে নিদ্রিতা কুণ্ডলিনীকে আন্দোলিত করে সে প্রবেশ করতে পারে সুষুম্নাতে। ব্রহ্মদ্বারের মুখ বন্ধ করে থাকেন কুণ্ডলিনী। সেই মুখ খুলে যায়। সেই মুখে প্রাণবায়ু অদৃশ্য হলে ইড়া পিঙ্গলা হয়ে পড়ে নিস্তেজ। শুধুমাত্র ইড়া পিঙ্গলা নয় দেহের যে প্রান্ত থেকে প্রাণবায়ু সরে যায় সে প্রান্তই হয়ে পড়ে নিস্তেজ ও মৃতবৎ। শক্তিরূপা কুণ্ডলিনী একের পর এক উঠতে থাকেন ষটচক্র ভেদ করে ব্রহ্মনাড়ি দিয়ে। শেষ পর্যন্ত মহাবায়ুতে বিলীন হয়ে লয়প্রাপ্ত হন।

প্রাণায়াম শিখতে হয় গুরুর কাছে যিনি স্বাস্থ্যপ্রদ মিতাহারে নিজের ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণে এনেছেন। নিঃশ্বাসের প্রভাব আছে মনের উপর। মনের প্রভাব আছে নিঃশ্বাসের উপর। মন যখন উত্তেজিত, কামার্ত, বিচলিত, তখন নিঃশ্বাস দ্রুততর। সুতরাং মনের সঙ্গে নিঃশ্বাসের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। নিঃশ্বাস বন্ধ হলে মন কাজই করতে পারে না। মনকে ধরা যায় না। কিন্তু মনের সহচর নিঃশ্বাসকে ধরতে পারি সহজেই। সেই নিঃশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করলে মন নিয়ন্ত্রিত হবে নিশ্চিন্ত। ফলে নিঃশ্বাসকে আনতে হবে এমন একটা ছন্দে যাকে বলা হয় সাম্যাবস্থা। তাহলে মনও লাভ করবে সাম্য। কিন্তু প্রাণায়াম সহজ হবে না যদি না নাড়িকে করা যায় পরিচ্ছন্ন, পবিত্র। নাড়ি পরিষ্কার না হলে প্রাণবায়ু কখনও প্রবেশ করবে না সুষুম্নাতে।

পদ্মাসনে বসে যোগী যে নিঃশ্বাস নেন তার নাম পূরক। যে নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তার নাম রেচক। বায়ু নাসারন্ধ্রে ও দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে একের পর এক চলে এই ক্রিয়া অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলা দিয়ে। বাম নাসারন্ধ্র হল ইড়া। দক্ষিণ নাসারন্ধ্র পিঙ্গলা। নিঃশ্বাসকে ভেতরে আটকে রাখার নামই কুম্ভক। ক্রমশ এই নিঃশ্বাস আটকে রাখার সময় বাড়তে থাকে।

প্রাণবায়ু প্রবেশ করে সুষুম্নাতে। যদি তাকে ধরে রাখা যায় অনেকক্ষণ একে একে তা ব্রহ্মরন্ধ্রের দিকে উঠতে থাকে ষটচক্র ভেদ

করে। তবে যতটুকু প্রাণায়ামের পদ্ধতি বলা হল শুধু সেইটুকুই নয়। যোগশাস্ত্রে আছে আরও প্রাণায়ামের কথা। সেসব কথা যাক।' প্রাণায়াম বোঝা নিয়ে হল বড় কথা, প্রাণায়াম কি করে সুষুম্নাতে প্রবেশ করায় প্রাণবায়ুকে তারপর তাকে নিয়ে যায় ব্রহ্মরন্ধ্রে সেইটেই বড় কথা। সব প্রাণায়ামের লক্ষ্যই সেই এক। শুধু পদ্ধতিতে ফারাক মাত্র। সুষুম্না দিয়ে প্রাণবায়ুর অগ্রগতি যত, মনের স্থিরতাও তত। তারপর যখন সুষুম্নাতে মিশে যায় পরম চৈতন্য, প্রাণবায়ুও হারিয়ে ফেলে তার গতি।

প্রাণায়াম যখন একটি লক্ষ্য সামনে রেখে চলে তখন তা প্রাণায়াম। যখন স্বাভাবিকভাবে দেহের মধ্যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া তখন তা অজপা গায়ত্রী। প্রতি প্রশ্বাসে উচ্চারিত হয় হংকার। প্রতি নিঃশ্বাসে 'স'কার। এইভাবে সারা দিন চলে। ২১৬০০ বার। সাধারণতঃ নাসারন্ধ্র থেকে বার আঙুল দূরত্বে অনুভব করা যায় নিঃশ্বাস এবং প্রশ্বাস। কিন্তু গান গাওয়ার সময়, খাওয়ার সময়, ঘুমোবার সময়. হাঁটার সময়, সঙ্গম কালে এর দূরত্ব বেড়ে যায় ১৬, ২০, ২৪, ৩০, এবং ৩৬ আঙুল পর্যন্ত। সাধারণ দূরত্বে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলাই হল দীর্ঘ জীবনের লক্ষণ। বেশী দূরত্বে স্বল্পায়ুর লক্ষণ।

পূরক হল নিঃশ্বাস নেওয়া, রেচক হল নিঃশ্বাস ত্যাগ করা। অপর-কুম্ভক হল নিঃশ্বাস ধরে রাখা। ঘেরণ্ড সংহিতা বলে একটি গ্রন্থে আছে আট ধরনের কুম্ভকের কথা—(১) সহিত (২) সূর্যভেদ (৩) উজ্জয়ী (৪) শীতালী (৫) ভস্ত্রিকা (৬) ভ্রামরী (৭) মূর্চ্ছ ও (৮) কেবলী। যে যে-রকম করে প্রাণায়ামের চরিত্রও সেই রকম। প্রাণায়াম হারিয়ে ফেলে কুম্ভ শক্তিকে। মুক্ত করে রোগ থেকে, আনে নির্লিপ্তি, আনে আশীর্বাদ। আছে উত্তম প্রাণায়াম, মধ্যম প্রাণায়াম ও অধম প্রাণায়াম। কে উত্তম, কে মধ্যম, কে অধম, নির্ভর করে পূরক কুম্ভক ও রেচকের উপর। অধম প্রাণায়ামে প্রণবমন্ত্র আবৃত্তির সময় হল পূরকে চার, কুম্ভকে ষোল ও রেচকে আট। সর্বসাকুল্যে আটাশ বার। মধ্যম প্রাণায়ামে এ সংখ্যা

হল আট, বত্রিশ ও ষোল, অর্থাৎ ছাপান্ন বার। উত্তম প্রাণায়ামে ষোল, চৌষট্টি ও বত্রিশ অর্থাৎ একশ বার (১১২) বার। সকলকে যেতে হয় এই তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়েই। অধম প্রাণায়ামে ঘাম ঝরে। মধ্যম প্রাণায়ামে অনুভূত হয় কম্পন এবং উত্তম প্রাণায়ামে অনুভূত হয় লঘুতা। শরীর তখন যেন হাল্কা কোন পাখির পালক।

প্রাণায়ামের জন্য নাড়িশুদ্ধি চাই আগে, কারণ কোন অশুদ্ধ নাড়িতে প্রাণবায়ু প্রবেশ করতে পারে না। নাড়ি শুদ্ধিতেই অনেক দিন চলে যায়, মাস, ষাণ্মাস বা বছর। বীজমন্ত্র জপ করেও নাড়িশুদ্ধি করা যায়, বীজমন্ত্র জপ না করেও পারা যায়। জপ করে নাড়িশুদ্ধি করাকে বলে সমন্নু। জপ না করে নাড়িশুদ্ধিকে বলে নির্মন্নু। সমন্নুতে পদ্মাসনে বসে যোগী করেন গুরুন্যাস, অর্থাৎ গুরুর নির্দেশে ন্যাস। চিন্তা করেন যং। ইড়াতে জপ করেন ১৬ বার, কুম্ভকে ৬৪ বার এবং পিঙ্গলাতে বা রেচকে করেন ৩২ বার। মণিপুর চক্র থেকে তখন জ্বলে ওঠে আগুন। সেই আগুনে যুক্ত হয়ে যায় মণিপুর ও পৃথ্বী, অর্থাৎ মূলাধার। এরপর পিঙ্গলাতে অর্থাৎ সূর্য-নাড়িতে নিঃশ্বাস নেওয়া হয় ১৬ বার। জপ করা হয় বহ্নিবীজমন্ত্র। এই মন্ত্র কুম্ভকে জপ করা হয় ৬৪ বার। চন্দ্র-নাড়িতে বা ইড়াতে রেচক করা হয় ৩২ বার। যোগী তখন নাসারন্ধ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চিন্তা করেন। চিন্তা করেন চন্দ্রের ঔজ্জ্বল্য। নিঃশ্বাস নেন ইড়া দিয়ে। ১৬ বার জপ করেন যং। বং বীজ দিয়ে কুম্ভক করেন ৬৪ বার। তারপর চিন্তা করেন যেন এক অমৃতপ্রবাহে তিনি স্নাত, সিক্ত, প্লাবিত। চিন্তা করেন সমস্ত অশুদ্ধ নাড়ি ধুয়ে মুছে গেছে পরিষ্কার হয়ে। তারপর লং বীজমন্ত্র জপ করতে করতে নিঃশ্বাস ছাড়েন পিঙ্গলা দিয়ে। নিজের মধ্যে এক আশ্চর্য রকম শক্তি অনুভব করেন। তারপর আসন করতে বসেন কুশের আসনে। পূব বা উত্তর দিকে মুখ করে করতে থাকেন প্রাণায়াম।

নাড়িশুদ্ধির বাইরেও প্রাণায়ামের জন্য চাই স্থান, কাল এবং খাদ্য। এমন দূর স্থান হবে না যা মনের মধ্যে সৃষ্টি করবে উদ্বেগ। অরক্ষিত

স্থানেও হবে না, যেমন বন। জনারণ্যেও হবে না, যেমন শহরে। তাতে চিত্তে বৈকল্য ঘটার সম্ভাবনা। খাদ্য হবে শুদ্ধ এবং নিরামিষ। দেহ উত্তেজিত হয় এমন কোন খাদ্য গ্রহণ করা চলবে না। বেশী টক, বেশী নুন, বেশী তেতো কোনটাই নয়। চাই সুষম খাদ্য। উপবাসও নয়, একবেলা আহারী হলেও চলবে না। তিন ঘণ্টার বেশী যোগীকে চলবে না অনাহারে থাকলে। খেতে হবে সেই খাদ্য যা লঘু, অথচ স্বাস্থ্যপ্রদ। দীর্ঘ পদব্রজে ভ্রমণ বা অতিরিক্ত ব্যায়াম, কোনটাই চলবে না। প্রারম্ভিকদের পক্ষে স্ত্রী সহবাসও চলতে হবে এড়িয়ে। পেট থাকবে সব সময় অর্ধভুক্ত। যোগ আরম্ভ করতে হবে বসন্ত বা শরতে।

সগর্ভ প্রাণায়াম অর্থাৎ বীজ জপ করে প্রাণায়াম হয় এইভাবে : সাধক তখন বিধির উপর অর্থাৎ ব্রহ্মার উপর চিন্তাকে নিবদ্ধ করেন। অর্থাৎ তিনি ধ্যান করেন ব্রহ্মাকে। ব্রহ্মা হলেন রজঃগুণসম্পন্ন, রক্তবর্ণ, এবং অ-কার আকৃতি। ছয় মাত্রা নিঃশ্বাস নেন তিনি ইড়া দিয়ে। কুম্ভকের আগে করেন উড্ডীয়ানবন্ধ মুদ্রা। সত্ত্বগুণময় বিষ্ণুর উপর চিন্তা করে ধ্যান করেন কৃষ্ণবীজ উ-কার। তারপর কুম্ভক করে সেই বীজ জপ করেন ৬৪ বার। তারপর ধ্যান করেন তমোগুণসম্পন্ন শিবের। জপ করেন শ্বেত বীজ 'ম'-কারের। পিঙ্গলা দিয়ে নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ৩২ বার বীজমন্ত্র জপ করে। তারপর পিঙ্গলাতে নিঃশ্বাস নিয়ে আবার করেন কুম্ভক। বীজমন্ত্র জপ করতে করতেই ইড়া দিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়েন। এইভাবে চলতে থাকে।

ঘেরণ্ড সংহিতাতে আছে তিন ধরনের ধ্যানের কথা : (১) স্থূল, (২) জ্যোতি ও (৩) সূক্ষ্ম। প্রথম ধ্যানে মনের মধ্যে আনা হয় দেবতাকে। ধ্যান হল এইরকম, যেমন, সাধক চিন্তা করেন যেন তাঁর হৃদয়ে রয়েছে অমৃত সাগর। সেই সমুদ্রের মধ্যে রয়েছে মণিদ্বীপ। সমুদ্রের তীরে উজ্জ্বল মণিচূর্ণ জ্বলজ্বল করছে। কদম্ব বনে আবৃত সেই মণিদ্বীপ। অজস্র হলুদ কদম্ব ফুটে আছে থরে থরে। বনের চারিদিকে

রয়েছে মালতী, চাঁপা, পারিজাত, এবং আরও অসংখ্য ফুলের গাছ। কদম্ব বনের মাঝখানে অপূর্ব সুন্দর কল্পতরু ফুলে ফলে আনত। পাতায় পাতায় গুনগুন করছে কালো ভ্রমর। কোকিলমিথুন প্রণয়নিমগ্ন। কদম্ব বৃক্ষের চার কাণ্ড চার বেদ। বৃক্ষের নিচে মূল্যবান প্রস্তরখচিত মন্দির। মন্দিরের মধ্যে মনোরম আসন। আসনের উপর ইষ্টদেবতা। গুরু বলে দেবেন সেই দেবতার আকৃতি, বর্ণ এবং নাম।

জ্যোতি ধ্যান হল সেই আকৃতির মধ্যে বা ইষ্টদেবতার মধ্যে আলো এবং প্রাণ সঞ্চার। মূলাধারে ঘুমিয়ে আছে সর্পাকৃতি কুণ্ডলিনী! সেখানে আছে উর্ধ্ব দিকে ক্রমশঃ সরু হয়ে আসা ক্ষুদ্র প্রদীপের শিখার মত জীবাত্মা। সাধক তখন চিন্তা করেন তেজোময় ব্রহ্মণকে, কিংবা ভ্রূমধ্যস্থ প্রণবাত্মক শিখাকে। সে শিখা চতুর্দিকে দ্যুতি ছড়াচ্ছে।

সূক্ষ্ম ধ্যানে শাম্ভবী মুদ্রাতে সাধক ধ্যান করেন জাগ্রত কুণ্ডলিনীকে। এই ধ্যানেই হয় আত্মসাক্ষাৎকার। অর্থাৎ আত্মা দেখা দেন তাঁর নিজের রূপে। এর পরই নির্লিপ্ত সমাধির পরে হয় পরম মোক্ষ।

ঘেরণ্ড সংহিতার মতে সমাধি যোগ হল ছয় ধরনের। যেমন (১) শাম্ভবী মুদ্রার সাহায্যে ধ্যান-সমাধি, যে সমাধিতে সাধক বিন্দু-ব্রহ্মণকে চিন্তা করবার পর আত্মস্বরূপ লাভ করে মিশে যান মহাকাশে। (২) নাদ যোগ, যে যোগ হয় খেচরী মুদ্রা করে। খেচরী মুদ্রাতে জিব্‌কে লম্বা করে বের করে আনা হয় ভ্রূমধ্যে। আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় মুখের ভেতর। (৩) রসানন্দ যোগ, এ যোগ করা হয় কুম্ভক করে। নির্জনে বসে সাধক দুই কান বন্ধ করেন, তারপর করেন পূরক এবং কুম্ভক। পূরক এবং কুম্ভক করতে থাকেন ততক্ষণই যতক্ষণ না কানের ঝিল্লিতান পরিণত হয় দামামার শব্দে। কেউ যদি রোজ করেন এ অভ্যাস তাহলে অনাহত শব্দ শুনবেন তিনি এবং জ্যোতি দর্শন হবে তাঁর। যে জ্যোতি শেষপর্যন্ত মিশে যাবে বিষ্ণুতে। (৪) লয় সিদ্ধি-যোগ, এ যোগ করতে হবে যোনিমুদ্রা করে। সাধক এ যোগে নিজেকে মনে করবেন শক্তি এবং পরমাত্মাকে চিন্তা করবেন পুরুষ

হিসেবে। এ চিন্তা থেকেই শিবের সঙ্গে তাঁর মিলন হবে। এ মিলনকেই বলে সঙ্গম। এ থেকে তিনি লাভ করেন শৃঙ্গার রসের আনন্দ। এ আনন্দ যিনি লাভ করেন তিনি নিজেই হয়ে উঠবেন আনন্দময় এবং ব্রহ্মস্বরূপ। (৫) ভক্তিযোগ, এ যোগে ভক্তি সহকারে ইষ্ট দেবতাকে ধ্যান করতে হবে। ধ্যান করতে হবে যতক্ষণ না পরমানন্দে অশ্রু ঝরতে থাকবে দু' নয়নে, যতক্ষণ পর্যন্ত না পাওয়া যাবে সেই আনন্দ। (৬) রাজযোগ, মনোমূর্ছা কুম্ভক দিয়ে করতে হবে এই যোগ। বহির্জগৎ থেকে মনকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে নিবিষ্ট করতে হবে আজ্ঞাচক্রে। করতে হবে কুম্ভক। মনের সঙ্গে আত্মার মিলনে জ্ঞানী হবেন সর্বদর্শী। রাজযোগে সমাধি লাভ করবেন তিনি।

হঠযোগ সিদ্ধ হলে দেহ হয় কৃশ, কিন্তু স্বাস্থ্যময়। চোখ হয় উজ্জ্বল, বীর্য ঘন, নাড়ি শুদ্ধ। অন্তরাগ্নি জ্বলে ওঠে বেশি করে। শোনা যায় নাদ, যে নাদ থাকে হৃদ্‌মণ্ডলের অনাহত চক্রে। কারণ এখানেই শব্দব্রহ্মণ প্রকাশিত হন বায়ু দ্বারা, বুদ্ধি এবং সূক্ষ্ম শব্দের সঙ্গে একত্রে লাভ করেন বিশেষ স্পন্দন। এই স্পন্দন আত্মপ্রকাশ করে মধ্যমা শব্দরূপে। এই মধ্যমা শব্দ শ্রুতিগ্রাহ্য নয় স্থূল ইন্দ্রিয়ের কাছে। বৈখরী শব্দরূপে শ্রুতিগ্রাহ্য শব্দের আত্মপ্রকাশ। কিন্তু যোগী যখন নানা বন্ধ ও নানা মুদ্রাতে প্রাণ ও অপান বায়ুর মধ্যে সংযোগ ঘটান তখনই তিনি শুনতে পান এই সূক্ষ্ম নাদ। তখন প্রাণ এবং নাদে মিশে যাত্রা শুরু করে ঊর্ধ্ব দিকে, বিন্দুর সঙ্গে মিলন হয়।

লয় যোগ হয় এক আশ্চর্য পদ্ধতিতে। মুক্তাসনে যোগী করেন শাম্ভবী মুদ্রা। ডান কানে যে শব্দ হয় সেই শব্দ শুনেন তিনি। সম্মুখী মুদ্রা করে তারপরে বন্ধ করে দেন শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বার। তারপর প্রাণায়াম করে সুষুম্নাতে শুনতে পান আশ্চর্য শব্দ। এই যোগের আছে চারটি পর্যায়: (১) ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ হলেই হৃদ্‌মণ্ডলের শূন্যে তিনি শুনতে পান মিষ্টি মধুর অলংকারের শব্দ। (২) দ্বিতীয় পর্যায়ে নাদের সঙ্গে প্রাণবায়ু মিশে ভেদ করে বিষ্ণুগ্রন্থি। বিষ্ণুগ্রন্থি ছিন্ন হলেই দেহের মধ্যাঞ্চলে

আরও বিরাট শূন্যতায়, যাকে বলে অতিশূন্য অঞ্চল, সেখানে শুনতে পান দামামার শব্দ। (৩) তৃতীয় পর্যায়ে মহাশূন্যে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্র অঞ্চলে শুনতে পান জয়ঢাকের আওয়াজ। আজ্ঞাচক্র হল সকল শক্তির কেন্দ্র, অর্থাৎ সিদ্ধিলাভের অঞ্চল। এর পরই প্রাণ আজ্ঞাচক্রের রুদ্রগ্রন্থি ভেদ করে চলে যায় ঈশ্বরের আবাসে। চতুর্থ পর্যায়ে প্রাণ যখন যায় ব্রহ্মরন্ধ্রে তখন আসে নিষ্পত্তি অবস্থা। প্রারম্ভে শোনা যায় উচ্চ শব্দ। সেই শব্দ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হয়। মন বহির্বিশ্বের সমস্ত বিষয় থেকে বিচ্যুত হয়। মন মিশে যায় নাদের সঙ্গে। (গীর্জার ঢং ঢং. মসজিদের আজান এবং হিন্দুদের ওঁ শব্দের উচ্চ তরঙ্গ ক্রমশঃ এইভাবে স্থূল থেকে চলে যায় সূক্ষ্ম পর্যায়ে)। নাদ হল হরিণ ধরার ফাঁদের মত। শিকারীর মত এই নাদ নাশ করে মনকে। শব্দ প্রথম মনকে আকর্ষণ করে, তারপর হত্যা করে তাকে। নাদে একাত্ম মন সমস্ত রকম বৃত্তি থেকে মুক্ত হয়। মুগ্ধ হরিণের অন্তঃকরণ আকৃষ্ট হয় শব্দে। যোগী এতে আকৃষ্ট না হয়ে দক্ষ শিকারীর মত প্রাণবায়ুকে চালিত করেন সুষুম্নার মধ্য দিয়ে ব্রহ্মরন্ধ্রের দিকে। প্রাণ এক হয়ে যায় ব্রহ্মের সঙ্গে। শব্দ হল শক্তি। এর মধ্যেই থাকে 'চিৎ'। নাদের সঙ্গে মিশে গেলে সেই চৈতন্য হয়ে যায় প্রাণ। যতক্ষণ শব্দ শোনা যায়, আত্মা থাকে শক্তির সঙ্গে। লয় পর্যায়ে আত্মা থাকে না, তখন পরম নৈঃশব্দ্য। অবশ্য লয় পাবার জন্য অন্যান্য পদ্ধতিও আছে, যেমন মন্ত্রযোগ। বিশেষ উপায়ে মন্ত্র উচ্চারণ করলে মন্ত্রও নিয়ে যেতে পারে লয়ের মধ্যে।

হঠযোগের তৃতীয় এবং উচ্চতর পর্যায়ের যোগ হল লয়যোগ। সচ্চিদানন্দ অথবা শিব, এবং সচ্চিদানন্দ ও শক্তি সবই আছে দেহের মধ্যে। লয়যোগে পুরুষ-শক্তির মধ্যে প্রকৃতি শক্তিকে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে চিত্তবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়।

লয়যোগের আছে নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্যও। সাধারণ হঠযোগ হল দেহের সঙ্গে যুক্ত। যদিও সূক্ষ্ম দেহের উপরও তার প্রভাব আছে। স্থূল দেহ দিয়ে এখানে সূক্ষ্ম দেহকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। মন্ত্রযোগ যুক্ত

বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে। অবশ্য সবটাই তা নয়। লয়যোগ হল অতীন্দ্রিয় পীঠকে কেন্দ্র করে, দেহের অভ্যন্তরস্থ অতীন্দ্রিয় শক্তি ও কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই পীঠই হল চক্র। সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা থেকে মূলাধার চক্রে অধিষ্ঠিতা প্রকৃতি-শক্তির কেন্দ্র পর্যন্ত নানা পীঠ। এর মধ্য দিয়েই শক্তি চলেন, যোগশাস্ত্রে যাকে বলে কুণ্ডলিনী। লয়-যোগের বিষয় হল প্রকৃতি-শক্তিকে পুরুষ-শক্তির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া। এই মিলন হলেই হয় সমাধি।

হঠযোগে আলো ধ্যান করা হয় তিনভাবে। মন্ত্রযোগ আশ্রয় করে যে আত্মার প্রকাশ, ধ্যান করা হয় সেই রূপের অর্থাৎ দেবতার রূপের। লয়যোগের পদ্ধতিতে অনবরত অভ্যাস দ্বারা কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করা হয়। এর 'প্রকাশ ঘটে জ্যোতি আকারে আজ্ঞাচক্রে। অভ্যাস ও ধ্যানে সেই জ্যোতিই হয় বিন্দু-ধ্যানের বিষয়। হঠযোগ এবং আরও নানা পদ্ধতিতে জাগ্রতা হন কুণ্ডলিনী। সমস্ত সাধন-পদ্ধতিতেই যেমন আছে, যম, নিয়ম, আসন, মুদ্রা, বন্ধ ইত্যাদি—এ যোগেও আছে তার সবকিছু, তবে সীমিত আকারে। স্থূলক্রিয়া অর্থাৎ দৈহিক পদ্ধতির পরে হল প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান (বিন্দু ধ্যান) ইত্যাদি সূক্ষ্ম ক্রিয়া। এর উপরেও লয়যোগে আছে বিশেষ কিছু ক্রিয়া, যেমন সর্বোদয়, অর্থাৎ নাড়িবিজ্ঞান, পঞ্চতত্ত্বচক্র, সূক্ষ্ম প্রাণ ইত্যাদি প্রকৃতির সূক্ষ্ম শক্তি এবং লয়ক্রিয়া যা নাদ এবং বিন্দুর মধ্য দিয়ে সাধককে নিয়ে যায় সমাধিতে। তখন হয় মহালয়।

প্রত্যাহার করলে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে বাইরে থেকে নিবৃত্ত করলেই শোনা যায় নাদ শব্দ। ধারণার দ্বারা হয় কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ। মন্ত্রযোগে যেমন করা হয় মন্ত্রযোগ, সাধারণ হঠযোগে করা হয় প্রাণায়াম, তেমনি লয়যোগে ধারণা হল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রাণায়াম হল সাধনমার্গে সাফল্যের একটা প্রাথমিক পর্যায়। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত হয় এতে। সিদ্ধ সাধকের জন্য প্রাণায়ামের আর কোন দরকার হয় না। যে-সব পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে এ হল সাধনার

অভ্যাসের জন্য। সিদ্ধপুরুষ যিনি তিনি অল্প সময়ের মধ্যে কুণ্ডলিনীকে নামাতেও পারেন, ওঠাতেও পারেন।

গল্পে যেমন আছে, অনন্তনাগ ধারণ করে আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, তেমনি কুণ্ডলিনী ধারণ করে আছেন এই সমস্ত দেহ। চাবি দিয়ে যেমন দুয়ার খুলে ঢোকা হয় ভেতরে, তেমনি কুণ্ডলিনীর চাবি দিয়েই মোক্ষপথের দুয়ার খুলতে হয় যোগীকে। কেউ বা এই কুণ্ডলিনীকে বলেন শক্তি, কেউ বা ঈশ্বরী, কেউ বা বলেন কুটিলাঙ্গী। আবার কেউ বলেন ভুজঙ্গী। কেউ বা বলেন অরুন্ধতী। কুণ্ডলিনী যদি উঠতে ইচ্ছা করেন উপরে কেউ রোধ করতে পারে না তাঁকে। সেইজন্যই তাঁর নাম অরুন্ধতী।

এই কুণ্ডলী শক্তিই হল মানুষের দেহে পরাশক্তি। তাঁর মধ্যেই রয়েছে সমস্ত শক্তি। তাঁর মধ্যেই রয়েছে সমস্ত রূপ। যৌনশক্তি হল এই কুণ্ডলীরই শক্তি। কিন্তু কেউ যদি বীর্যকে নিচে না নামিয়ে উপরে ওঠাতে পারেন তাহলে প্রাণের সঙ্গে সুষুম্না নাড়ি দিয়ে এই বীর্যই সূক্ষ্মরূপে শিবের সঙ্গে গিয়ে মেশে। অর্থাৎ বীর্য মিশে ব্রহ্মরন্ধ্রে। বীর্য যৌনক্ষুধাতে হয় মৃত্যুর কারণ, অধ্যাত্ম ক্ষুধাতে হয় শাশ্বত জীবনের উৎস।

কুণ্ডলিনী শক্তি ঘুমিয়ে আছে মূলাধারে কুণ্ডলী পাকিয়ে। সুষুম্না নাড়ির প্রবেশ পথ আটকে রেখেছে মুখ দিয়ে। সুষুম্না নাড়ির পথ দিয়েই প্রাণ গিয়ে মিশতে পারে ব্রহ্মরন্ধ্রে। সেইজন্য এই প্রবেশ পথকে বলা হয় ব্রহ্মদ্বার। কন্দের উপর ঘুমিয়ে থাকে কুণ্ডলিনী অর্থাৎ কণ্ড-যোনির উপর। কন্দের দৈর্ঘ্য হল চার আঙুল, প্রস্থও চার। যেন শ্বেতবস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে আছে কন্দ। আসলে সেই শ্বেতবস্ত্র হল অতি সূক্ষ্ম একটা পর্দা। মলদ্বারের দু' আঙুল উপরেই এই কন্দ। আবার মেঢ্র থেকে অর্থাৎ লিঙ্গ থেকে ঠিক দুই আঙুল নিচে। এই কন্দ থেকেই বেরিয়েছে ৭২,০০০ নাড়ি। কুলকুণ্ডলিনী হলেন শব্দ ব্রহ্মণ। সমস্ত মন্ত্রই হল তাঁর স্বরূপবিভূতি। মন্ত্রদেবতা গড়ে উঠেছেন অক্ষর দিয়ে যে অক্ষরের সৃষ্টি এই কুণ্ডলিনী থেকে। এইজন্যই কুণ্ডলী বা

কুণ্ডলিনীর এক নাম হল মাতৃকা। মাতৃকা হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি স্থল। কুণ্ডলিনী মাতৃকা, সবারই মা, কারো সন্তান নন। তিনিই হলেন জগৎচৈতন্য বা জগচ্চৈতন্য। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চৈতন্য হিসেবে তিনি বিরাট চৈতন্য। মহাব্যোমে যেমন বায়ুর দ্বারা শব্দ উৎপাদন হয় তেমনি জীবদেহব্যোমে বায়ুর প্রবাহেই অর্থাৎ প্রাণবায়ুর প্রভাবেই হয় শব্দের সৃষ্টি। এই বায়ুর প্রবাহ হয় নাসিকার দুই রন্ধ্র দিয়ে নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসে।

নাদশক্তি হিসেবে কুণ্ডলিনী বলেন পরমেশ্বরী, সর্বশক্তিময়ী কলা। তিনি সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মতরা, সূক্ষ্মতমা। তাঁর এই সূক্ষ্মতমা অবস্থার মধ্যেই রয়েছে সমস্ত সৃষ্টিরহস্য। রয়েছে নির্গুণ ব্রহ্মণ থেকে প্রবাহিত অমৃতধারা। তাঁরই আলোয় জগৎ আলোকিত, তাঁরই ইচ্ছায় অনন্ত চৈতন্য জাগ্রত। অবিদ্যা-শক্তি হিসেবে তিনি সৃষ্টিকর্ত্রী যিনি বন্ধনে অবদ্ধ করেন। আবার বিদ্যা-শক্তি হিসেবে তিনিই মুক্তিদাত্রী যিনি বন্ধন মুক্ত করেন। এইজন্যই বলা হয়েছে যে, যোগীকে তিনি দেন মুক্তি, অজ্ঞানকে দেন বন্ধন। রেতঃপাত বন্ধন, রেতের ঊর্ধ্বগতি মুক্তি। এই মহাশক্তিকে যিনি জানেন তিনি জানেন যোগ। যিনি যোগশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ তিনি সব কিছুতেই দেখেন বন্ধন। এইজন্য ষট্‌চক্রনিরূপণে শক্তি সম্পর্কে অর্থাৎ কুণ্ডলী সম্পর্কে বর্ণনা হল এইরকম : বিশ্বমোহিনী সেই শক্তি বিদ্যুতেরই মত উজ্জ্বল। মধুলোভী ভ্রমরের অস্পষ্ট গুঞ্জরণের মতই তাঁর মৃদু কণ্ঠ। শব্দের তিনি উৎস। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে জীবজগৎকে ধরে রেখেছেন তিনিই। মূল পদ্মের গহ্বরে তিনি বিরাজ করেন জ্যোতির্মালারূপে। কুলকুণ্ডলিনীর বিভূতিই হল মন্ত্র। কারণ তিনিই হলেন সমস্ত অক্ষর, সমস্ত ধ্বনি। তিনিই হলেন পরমাত্মা। এইজন্যই কুণ্ডলিনীকে জাগাতে উচ্চারণ করতে হয় মন্ত্র। অক্ষরে প্রকাশ হলেও মন্ত্রের মূল হল অনন্ত শব্দ, অনন্ত চৈতন্য। অক্ষর এককভাবে জড়। কিন্তু অক্ষরের মধ্যে রয়েছে যে মন্ত্রশক্তি তা সিদ্ধ, তা সত্য। মহাচৈতন্যের রূপ হিসেবে প্রকাশ বলেই আক্ষরিক

শব্দে প্রকাশিত হতে পারে সেই পরম চৈতন্য। বেদের কোন মূর্তি নেই, তা অমূর্ত, তা হল শব্দরূপে অমূর্ত ব্রহ্মণ। সেইজন্য বেদ হল স্বয়ং আলোকিত চৈতন্য। শব্দে তার প্রকাশ, যে শব্দকে বলা হয় সিদ্ধ শব্দ। এ শব্দের স্রষ্টা কোন মানুষ নয়, তা অপৌরুষেয়; প্রতিনিয়ত প্রকাশ করে চলেছে ব্রহ্মস্বরূপের ধারণা। ৺মা হলেন প্রত্যক্ষজ্ঞানরূপা ব্রহ্মবিদ্যা; বেদান্ত বাক্য বা মহাবাক্য। এ হল ধারণার ফলশ্রুতি।

প্রত্যেকটি জিনিসেই আছে চৈতন্যানুভব। কিন্তু তবু কিছু পদ্ধতি ছাড়া তার প্রকাশ ঘটে না। মন্ত্রের মধ্যেই আছে চৈতন্যানুভব। কিন্তু সাধকের শক্তির সঙ্গে সেই মন্ত্রশক্তির যোগ না হলে তাকে বোঝা যায় না। সারদা তিলকে এজন্যেই বলা হয়েছে—'যদিও মন্ত্র দিয়েই কুলকুণ্ডলিনী গঠিত, যদিও প্রতিটি জীবের মূলাধারে বিদ্যুতের মত তিনি জ্যোতির্ময়ী, তবু একমাত্র যোগীর হৃদ্‌পদ্মেই তিনি নিজেকে প্রকাশ করে করেন আনন্দ নৃত্যে। কিন্তু অজ্ঞ লোকের কাছে তিনি থাকেন অজ্ঞাতই। তিনি বেদ, তিনিই মন্ত্র, তিনিই তত্ত্ব। সূর্য, চন্দ্র, অগ্নির তিনিই তেজ। তিনিই শব্দব্রহ্মণ। সৃষ্টিক্রিয়ার সর্বোত্তম প্রকাশ হল মানবদেহে। কুণ্ডলিনী হল শব্দব্রহ্মণ। আত্মা রূপে তিনি সকল দেহ, সকল শক্তি, সকল ব্যক্তি ও সকল জিনিসে প্রকাশিত। ষট্‌চক্র এবং ষট্‌চক্র থেকে উদ্ভূত সব কিছুতেই তাঁর প্রকাশ। শিব রয়েছেন সহস্রারে। সহস্রার হল ঊর্ধ্ব শ্রীচক্র। ষটচক্র হল নিচের চক্র। কিন্তু শক্তি নিচে ও শিব ঊর্ধ্বে থাকলেও শিব আর শক্তি তবু এক। কুণ্ডলিনী শক্তির আছে অষ্ট অঙ্গ অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ। এই অষ্টাঙ্গ হল—ষটচক্র, শক্তি এবং সদাশিব। সহস্রারে শক্তি মিশে যায় পরম আত্ম-শক্তিতে। কুণ্ডলিনী হলেন প্রাণদেবতা, জীবনদেবতা, যাকে বলে নাদাত্মা। প্রাণকে যদি সুষুম্না দিয়ে ব্রহ্মরন্ধ্রে উঠতে হয় তাকে এগুতে হবে এই ষটচক্র ভেদ করে। কুণ্ডলিনী হলেন প্রাণশক্তি। তিনি যদি নড়ে ওঠেন প্রাণও নড়ে উঠবে সঙ্গে সঙ্গে।

আসন, কুম্ভক, বন্ধ এবং মুদ্রা—সবই হল কুণ্ডলিনীকে জাগরিত

করার জন্য, যাতে করে ইড়া ও পিঙ্গল ছেড়ে শক্তির প্রভাবে প্রাণ প্রবেশ করতে পারে সুষুম্নাতে। তারপরই শক্তি উর্ধ্বে উঠে যেতে পারেন ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত। ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রাণের প্রবেশ হলেই কর্মমুক্তি, তখন নিজের সত্যিকারের অবস্থা। সেইজন্য যোগের উদ্দেশ্য দেহের অন্য সব অংশকে প্রাণহীন করে ইড়া ও পিঙ্গলা থেকে সেই প্রাণ-শক্তিকে সুষুম্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া। এইজন্যই সুষুম্না হল সমস্ত নাড়ির মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাড়ি—কারণ সুষুম্নার মধ্য দিয়ে প্রাণ ফিরে যাভে পারে তার নিজের উৎসে। প্রাণের লয় হলেই আসে মনোন্মনী অবস্থা। কারণ, তখন মনেরও লয় হয়। নিত্য যদি প্রাণকে আনা যায় সুষুম্নাতে তাহলে তার স্বাভাবিক গতিপথ যায় দুর্বল হয়ে, ফলে প্রাণের নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে মনও হয় নিয়ন্ত্রিত। প্রাণের প্রবাহ হলেই মনেরও প্রবাহ চলে। কিন্তু প্রাণ যদি স্থিতিলাভ করে সহস্রারে, মনও তখন স্তব্ধ হয়ে যায়।

প্রাণ যখন সুষুম্নাতে প্রবেশ করে তখন না থাকে দিন না থাকে রাত্রি। সুষুম্না গ্রাস করে সময়কে। যোগবাশিষ্ট তাই বলেছে 'প্রাণের অস্তিত্ব বন্ধ না হলে তত্ত্বজ্ঞানও হয় না, বাসনারও বিলোপ হয় না। সূক্ষ্মভাবেও কামনা বাসনা থাকলে পুনর্জন্ম সুনিশ্চয়।' প্রাণ প্রবাহ যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ থাকবে বীর্যের ওঠা নামা। বীর্য যদি স্থির না হয় মনও স্থির হবে না। নিয়ন্ত্রিত মন নিজেই নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয় বহির্বিশ্ব থেকে। কিন্তু কুণ্ডলিনীকে জাগাতে না পারলে কোন কিছুরই পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। কুণ্ডলিনীই হল মূল চাবি। চাবি দিয়ে যেমন দরজা খুলে ঢুকতে হয়, তেমনি যোগী কুণ্ডলিনীর সাহায্যে খোলেন মুক্তির দুয়ার। কুণ্ডলিনী মূলাধারে ঘুমিয়ে থাকে সুষুম্নার রন্ধ্র-পথ বন্ধ করে। এই রন্ধ্রপথ দিয়েই কুণ্ডলিনী ওঠেন ব্রহ্মরন্ধ্রে। সুষুম্নার মুখ খুলে গেলে তবেই প্রাণ প্রবেশ করতে পারে সেখানে। তবে এই শক্তিকে জাগাবার জন্য চাই নিত্য অভ্যাস।

শক্তিকে, অর্থাৎ কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে নিয়ে যেতে সময় লাগে বছরের পর বছর। কারো পূর্ব জন্মের সুকৃতি থাকলে তবে তিনিই অল্প

সময়ে পারেন এই দুরূহ কাজকে সম্পন্ন করতে যেমন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব করেছিলেন। কিছুদূর পর্যন্ত কুণ্ডলিনী উঠবে সহজেই, তারপরেই তার গতি হবে ধীর। কিন্তু যিনি সামান্য উর্ধ্বগতি সৃষ্টি করতে পারবেন কুণ্ডলিনীতে তিনি বাকিটুকুও পারবেন তাতে সন্দেহ কি? তবে, যত উর্ধ্বগতি কুণ্ডলিনীর ততই বেশী চেষ্টা চাই সাধকের। চক্রে চক্রে তার উর্ধ্বগতিতে আছে বিশেষ ধরনের আনন্দবোধ। একের পর এক ভূত জগতের নানা স্তর অতিক্রান্ত হয় চক্রভেদে। এই ভূত স্তর থেমে যায় আজ্ঞাচক্রে এসে। আজ্ঞাচক্রে এসে কুণ্ডলিনী উপস্থিত হলেই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনুভূত হয়। প্রথম দিকে শক্তির ঝোঁক থাকে নেমে যাওয়ার দিকে। অনবরত যদি চেষ্টা থাকে তবেই তাকে ইচ্ছে মত ধরে রাখা যায় উর্ধ্বচক্রে। নাড়ি যদি শুদ্ধ থাকে তাহলে তাকে যেমন সহজে সহস্রারে ওঠানো যায়, তেমনই যায় সহজে নামানোও। যে সিদ্ধযোগী দীর্ঘ অভ্যাসে শরীরকে করেছেন নিয়ন্ত্রণ তিনি যতক্ষণ খুশি কুণ্ডলিনীকে ধরে রাখতে সহস্রারে পারেন। ইচ্ছে হলে শক্তিকে তিনি ভিন্ন দেহেও চালনা করে দিতে পারেন, শঙ্করাচার্য যেমন ঢুকে পড়েছিলেন এক মৃত রাজার দেহে। ভারতীয় ও তিব্বতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই জানেন অপরের দেহে প্রবেশ করার কলা-কৌশল। তিব্বতী তন্ত্রে একে বলে ফোয়া (phowa)।

সমাধি চাইলেই ইড়া ও পিঙ্গলা থেকে প্রাণকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে সুষুম্নাতে। প্রাণ যদি সরে যায় ইড়া ও পিঙ্গলা থেকে তাহলে তারা নিজেরাও হয়ে পড়ে প্রাণহীন। কুণ্ডলিনী তখন সুষুম্না দিয়ে এগুতে এগুতে সহস্রারে গিয়ে লাভ করে লয়। কুণ্ডলিনীকে উর্ধ্বে ওঠাতে হলে প্রাণবায়ুকে নামানো চাই নিচে আর অপান বায়ুকে ওঠানো চাই উর্ধ্বে। এ কাজ করা হয় জালন্ধর আর মূলবন্ধ করে। দু'য়ের মিলনে অগ্নির তাপ বেড়ে যায়। সেই উত্তাপে গলে গিয়ে ব্যারোমিটারের পারার মত কুণ্ডলিনী উঠতে থাকে উপরে। এ যেন দু' মুখ বন্ধ পিস্টনের মধ্যকার বায়ু। তাপ পেলে সেই বায়ুর যেমন

অবস্থা হয় কুণ্ডলিনীর অবস্থাও তেমনি। হিস্‌হিস্‌ করতে করতে কুণ্ডলিনী তখন ঢুকে পড়ে সুষুম্নাতে। তারপর একের পর এক চক্র ভেদ করে উঠতে থাকে উপরে। তিনটি গ্রন্থিই বড় গ্রন্থি যা ভেদ করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়, কারণ, এই তিনটি গ্রন্থিতেই মায়াশক্তি প্রবল।

নিম্নাঙ্গের গ্রন্থি ভেদ করা সত্যি সত্যিই দুরূহ। এ গ্রন্থি ভেদ করতে সত্যিই বড় বেদনা বোধ হয়। অনেক সময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয়ে পড়ে অসাড়। দুরারোগ্য ব্যাধিও হতে পারে।

যোগে সিদ্ধি অর্জন করতে হলে শুধুমাত্র আসন, প্রাণায়াম, বন্ধ, মুদ্রা এ-সব শিখলেই হবে না, প্রথম চাই চক্রজ্ঞান অর্থাৎ দেহের মধ্যে যে রয়েছে ষটচক্র সেই জ্ঞান। তারপর সেই চক্রে চক্রে তুলতে হবে কুণ্ডলিনীকে। আগে চাই চক্রজ্ঞান, তারপর তত্ত্বজ্ঞান। যোগবৃক্ষের প্রথম পল্লবই হল চক্রজ্ঞান। স্তরে স্তরে জ্ঞান লাভ করলে তবেই হয় ব্রহ্মজ্ঞান। তান্ত্রিক যোগ সাধনাতে পাওয়া যাবে চক্রজ্ঞান, নাড়িজ্ঞান ও কুণ্ডলিনী জ্ঞান। তারপরই কুণ্ডলিনীকে জাগরিত করার সাধনা। সর্বশেষে ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞান আসে কুণ্ডলিনী ক্রিয়াশালিনী হলে তবেই। তিনি একাধারে হলেন ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি এবং জ্ঞান-শক্তি সবই। তিনি আছেন সূক্ষ্মরূপে, আবার তিনিই আছেন স্থূল-রূপে। মনও হল একটা রূপ। বস্তুগ্রাহ্য জিনিস হল তারই প্রকাশ, অর্থাৎ মনেরই প্রকাশ। মন এবং বস্তু দুইই প্রকৃতি-শক্তি দ্বারা উৎপাদিত, নাদশক্তির অভিব্যক্তি। কুণ্ডলিনী রূপ নিয়েছে আট ধরনের প্রকৃতির। যে শক্তিকে জাগরিত করা হয় স্বরূপে সেই শক্তিই হল পরম চৈতন্য। যখন সেই শক্তি সহস্রারে ওঠে তখন দেখা দেয় স্বরূপ জ্ঞান।

কুণ্ডলিনী-শক্তিকে জাগরিত করতে চাই ইচ্ছা এবং মনের বল, সেই সঙ্গে চাই দৈহিক কলাকৌশল। নির্দিষ্ট আসনে বসতে হবে সাধককে। খেচরী মুদ্রা দিয়ে মনকে করতে হবে দৃঢ়—যাতে আজ্ঞা-

চক্রে গিয়ে মন স্থির হতে পারে। পূরক করে নিতে হবে বায়ু, কুম্ভক করে ধরে রাখতে হবে। জালন্ধর বন্ধে দেহের ঊর্ধ্বাংশ থাকে সংকুচিত হয়ে, যার ফলে প্রাণবায়ু নিয়ন্ত্রিত হয়। সংকোচনের ফলে নিঃশ্বাস বাইরে যেতে পারে না। যোগী তখন কণ্ঠ থেকে পেট পর্যন্ত সর্বত্র অনুভব করতে পারেন, বায়ু নামছে নিচের দিকে—নাড়ির রন্ধ্র দিয়ে। মূলবন্ধ ও অশ্বিনী মুদ্রা করে অপান বায়ুর নিচের দিকে নামার পথও বন্ধ করা হয়। এইভাবে দেহের মধ্যে যে সঞ্চিত বায়ু সেই বায়ু মন ও ইচ্ছার নির্দেশে কাজ করে যন্ত্রের মত। মূলাধার চক্রে যে মূলশক্তি, সে তখন বাধ্য হয় ঊর্ধ্ব দিকে উঠতে।

মূলাধার চক্রে মনকে সন্নিবেশ করা হয় যে-ভাবে তার পদ্ধতি হল এইরকম : মূলাধার চক্রকে জাগরিত করার জন্য যে সব জপের ব্যবস্থা আছে সেই মন্ত্র জপ করতে হবে একে একে। এতে লাভ হবে মন্ত্রশক্তি। জীবাত্মাকে মনে করা হয় প্রদীপের ক্ষীণ শিখার মত। হৃদয় থেকে সেই জীবাত্মাকে নিয়ে আসা হবে মূলাধারে। জীবাত্মা হল সূক্ষ্ম দেহের আত্মা। অর্থাৎ এর মধ্যে রয়েছে অন্তঃকরণ, বুদ্ধি, অহংকার ও মন। রয়েছে ইন্দ্রিয়বৃত্তি। এবং সেই কারণে প্রাণও। যতক্ষণ থাকবে ভূত জগতের সামান্য স্তরও তারই আবরণে আত্মা থাকবে জীবাত্মা হয়ে। চক্রে চক্রে স্তরে স্তরে তার শুধু রূপান্তর।

চক্র হল ভূতজগতের এক একটা স্তর। সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হয়ে সেই কারণে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত থাকবে জীবাত্মার অস্তিত্ব। শক্তি রয়েছে দেহের যে স্তরে সেই স্তরে মন দ্বারা, ইচ্ছাশক্তি দ্বারা দেহের মধ্যে আবদ্ধ প্রাণবায়ু ও অপান বায়ুর উত্তপ্ত অস্তিত্বকে পরিচালনা করতে হবে। বিভিন্ন স্তরে বীজমন্ত্র জপ করতে হবে যথাযথ জ্ঞানে। বায়ু ঘুরতে থাকবে দক্ষিণে বামে। কুম্ভকে আবদ্ধ উত্তপ্ত প্রাণবায়ু ও অপান বায়ুর সম্মিলিত চাপ এবং বহ্নিবীজ 'রং' প্রজ্বলিত করে আগুন। শাস্ত্রে এ আগুনকে বলে কামাগ্নি। সেই উত্তাপ ঘিরে ধরে কুণ্ডলিনীকে। গাছের কোটরের মুখে আগুন জ্বাললে যেমন ঘুমন্ত সর্প তাড়া খেয়ে

জেগে ওঠে, তেমনই ভাবে জেগে ওঠে কুণ্ডলিনী। পরমহংস বা পরম শিবের জন্য তাঁর মধ্যে জেগে ওঠে কামনা। সক্রিয় শক্তি জেগে উঠে চলে অভিসারে।

নানা যোগে কুণ্ডলিনীকে জাগরিত করার নানা পদ্ধতি। যেমন যোগকুণ্ডলী উপনিষদে আছে এই ধরনের পদ্ধতির কথা : যখন প্রাণ চলে ইড়ার মধ্য দিয়ে তখন পদ্মাসনে বস, তখন আকাশকে ১২ থেকে বাড়িয়ে কর ১৬, অর্থাৎ নিঃশ্বাস সাধারণতঃ নেওয়া হয় ১২ মাত্রায়, তাকে কর ১৬। ছাড়ার সময়ও কর ১৬ মাত্রা। এক্ষেত্রে নিঃশ্বাস নেবার সময়ই তাকে করতে হবে ১৬ মাত্রায়। এতে ঘটবে শক্তি বৃদ্ধি। দুই হাত দুই দিকে ধরে কুণ্ডলিনীকে নাড়িয়ে দাও। কুণ্ডলিনীকে নাড়াও ডান থেকে বাঁদিকে ৪৮ মিঃ ধরে। এবার শরীরকে সোজা কর যাতে কুণ্ডলিনী প্রবেশ করতে পারে সুষুম্নাতে। কুণ্ডলিনীকে সুষুম্নাতে নিতে যোগী বার বার কাঁধ দুটোকে নামান এবং ওঠান। প্রাণ তখন নিজে নিজেই প্রবেশ করে সুষুম্নাতে। এবার উপরের দিক সংকুচিত করে তলপেটকে করতে হবে প্রসারিত। তারপরই আবার তলপেটকে সংকুচিত করে উপরের দিককে করতে হবে প্রসারিত। এতেই প্রাণ ক্রমশঃ উঠতে থাকবে উপরের দিকে।

আনন্দলহরীতে বলা হয়েছে, 'মহাবিশ্বে সূর্য এবং চন্দ্র যেমন ঘুরে দেবযান এবং পিতৃযানে অর্থাৎ উত্তর এবং দক্ষিণ মণ্ডলে, তেমনই চলছে ইড়া এবং পিঙ্গলা। চন্দ্র চলছে বাম নাড়ি ইড়াতে। সমস্ত দেহ শিশিরসিক্ত করে দিচ্ছে অমৃতধারায়। সূর্য চলছে দক্ষিণ নাড়ি পিঙ্গলাতে শুকিয়ে দিচ্ছে সেই শিশিরসিক্ততা। মূলাধারে যখন সূর্য এবং চন্দ্রের সাক্ষাৎকার হচ্ছে তখন হচ্ছে অমাবস্যা। কুণ্ডলী ঘুমিয়ে আছে এই আধার কুণ্ডে। নিয়ন্ত্রিতমন যোগী যখন চন্দ্রকে আবদ্ধ রাখতে পারেন তার যথাযথ স্থানে, তখন চন্দ্র পারে না অমৃত শিশির ছড়াতে, সূর্যও পারে না তাকে শুষ্ক করতে। যখন বায়ুর সাহায্যে অগ্নি অমৃত-স্থানকে করে বিশুষ্ক, কুণ্ডলিনী তখন জেগে ওঠে খাদ্যের অভাবে,

হিস্‌হিস্‌ করে ওঠে সাপের মত। তারপরই তিন তিনটে গ্রন্থি অতিক্রম করে সাপ চলে সহস্রারের দিকে। সে দংশন করে চন্দ্রকে। আবার তখন চন্দ্র থেকে ঝরতে থাকে অমৃতধারা। এতে সিক্ত হয়ে ওঠে আজ্ঞাচক্রের চন্দ্রমণ্ডল। সেই আজ্ঞাচক্র থেকে আবার সমস্ত দেহ সিক্ত হয় অমৃত শিশিরে। এরপর আজ্ঞাচক্রের পনেরটি শাশ্বত কলা (অংশ) চলে যায় বিশুদ্ধিতে। সেখান থেকে আবার সে চলতে থাকে। সহস্রারের চন্দ্রমণ্ডলকে বলে বৈন্দব (Baindav)। একটি কলা সব সময়ই সেখানে থাকে। সেই কলাই হল স্বয়ং চৈতন্য। একেই বলা হয় আত্মা। আমরা বলি ত্রিপুরসুন্দরী। এ থেকেই ধারণা যে কুণ্ডলিনীকে জাগরিত করতে গেলে চন্দ্রপক্ষই বিধেয়, সূর্যপক্ষ নয়।

দক্ষ ঘোড়সওয়ার যেমন লাগাম দিয়ে ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রিত করে তেমনি করে নিয়ন্ত্রণ করে কুণ্ডলিনীকে নিতে হয় ঊর্ধ্বে। কুণ্ডলিনী কর্তৃক বন্ধ দুয়ার তারই সাহায্যে খুলতে হয়। চিত্রিণী নাড়ির মধ্য দিয়ে তাকে নিতে হয়। সেই নাড়ির মধ্যে রয়েছে যেসব চক্র কুণ্ডলিনী নিজেই চলতে থাকেন সেই চক্রগুলি ভেদ করে। চক্রের মধ্য দিয়ে তিনি যখন চলেন তখন চক্রগুলি মুখ খুলে দেয় উপরের দিকে। এক একটি চক্র ভেদ হয় আর কুণ্ডলিনী সূক্ষ্ম জীবাত্মার সঙ্গে মিলতে থাকেন। স্তরে স্তরে এক একটি চক্রের তত্ত্বও হারিয়ে যায় কুণ্ডলিনীর মধ্যে। অর্থাৎ এক একটি চক্রমণ্ডলে রয়েছে যেসব তত্ত্বভিত্তিক বা পদার্থভিত্তিক জৈব চেতনা সবই মিশে যায় কুণ্ডলিনীর মধ্যে। কুণ্ডলিনী যত উপরের দিকে ওঠেন স্তরে স্তরে স্থূল তত্ত্ব ততই হারিয়ে যায় তাঁর মধ্যে। তত্ত্বের অঞ্চলগুলি পূর্ণ হয়ে ওঠে কুণ্ডলিনীর নিজের শক্তিতে। বিশুদ্ধ চক্র পার হবার পর সব চক্রই তখন শক্তি। তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত জৈব চেতনা সবই মিশে যায় কুণ্ডলিনীর সঙ্গে। কুণ্ডলিনী আত্মস্থ করে নেন আজ্ঞাচক্রে গিয়ে সব সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলিকে। দেহের তিনটি স্তর বা চক্র পার হলে কুণ্ডলিনী তখন ভিন্নরূপ। ষটচক্রের মধ্যে তিনটিতে আছে লিঙ্গ। অগ্রগতির পথে তিনটি লিঙ্গের ভাব অনুযায়ী কুণ্ডলিনীর সঙ্গে তখন শিবের

মিলন হয়। কুণ্ডলিনী যখন মূলাধারে তিনি তখন স্থূল জগতের শক্তি। উপনিষদে মহাবিশ্ব প্রসঙ্গে এই অংশকে বলা হয়েছে 'বিরাট'। আজ্ঞা-চক্রে তিনি হলেন সূক্ষ্ম দেহের বা প্রকৃতির শক্তি। উপনিষদে সৃষ্টি তত্ত্বের এই অংশকে বলা হয়েছে হিরণ্যগর্ভ। সহস্রারে তিনি অধ্যাত্ম অঞ্চলের শক্তি। উপনিষদের ভাষায় এ অঞ্চল হল ঈশ্বরের অঞ্চল। অদ্বৈত শিবে তিনি হলেন গুণস্বরূপা। এই গুণের মধ্যেই রয়েছে প্রাকৃত জগতের মূল।

মায়াতন্ত্রে বলা হয়েছে—'চারটি শব্দ সৃষ্টিকারিণী শক্তি—অর্থাৎ পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা ও বৈখরী শব্দ হল একই কুণ্ডলিনী—কুণ্ডলিণ্য ভেদরূপা। কুণ্ডলিনী যখন কেবলমাত্র যাত্রা শুরু করেন সহস্রারের দিকে তিনি তখন থাকেন বৈখরীরূপে স্বয়ম্ভূলিঙ্গকে মুগ্ধ করে। অনাহত চক্রে তিনি মুগ্ধ করেন বাললিঙ্গকে মধ্যমারূপে। আজ্ঞাচক্রে ইতরলিঙ্গকে মুগ্ধ করেন পশ্যন্তিরূপে। যখন তিনি উঠে যান পরাবিন্দুতে তখন তার পরাভাব।

কুণ্ডলিনীর ঊর্ধ্বগতি শুরু ক্রমশঃ স্থূল জগৎ থেকে সূক্ষ্ম জগতের দিকে। তারপর আরও ঊর্ধ্বগতিতে সমস্ত তত্ত্বের লয়। ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ এবং পাদ, যার নির্ভরস্থল হল পৃথ্বী, স্থূলভূমি, কুণ্ডলিনীর ঊর্ধ্বগতিতে তা মিলিয়ে যায় গন্ধ তন্মাত্রে। 'অর্থাৎ মূলাধারে রয়েছে যে তত্ত্ব তার তন্মাত্রে। কুণ্ডলিনীর আরও ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে সঙ্গে গন্ধতন্মাত্র চলে যায় স্বাধিষ্ঠানে। স্বাধিষ্ঠান হল অপ-এর অঞ্চল যার উপর ভর করে আছে আস্বাদন ও পাণির মত ইন্দ্রিয়। এই ইন্দ্রিয়গুলি তখন মিলিয়ে যায় রসতন্মাত্রে। কুণ্ডলিনী রসতন্মাত্র নিয়ে উঠে আসেন মণিপুর অঞ্চলে। এ অঞ্চল হল তেজের অঞ্চল। এর উপর নির্ভর করে আছে দর্শন শক্তি ও পায়ুর মত ইন্দ্রিয়। এই ইন্দ্রিয়গুলি তখন মিশে যায় রূপতন্মাত্রে। কুণ্ডলিনী তখন রূপ-তন্মাত্রকে নিয়ে আসেন অনাহত অঞ্চলে—এ অঞ্চল হল বায়ুর অঞ্চল। এর উপর নির্ভর করে আছে স্পর্শন ও উপস্থ-এর মত ইন্দ্রিয়। এ ইন্দ্রিয়গুলি তখন মিশে যায় স্পর্শতন্মাত্রে। স্পর্শ-

তন্মাত্র নিয়ে কুণ্ডলিনী আসেন বিশুদ্ধ চক্রে অর্থাৎ আকাশ অঞ্চলে। এ অঞ্চলের উপর নির্ভর করে আছে শ্রবণ ও মুখের মত ইন্দ্রিয়। এই ইন্দ্রিয়গুলি তখন মিশে যায় শব্দতন্মাত্রে। এরপর কুণ্ডলিনী শব্দ-তন্মাত্র নিয়ে আসেন আজ্ঞাচক্রে। এ অঞ্চল মহামানসের এক লীলা-ক্ষেত্র মাত্র। এই মানসলোকও মিশে যায় সূক্ষ্মতর শব্দতন্মাত্রে। আজ্ঞাচক্র থেকে কুণ্ডলিনীর উর্ধ্বগতির সঙ্গে সঙ্গে মন মিশে যায় মহতে। আরও উঠে গেলে মহৎ মিশে যায় সূক্ষ্ম প্রকৃতিতে। আরও উঠে গেলে সূক্ষ্ম প্রকৃতি মিশে যায় সহস্রারের পর-বিন্দুতে। এই মিলনের পরেও আছে নানা স্তর—যেগুলি ক্রমশঃ উর্ধ্ব অনুভূতিতে মিশে যয়ে এইভাবে: যেমন, নাদ থেকে নাদান্তে, নাদান্ত থেকে ব্যাপিকাতে, ব্যাপিকা থেকে সমনীতে, সমনী থেকে উন্মনীতে, উন্মনী থেকে বিষ্ণুবক্ত্রে অথবা পুং বিন্দুতে, এই পুং বিন্দুই হল পরশিব।

কুণ্ডলিনীর উধ্বগতিতে বিভিন্ন অঞ্চলের চরিত্র অনুযায়ী সেই সেই অঞ্চলের দেবতা ও বৃত্তিগুলি নষ্ট হয়ে যেতে থাকে একে একে—যেমন, ব্রহ্মা, সাবিত্রী, ডাকিনী, মাতৃকা, এইসব মুলাধারের দেবদেবী ও বৃত্তি কুণ্ডলিনীর উর্ধ্বগতির সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যায় উর্ধ্ব অঞ্চলে, যেন নদীর প্রবল স্রোতে আবর্জনা সরে যেতে থাকে উজানে। হারিয়ে যায় সেই সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের বীজও। যেমন, পৃথ্বী অঞ্চলের বীজ হল লং। এই বীজ আর কিছুই নয় এখানে শব্দশক্তি রয়েছে সূক্ষ্ম মন্ত্রের আকারে। এই বীজের মধ্যে মিলেমিশে একাকার হয়ে রয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলের তত্ত্ব, তন্মাত্র এবং ইন্দ্রিয়সমূহ। যেমন, সমস্ত পৃথ্বীতত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে তার বীজ থেকে, আবার এই বীজের মধ্যেই মিশে যাবে যখন শক্তি অর্থাৎ কুণ্ডলিনী এগুবেন ক্রমলয়ের দিকে। বীজ হল স্রষ্টা-চৈতন্যের সেই অবস্থা যা তাকে সঞ্চালিত করেছিল সৃষ্টির দিকে। স্রষ্টা-চৈতন্যের সেই অবস্থা বৈখরী শব্দের আকারে প্রকাশ পেয়েছে লং হয়ে।

কুণ্ডলিনী যখন মুল্যাধার ত্যাগ করেন তখন যে প্রাণপ্রবাহে চক্র উর্ধ্বদিকে তার মুখ খুলে দেয় কুণ্ডলিনী সেই চক্র ভেদ করলেই পদ্মের

বা চক্রের উর্ধ্বমুখী দলগুলো ঝুঁকে পড়ে নিচের দিকে, যেমন ছিন্নবৃন্ত একটি ফুলের পাপড়ি ঝুঁকে পড়ে। এর কারণ, তখন প্রাণশক্তি আর তার মধ্যে বর্তমান থাকে না। যেন চক্রটা তখন প্রাণহীন পদ্মের মৃণালের মুখে একটি কুঁড়ি মাত্র।

কুণ্ডলিনী যখন স্বাধিষ্ঠান চক্রে এসে পৌঁছান সেই চক্রের দলগুলি সঙ্গে সঙ্গে উর্ধ্বমুখী হয়ে ওঠে। চক্রের মুখ খুলে যায়। কুণ্ডলিনীর আগমনে এ অঞ্চলের সমস্ত দেবদেবী অর্থাৎ বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী, রাকিনী, মাতৃকা এবং বৃত্তি ; সমস্ত ধাম—বৈকুণ্ঠ, গোলক, ইত্যাদি সব মিশে যায় কুণ্ডলিনীর সঙ্গে। যেন নদীর স্রোত ঘূর্ণিপাকের মধ্যে ফেলে সব কিছুকে ডুবিয়ে দেয়। পৃথ্বী বীজ লং তখন ডুবে যায় অপ্ তত্ত্বে। অপ্ তত্ত্বের বীজ বং তখন থাকে কুণ্ডলিনীর দেহকে আশ্রয় করে। দেবী তখন ওঠেন মণিপুর চক্রে—অর্থাৎ ব্রহ্ম গ্রন্থিতে। এ তত্ত্বের সমস্ত কিছু মিশে যায় দেবীর দেহে। বরুণ বীজ মিশে যায় অগ্নি বীজ রং-এর মধ্যে। 'রং' মিশে থাকে দেবীর দেহে। শক্তি তখন ওঠেন অনাহত চক্রে। খুলে যায় বিষ্ণুগ্রন্থি। এ অঞ্চলের সমস্ত দেবদেবী, তত্ত্ব, সবই নিজেদের হারিয়ে-ফেলে দেবীর মধ্যে। অগ্নি বীজ রং মিশে যায় বায়ুতে, এবং বায়ু যং বীজে রূপান্তরিত হয়ে মিশে যায় দেবীর মধ্যে। শক্তি তখন উঠে আসেন বিশুদ্ধ চক্রে। শক্তি এ অঞ্চলে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অর্ধনারীশ্বর শিব, শাকিনী, ১৬টি স্বরবর্ণ, মন্ত্র, সব মিশে যায় তাঁর সঙ্গে। বায়ু বীজ যং মিশে যায় ব্যোমে এবং ব্যোম রূপান্তরিত হয় হং বীজে। হং মিশে যায় দেবীর মধ্যে। লুকানো ললনাচক্র ভেদ করে দেবী আসেন আজ্ঞাচক্রে, রুদ্রগ্রন্থিতে। এখানে যে আছেন পরম শিব, সিদ্ধকালী এবং অন্যান্য দেবতা, তাঁরা মিশে যান দেবীর মধ্যে। রুদ্র-গ্রন্থি পার হয়ে কুণ্ডলিনী চলেন পরম শিবের সঙ্গে অভিসারে। দ্বিদল চক্র আজ্ঞাচক্র থেকে দেবী যখন চলেন উর্ধ্বদিকে, তখন নিরালম্বপুরী প্রণব, নাদ, এবং আরও সব সূক্ষ্ম বিভিন্ন পর্যায় একে একে মিশে যায় শক্তির সঙ্গে। তাঁর উর্ধ্বগতির সঙ্গে সঙ্গে স্থূল

থেকে আরম্ভ করে ২৩টি তত্ত্ব মিশে যায় দেবীর দেহে। তারপর শুধু-মাত্র থাকে পরম চৈতন্য হিসেবে শক্তি, যে-শক্তি সকল শক্তির কারণ, যে-শক্তি প্রায় শিবের সঙ্গে একাত্ম।

নানা রকম আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম ইত্যাদির সাহায্যে মনঃসংযোগের পদ্ধতি দ্বারা শক্তি স্থূলজগৎ থেকে মিশে যায় সূক্ষ্মে, মিশে যায় মূল কারণে, মিশে যায় চিদাত্মাতে, অর্থাৎ আত্মার 'চিৎ' অংশে। মানুষের মুখের ভাষা হল স্থূল জগতের প্রকাশ। কিন্তু এর মূল রয়েছে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতমে অবাঙ্মানস-গোচরমে। শক্তি কুণ্ডলিনী চৈতন্যকে নিয়ে যায় সেই অবাঙ্মানসগোচরম জগতে, তুরীয়াতীত অবস্থাতে। আকাঙ্ক্ষার তাড়নায়, অর্থাৎ শিবের জন্য শক্তির আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় শক্তি ছুটে চলেন শিবের দিকে। শিবের মুখপদ্ম চুম্বন করে উপভোগ করেন মিলনের আনন্দ। একেই বলে পুরুষ ও রমণীর সাম্যরস।

দেহের মধ্যে অতীন্দ্রিয় ক্ষেত্রে শিবশক্তির মিলনে যে আনন্দ তার চেয়ে বড় আনন্দ স্থূল দেহে আর কিছু নেই। ধর্মশাস্ত্রকার দক্ষ তাই বলেছেন 'ব্রহ্মাণকে জানতে হবে ব্রহ্মাণের মধ্যেই'। সেই ব্রহ্মাণকে জানা হল নিষ্কলঙ্ক কুমারী স্ত্রীকে জানার আনন্দের মতই—'স্বসংবেদ্যম এতৎ ব্রহ্ম কুমারী স্ত্রী-সুখম যথা।' লয়সিদ্ধ যোগে অনুরূপ ভাবে সাধক নিজেকে মনে করেন শক্তি হিসেবে এবং পরমাত্মাকে পুরুষ হিসেবে। এবং শক্তি ও পুরুষের মিলনে (যাকে বলে সঙ্গম) বোধ করেন নবরসের প্রথম রস অর্থাৎ শৃঙ্গার রসের আনন্দ। আদিরস অর্থাৎ শৃঙ্গার রস যার জাগরিত হয় সত্ত্বগুণের সাহায্যে সেই রস হল অখণ্ড, সপ্রকাশ এবং আনন্দময়, যে আনন্দের মূল হল চৈতন্যে। এই আনন্দ এত নিবিড়, এত সর্বাত্মক যে, এ আনন্দ পেলে প্রেমিক ভুলে যায় অন্য সব বিষয়। এ আনন্দ হল ভেদান্তর-স্পর্শ-শূন্য। এ আনন্দ হল ব্রহ্মানন্দের সহোদর —ব্রহ্মস্বাদসহোদর। অর্থাৎ একই মায়ের গর্ভজাত। যৌন আনন্দ হল নির্গুণব্রহ্মস্বরূপ চিন্তা। সেই চিন্তা থেকেই এ আনন্দের জন্ম।

ব্রহ্মানন্দ একমাত্র যোগীর কাছেই ব্যক্ত। অলংকার শাস্ত্রে সেজন্য শেষ পর্যন্ত বলা হয়েছে 'মরণশীল জগতে সত্যিকারের ভালবাসার আনন্দ অল্প লোকেরই জানা আছে। দৈহিক যৌনানন্দ এবং অন্যান্য আনন্দ ব্রহ্মানন্দের সামান্য অংশ মাত্র। সাধকের দেহের মধ্যে শক্তি ও শিবের মৈথুন যোগিনীতন্ত্রের মতে ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিদের কাছে 'সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মৈথুন।' একেই বলে 'যতিঃ'—

সহস্রারোপরি বিন্দৌ কুণ্ডল্যা মেলনম শিবে।

মৈথুনম পরমম্ দ্রব্যম্ যতীনাম পরিকীর্তিতম॥

বৃহৎ শিক্রমের মতে, যোগীরা জ্ঞানচক্ষুতে, নাদে নিষ্কলঙ্ক কলাকে দেখতে পান চিদানন্দে মিলিত। নির্মল স্ফটিকের মত পুরুষ হলেন মহাদেব—বিশ্বরূপনিনাদ অর্থাৎ উজ্জ্বল কারণ, এবং রমণী হলেন মনোরম অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মত—যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে কাম তাড়নাতে। এই পুরুষ ও রমণীর মিলনে ক্ষরিত হয় অমৃত, যে অমৃতপ্রবাহ ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে বয়ে চলে মূলাধার পর্যন্ত ; সমস্ত ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডকে অর্থাৎ দেহের সর্বস্তরকে ভাসিয়ে দেয়। তখনই সাধক তাঁর সবকিছু বিস্মৃত হয়ে ডুবে থাকেন এক অনির্বচনীয় আনন্দে।

শঙ্করাচার্যের চিন্তামণি স্তবকে আছে, এই পারিবারিক মহিলা (কুণ্ডলিনী) রাজপথে এসে (সুষুম্না) বিভিন্ন পুণ্যক্ষেত্রে (চক্রে) থেমে, পরমস্বামীকে (পরশিবকে) আলিঙ্গন করেন। তিনি অমৃত ধারাকে প্রবহমান করেন অর্থাৎ সহস্রার থেকে আনন্দ শিহরণকে প্রবাহিত করেন।

গুরুর নির্দেশ সাধককে নিতে পারে শুধু আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত। আজ্ঞাচক্র ভেদ হলে কারো নির্দেশ ছাড়াই সাধককে এগুতে হবে ব্রহ্মস্থানে। আজ্ঞাচক্রের উপরে গেলেই গুরুশিষ্য সমান। কুণ্ডলিনী চতুর্দশগ্রন্থি, অর্থাৎ তিনলিঙ্গ, ছয়চক্র এবং পাঁচটি শিবকে ভেদ করলেই পরশিব থেকে নিঃসৃত অমৃত পান করতে পারেন, এবং যে পথে এসেছিলেন সে পথেই আবার ফিরে যেতে পারেন মূলাধারে।

কুণ্ডলিনীর উর্ধ্বযাত্রাপথে স্তরে স্তরে যে-সব চক্র লয় পেয়েছিল প্রত্যাবর্তনমুখী কুণ্ডলিনীর ছোঁয়া পেয়ে আবার তারা সবাই জেগে ওঠে, যেন বৃষ্টির ছোঁয়া পেয়ে মরে যাওয়া ঘাস আবার সবুজ হয়ে ওঠে। এই জন্য কুণ্ডলিনীর উর্ধ্বযাত্রা হল লয়কর্ম, আর নিম্নযাত্রা হল সৃষ্টিকর্ম। সৃষ্টিকর্মে যে জগৎকে শক্তি প্রকাশ করেছিলেন লয়কর্মে নিজেই তাকে গ্রাস করেন। এই ওঠা নামার রহস্যময় পথের সন্ধান যোগীদের জ্ঞাত বলেই তাঁরা বস্তুজগৎ ও অবস্তুজগৎ দুয়ের স্বরূপকেই ভাল করে জানেন। সৃষ্টির উৎসে পৌঁছে গিয়ে তাঁরা জানতে পারেন সৃষ্টির প্রারম্ভ তত্ত্ব, জানতে পারেন লয়তত্ত্ব। এই মায়াময় জগতের যথার্থ স্বরূপ কি, এই জন্য এ জবাবও তাঁদের কাছে স্পষ্ট।

কুণ্ডলিনী যখন জাগেন তখন অনুভূত হয় এক তীব্র উত্তাপ। কুণ্ডলিনীর উর্ধ্বগতি আরম্ভ হলে নিম্নাঙ্গ ক্রমশঃ অসাড় হতে থাকে। শরীর মনে হয় মড়ার মত শীতল। কুণ্ডলিনী দেহের যে অংশ অতিক্রম করেন সেই অংশেরই এই অবস্থা হয়। এর কারণ, তিনিই হলেন প্রাণশক্তি। এই প্রাণশক্তিই দেহকে স্পন্দনে স্পন্দিত রাখে। এ প্রাণশক্তি যেখান থেকে সরে যায় সে স্থানই হয় নিশ্চল, জড়বৎ, মৃতবৎ,। কুণ্ডলিনীর উর্ধ্বগতিতে উর্ধ্বাঙ্গ বিশেষ করে মস্তিষ্কমণ্ডল আলোকিত হয়। অযুত জ্যোতি দেখা দেয় সেখানে, যাকে বলে প্রভা। যোগী যখন সমাধি লাভ করেন তখন একমাত্র ব্রহ্মরন্ধ্রেই উত্তাপ থাকে, কারণ, শিব ও শক্তি সেখানে মৈথুনে থাকেন। এ-সব সত্য কিনা সিদ্ধযোগীর সাক্ষাৎ পেলেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি চাক্ষুস দেখাতে পারেন যোগসাধনার এই আশ্চর্য কলাকৌশল। কুণ্ডলিনীর উর্ধ্বগতির সঙ্গে সঙ্গে যোগীর দেহের বিভিন্ন স্থানের নিশ্চলতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ধ্যানযোগীদের ক্ষেত্রে এ-সব লক্ষ্য করা যাবে না। কারণ, ধ্যানযোগীরা ধ্যানের মধ্যেই পারেন এই নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ অনুভব করতে। এজন্য কুণ্ডলিনী জাগরণের দরকার হয় না তাঁদের।

ভূতশুদ্ধিতে ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে কুণ্ডলিনীর প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে ক্রিয়া-

কলাপের বর্ণনা আছে। সাধক বাম নাসারন্ধ্রে বায়ুবীজ যং-এর চিন্তা করে ইড়াতে এই মন্ত্র ১৬ বার জপ করে নিঃশ্বাস নেন। তারপর দুই নাসারন্ধ্রই বন্ধ করে এই মন্ত্র ৬৪ বার জপ করেন। তারপর তিনি চিন্তা করেন, যেন তলপেটের বামগর্তে পাপপুরুষ বায়ুতে শুকিয়ে যাচ্ছে। এই চিন্তা করতে করতেই পিঙ্গলাতে নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ৩২ বার এই বীজ (যং) জপ করে।

সাধক এরপর মণিপুর চক্রের রং বীজ ধ্যান করতে করতে ১৬ বার সেই বীজ জপ করে নিঃশ্বাস নেন। তারপর নিঃশ্বাস বন্ধ করে আরও ১৬ বার জপ করেন সেই বীজ। মন্ত্র জপ করতে করতে ভাবেন তাঁর ভেতরের পাপপুরুষ পুড়ে ভস্ম হয়ে যাচ্ছে। তারপর দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে এই বীজ ৩২ বার জপ করতে করতে নিঃশ্বাস নেন। তারপর চিন্তা করেন শ্বেত চন্দ্রবীজ যং। তারপর ১৬ বার সেই বীজ জপ করতে করতে ইড়া দিয়ে নিঃশ্বাস নৈন। তারপর বন্ধ করেন দুটো নাসা রন্ধ্রই। ৬৪ বার জপ করেন সেই বীজ মন্ত্র। তারপর পিঙ্গলা দিয়ে নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বীজমন্ত্র জপ করতে করতে। নিঃশ্বাস নেবার সময়, কুম্ভক করার সময় এবং নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় চিন্তা করেন যে, চন্দ্র থেকে নিঃসৃত অমৃতধারায় তৈরী হচ্ছে এক নতুন স্বর্গীয় দেহ। সমস্ত মাতৃকাবর্ণ নিয়ে সেই দেহ শব্দ-শক্তি দিয়ে তৈরি, যে শব্দের আত্ম-প্রকাশ অক্ষরে, বৈখরী আকৃতিতে। অনুরূপ ভাবে চিন্তা করেন, অপ-এর বীজ বং দিয়ে তৈরি হয়ে চলেছে সেই দেহ। পৃথ্বী তত্ত্বের বীজ লং দিয়ে সেই দেহ হচ্ছে পূর্ণ ও শক্তসমর্থ। সবশেষে 'সোহম্' উচ্চারণ করে সাধক জীবাত্মাকে হৃদয়-চক্রে পরিচালনা করেন। এইভাবে ভূতশুদ্ধিতে সাধক চেতনাকে উন্নীত করেন সহস্রারের দিকে।

কুণ্ডলিনী প্রথম প্রথম সহস্রারে বেশিক্ষণ থাকেন না। যোগীর অভ্যাসের উপর নির্ভর করে সেই স্থায়িত্ব। কুণ্ডলিনীর সহজাত সংস্কারে তিনি আবার নেমে আসতে চান নিচে। যোগী তাঁর সাধনার বলে তাঁকে উর্ধ্বে ধরে রাখেন। যত বেশিক্ষণ তাঁকে উর্ধ্বে ধরে রাখা যাবে

এই ভাবে, ততই শক্তি ও শিবের শাশ্বত মিলনের পথ তৈরি করবেন তিনি। মনে রাখতে হবে যে, কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে পঠালেই মোক্ষ লাভ হয় না। তাছাড়া মূলাধারে তাঁকে জাগ্রত করে ক্ষান্ত হলেও কিছু হবে না। কিংবা নিম্ন চক্রমণ্ডলে তাঁকে ওঠা নামা করালেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। মোক্ষ হবে তখনই যখন কুণ্ডলিনী সহস্রারে চিরকালের জন্য তাঁর স্থান করে নেবেন। এমন করতে হবে যে, কুণ্ডলিনী আর তাঁর স্বাভাবিক সংস্কারে নিচে নামতে পারবেন না কখনও। তাঁর নিচে নামা নির্ভর করবে সাধকের ইচ্ছার উপর। এমনও হয় যে, কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে উঠিয়ে অনেক সাধক আবার তাকে এনে রাখলেন অনাহত চক্রে। এবং সেখানেই তাঁর পূজা করেন। যাঁরা সহস্রারে তাঁকে বেশিক্ষণ রাখতে পারবেন না তাঁরাই একাজ করেন। হৃদ-চক্রের নিচের চক্রে কেউ যদি কুণ্ডলিনীকে রেখে পূজা করেন তবে সেই সাধক হন সময়গোষ্ঠীর সাধক। যে সাধক তিনদিন তিনরাত্রি কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে রাখতে পারেন তিনিই সিদ্ধ সাধক।

প্রাথমিক সাধনায় যখন দেহমন শুদ্ধ হয় তখনই সাধক শিখতে আরম্ভ করেন কি করে করতে হয় সুষুম্নার দুয়ার উন্মোচন, কারণ, সুষুম্নার মুখ মূলের কাছে রুদ্ধ থাকে, একেই বলা হয় কুণ্ডলিনীর মুখদ্বারা বদ্ধ ব্রহ্মদ্বার। সুষুম্না নাড়ির গোড়াতে এবং মূলাধার চক্রে কুণ্ডলিনী লিঙ্গ ঘিরে সাড়ে তিনপ্যাঁচে ঘুমিয়ে থাকেন। এই লিঙ্গ হল শব্দব্রহ্মণের পুরুষ স্বরূপ। কুণ্ডলিনী হলেন সেই পুরুষের প্রকৃতি রূপ। কুণ্ডলিনী তাঁর সৃজনী প্রতিভায় মন ও বস্তুরূপে তৈরি করেন সমস্ত প্রাণস্পন্দিত দেহ। কিন্তু তিনি নিজে থাকেন মূলাধারে ঘুমিয়ে। শব্দব্রহ্মণ-শক্তির এই হল সাধারণ অবস্থানের কেন্দ্র। নিজেকে সৃষ্টিরূপে প্রাকাশ করবার পর শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ স্থূলতম পর্যায়ে অর্থাৎ মৃত্তিকাতে যেখানে এসে তাঁর সৃষ্টিকর্ম শেষ যেখানে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। তাঁর অবশিষ্ট প্রাণশক্তি সুপ্ত থাকে ঘনীভূত শক্তির আকারে। যোগ সাধনায় কেউ যদি চায় এই শক্তির সাহায্য, তার প্রথম চেষ্টাই হবে এই কুণ্ডলিনী

শক্তিকে জাগরিত করা। ভিন্ন রকমে বলতে গেলে শক্তিকে তাঁর ঘনীভূত অবস্থা থেকে জাগ্রত করে ক্রিয়াশীল করতে হয় তাঁর নিজেরই আর এক রূপ অর্থাৎ স্থায়ী আলোর রূপের সঙ্গে পুনর্মিলিত করতে। সে স্থায়ী আলো হচ্ছে সহস্রারে।

কুণ্ডলী শক্তিই হচ্ছে চৈতন্য, চিৎ। এর সৃজনী ভূমিকায় এ হল শক্তি। শক্তি হিসেবে তাঁর ক্রিয়াতেই এই বিশ্ব ও জীবজগৎ টিকে আছে। প্রকৃত শক্তি মূলাধারে আছে প্রসুপ্তা, অর্থাৎ আছে ঘনীভূত হয়ে। কিন্তু এর মানসিকতা হল আরও জড়িয়ে পড়ার দিকে। অর্থাৎ বহির্মুখী। যেহেতু তিনি ঘনীভূত অবস্থাতে রয়েছেন জীবের মধ্যে সেই জন্যই জীবজগৎ কাজ করছে, চলচে। এই শক্তির বহির্মুখী মানসিকতার জন্যই মানুষ উৎসকে ভুলে ডুবে আছে নিজেকে নিয়ে। মায়ার প্রভাবে নিজের দেহকেই ভাবছে খাঁটি এবং স্বতন্ত্র বলে। ভুগছে অহংকারে। ফলে যে সংস্কার জমে যাচ্ছে তার জীবাত্মাতে, অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহে, সেই সংস্কারই তাকে বার বার ফিরিয়ে আনছে জন্মমৃত্যুর বৃত্তে। কুণ্ডলিনীর প্রভাবেই জীব ভাবে বিশ্ব ও ব্রহ্মাণ থেকে সে পৃথক। মূলাধারে তাঁর নিদ্রা হল অজ্ঞানতার বন্ধন। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি মূলাধারে এই অবস্থাতে থাকবেন ততক্ষণ চলবে এই ভাবেই। তিনি যখন ঘুমন্ত, মানুষ তখন জাগ্রত। শক্তি যখন জাগবে পশু তখন ঘুমোবে। সেইজন্যই তাঁকে জাগানো হয়, যাতে করে মানুষের মধ্যে পার্থক্যসৃষ্টিকারী বৃত্তিগুলি অর্থাৎ পশুগুলি ঘুমিয়ে পড়ে। কুণ্ডলিনী জেগে উঠলেই ফিরে যেতে চান দয়িতের কাছে। যে দয়িত তাঁর নিজেরই আর এক রূপ মাত্র। তাঁর প্রত্যাবর্তন মানে, তাঁর ক্রিয়াশক্তির প্রত্যাহার অর্থাৎ যে-শক্তির বলে এই সৃষ্টি। তাই তিনি ফিরে গেলেই সৃষ্টি লয় পায়। দেহের ক্ষুদ্র বিশ্বের মধ্যেই তিনি যখন সৃষ্টি থেকে ফিরে যান উৎসে অর্থাৎ মূলাধার থেকে সহস্রারে তখন সকল পৃথক বৃত্তি ও ইন্দ্রিয় লয় পেয়ে মানুষ অনুভব করে অনাদি অনন্ত সত্য। যখন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তিনি ফিরে চলবেন উৎসের দিকে তখন মহাপ্রলয়, তখন সব কিছুর লয়।

বহির্বিশ্বের ক্ষেত্রে প্রকৃতি এখনও বহির্মুখী এর প্রমাণ হল বর্তমান বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা, **Big Bang Theory. Big Bang Theory** দেখিয়েছে যে, এখনও এই বিশ্বজগৎ কোন এক অজ্ঞাত কেন্দ্র থেকে বহির্মুখে প্রচণ্ড বেগে ধাবমান। মহাবিশ্বের এই বহির্মুখী শক্তি যখন কেন্দ্রাভিমুখে ফিরে চলবে তখনই হবে সবকিছুর শেষ, মহাপ্রলয়।

যোগীর দেহবিশ্বের স্বতন্ত্র চেতনা অর্থাৎ জীবাত্মা যখন মিশে যান কুণ্ডলিনীর বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে তখনই আসে পরমাত্মা বোধ। কারণ তখনই কুণ্ডলিনীর মধ্যে জাগ্রত হয় সেই ফিরে যাবার আবেগ। স্তরে স্তরে তাঁর ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সব স্তরের পার্থিববৃত্তিও নাশ হতে থাকে। অবশেষে পাওয়া যায় স্বরূপের সন্ধান। যাঁরা এই স্বরূপের সন্ধান পাবেন না, তাঁদের মুক্তি নেই। মহাবিশ্ব যদি শক্তির উৎসমুখী যাত্রাতে মহাপ্রলয়ে লয় হয়ে যায় তবুও মুক্তি নেই। যে জীবাত্মার মধ্যে রয়েছে কর্মবৃত্তির সংস্কার তাকে আবার নতুন সৃষ্টিতেও জন্মাতে হবে সেই বৃত্তির প্রভাবে। কেউ যদি জন্মমৃত্যুর বৃত্ত থেকে মুক্তি চান তবে তাঁকে স্বতন্ত্র দেহেই কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করে পেতে হবে অনাদির স্বাদ। তাকে নিজেকেই হতে হবে অনন্ত অনাদি। এ সম্ভব হলে তবেই সংস্কারের বশে আর তার পুনর্জন্ম হবে না। তবে শাস্ত্রে এধরনের ব্যাখ্যা থাকলেও এ তত্ত্বে বিশ্বাস করতে আমার যথেষ্ট দ্বিধা আছে। যদি শাস্ত্রের এ ধারণাই সত্য হয় তাহলে ধরে নিতে হয় যে, সংস্কার আগে, সৃষ্টি পরে। কিন্তু সেরকম কি করে ঘটতে পারে? সংস্কারই অনাদি অনন্ত, না অনাদি অনন্ত থেকে সৃষ্টি? তারপর সংস্কার? আমার মনে হয় সংকোচন ও বিকোচন সৃষ্টি-ক্ষেত্রে স্বাভাবিক একটা ঘটনা। বিকোচনের ফলে সৃষ্টি হয়। সংকোচনের ফলে প্রলয় হয়। অনাদি অনন্ত কাল ধরে কোন এক কেন্দ্র থেকে এই ঘটনাই ঘটে চলছে। অনাদি অনন্তের এটাই হল চরিত্র, স্বভাব। সে দ্বৈত এবং অদ্বৈত একই সঙ্গে। সংকোচন বিকোচন

ঘটছে মুহুর্মুহু। আপেক্ষিক তত্ত্বের ভিত্তিতে সময় বিচারে সেটা কারো কাছে কোটি কোটি বছরের মত মনে হলেও, কারো কাছে নিমেষের ঘটনা মাত্র। এত সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ঘটনাটা ঘটে যায় যে, সংকোচন বিকোচন বলে যে কোন ঘটনা ঘটছে, তা বোঝাই যায় না। দুই মিলে এখানে এক। সৃষ্টি-উৎসের এটাই একটা রহস্যময় খেলা। যিনি এক তিনই দুই। সেই দুইকে একের মধ্যে মিলিয়ে দিয়ে দর্শন করার কলাকৌশল শিখিয়েছে যোগশাস্ত্র।

আমার কথা থাক। তন্ত্রযোগের যে-কথা বলছিলাম শাস্ত্র অনুযায়ী সে-কথাই বলা যাক। শক্তি আরাধনার একটা সময়-পদ্ধতি আছে। যাকে বলে সময়াচার। পাঁচজন বিখ্যাত সাধক এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা করেছেন, যেমন সনক, সনন্দ, সনৎকুমার, বশিষ্ঠ ও শুক। সময়-আগমে তাঁদের এই আলোচনার কথা বলা আছে। এক একজন ঋষি বা সাধক যে আলোচনা করেছেন তাঁর নামেই পরিচিত হয়েছে সেই আলোচনা। তাঁদের আলোচনার সংক্ষিপ্তসার হল এই ধরনের, যেমন, শক্তির বিকাশই হল এই আলোচনার বিষয়—যে শক্তিকে বলে কুণ্ডলিনী। কুণ্ডলিনী যেখানে থাকেন তাঁর নাম মূলাধার। সফল বিকাশ সাধন করা গেলে অর্থাৎ এই শক্তিকে ক্রিয়াশীল করা গেলে আত্মার মুক্তিলাভ হয়। সাধারণ ভাবে কুণ্ডলিনী ঘুমিয়ে থাকেন মূলাধারে। সাধক বা যোগীর প্রথম কাজ হল সেই সর্পিণীকে জাগরিত করা। তাঁকে জাগরিত করা হয় দুই ভাবে: প্রথমত তপের দ্বারা। তপ মানে প্রাণায়াম। প্রাণায়াম মানে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ ও তাকে কুম্ভক করে ধরে রাখা। যোগ শাস্ত্রেও বলা আছে একই কথা। দ্বিতীয়তঃ জপের দ্বারা। এ ক্ষেত্রে সাধককে জপ করতে হয় বিশেষ বিশেষ কিছু মন্ত্র যে-মন্ত্রগুলিকে জপ করতে হয় নির্দিষ্ট সংখ্যায় ও নির্দিষ্ট সময়ে। দিনরাতের বিশেষ এক সময়ে করতে হয় এই জপ। জপের সময় মানস চক্ষে সবসময়ই ভাসিয়ে রাখতে হবে বীজমন্ত্রের

দেবরূপ। জপের এই মন্ত্রের মধ্যে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য হল পঞ্চদশী মন্ত্র।

কুণ্ডলিনী জেগে উঠলে প্রথম ওঠেন মূলাধার থেকে স্বাধিষ্ঠানে। স্বাধিষ্ঠান অর্থাৎ নিজের স্থান। তার পরই রীতিমত চেষ্টা করে তাঁকে ওঠাতে হয় মণিপুরে। মণিপুর হল আলোতে পূর্ণ। মণিপুরের পরে তিনি ওঠেন অনাহততে। এখানে শুধু শব্দ। তবে সে শব্দ সংঘর্ষ-জনিত শব্দ নয়। শক্তি এখানে রূপান্তরিতা হন শব্দরূপে। অনাহত চক্র থেকে শক্তি ওঠেন বিশুদ্ধচক্রে। এখানে আছে সুনির্মল পবিত্রতা। এ অঞ্চল গঠিত সাত্ত্বিক উপাদানে। এর পরেই আজ্ঞাচক্র। এখানে এলে প্রথম হয় যথার্থ জ্ঞান সম্পর্কে ক্ষীণ ধারণা। কুণ্ডলিনীকে এখানে ওঠাতে পারলেই যোগী তাঁকে দেখেন বিদ্যুৎচমকের মত।

মূলাধার থেকে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া হল কুণ্ডলিনীর অগ্রগতির প্রথম পর্যায়। যে সাধক কুণ্ডলিনীর জাগরণের জন্য যোগ-পন্থা অবলম্বন করেন তাঁকে অগ্রসর হতে হয় রীতিমত উপাসনার মধ্য দিয়ে। উপাসনা হল নির্দিষ্ট দেবতার ধ্যান ও পূজা। সেই সঙ্গে মন্ত্র-জপ। তবে এ-জন্য চাই গুরুর নির্দেশ, গুরুর পরিচালনা। মূলাধার থেকে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত যে ছয়টি চক্র তা যুক্ত একটি কাল্পনিক সরল রেখা দিয়ে। এ দিয়েই তৈরি করা হয়েছে একটি ষড়ভুজ—সংস্কৃতে যাকে বলে শ্রীচক্র।

শক্তির ঊর্ধ্বগতির সময় অনাহত চক্র বা অঞ্চলের গুরুত্বই সব চাইতে বেশী। এইজন্য আগম শাস্ত্রে এই অনাহত চক্রের উপরই আছে অনেকগুলি আলোচনা।

মানুষকে বলে পিণ্ডাণ্ড। মহাবিশ্বে যেমন আছে সৃষ্টির স্তর, এই পিণ্ডাণ্ডেও আছে তেমনই। এই ছয়টি চক্রই সেই স্তরের প্রতীক। প্রত্যেকটি স্তরের আছে এক একটি বিশেষ গুণ—এবং সেই সঙ্গে এক একজন নিয়ন্ত্রক দেবতা। চক্রে চক্রে সাধক যখন চেতনাকে উন্নীত করেন—তিনি যেন অতিক্রম করেন মহাবিশ্বের এক একটি স্তর। এই

স্তরগুলোকেই আমাদের শাস্ত্রে বলে লোক। এই স্তরগুলো ও তাদের নাম হল এইরকম :

সংখ্যা	চক্র	লোক	গুণ	নিয়ন্ত্রক দেবতা
১	মূলাধার	ভুবর্লোক	তমঃ	অগ্নি
২	স্বাধিষ্ঠান	স্বর্লোক	তমঃ	অগ্নি
৩	মণিপুর	মহর্লোক	রজঃ	সূর্য
৪	অনাহত	জনলোক	রজঃ	সূর্য
৫	বিশুদ্ধ	তপলোক	সত্ত্ব	চন্দ্র
৬	আজ্ঞা	সত্যলোক	সত্ত্ব	চন্দ্র

যে সাধক এই দেহচক্রের যে অঞ্চলে কুণ্ডলিনীকে জাগরিত করে দেহত্যাগ করেন—সেই স্তরের সব ফল ভোগ করে আবার তিনি পুনর্জন্ম লাভ করবেন। প্রশ্ন হতে পারে, দেহত্যাগ করে কিভাবে এক এক লোকে তিনি ফলভোগ করবেন? শাস্ত্র বলে সূক্ষ্ম দেহে এক একটি দেহ হল এক একটি কোষ। এই কোষগুলো পরমাত্মাকে আবৃত করে রাখে। হিন্দু শাস্ত্রের ধারণা, আত্মাকে আচ্ছন্ন করে আছে ছয়টি দেহ বা কোষ। এই স্থূল দেহের উপরে আছে সূক্ষ্ম কোষ, তার উপরে সূক্ষ্মতর কোষ। এইভাবে সূক্ষ্মতম পর্যায় পর্যন্ত আছে পাঁচটি কোষ। স্থূল দেহ মরে গেলে থাকে সূক্ষ্ম দেহ। সূক্ষ্ম দেহের ক্ষয় হলে থাকে সূক্ষ্মতর দেহ। এইভাবে ক্ষয় হতে হতে সূক্ষ্মতম পর্যায় ছাড়ালে তবেই প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্তি। সুতরাং সাধক দেহচক্রের যে পর্যায়ে কুণ্ডলিনীকে ওঠাতে পারেন তিনি সেই পর্যায়ে সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করে সেই লোকের ফলভোগ করেন।

স্থূলদেহ বাদে দেহের এই পঞ্চকোষের কথা বলেছে তৈত্তিরীয় উপনিষৎ। এই কোষগুলি হল (১) অন্নময় কোষ (২) প্রাণময় কোষ (৩) মনোময় কোষ (৪) বিজ্ঞানময় কোষ এবং (৫) আনন্দময় কোষ। অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোষের যে শরীর, তা হল সূক্ষ্ম শরীর

রহস্যময় শরীর। বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষের শরীর হল কারণশরীর। সমগ্র ব্যাপারটাকে দেখানো যেতে পারে এইভাবে এঁকে :
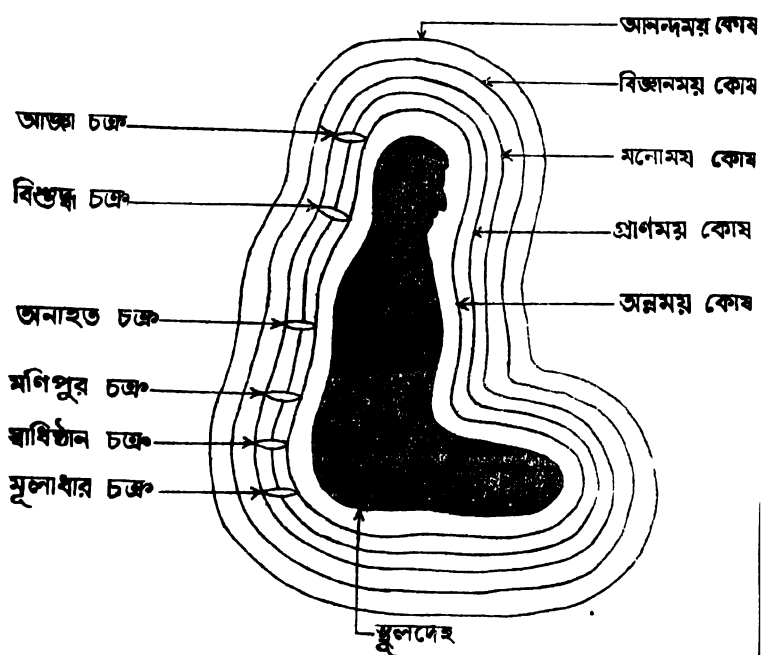
এবার যদি ষটচক্রস্তর, লোকস্তর, গুণস্তর ও দেবতাস্তরের ডায়াগ্রামটি নতুন করে আঁকি তাহলেই বোঝাতে পারব যে, সাধক কোন্ স্তরে কি ধরনের সূক্ষ্ম দেহে যোগসাধনার ফল ভোগ করেন। নিচের ডায়াগ্রামটি এবার হবে এইরকম :

সংখ্যা	চক্র	লোক	গুণ	নিয়ন্ত্রক দেবতা	যোগীদেহ	
১।	মূলাধার	ভুবর্লোক	তমঃ	অগ্নি	স্থুল	
২।	স্বাধিষ্ঠান	স্বর্লোক	তমঃ	অগ্নি	অন্নময় কোষ	সূক্ষ্ম শরীর বা রহস্যময় শরীর
৩।	মণিপুর	মহর্লোক	রজঃ	সূর্য	প্রাণময় কোষ	
৪।	অনাহত	জনলোক	রজঃ	সূর্য	মনোময় কোষ	
৫।	বিশুদ্ধ	তপলোক	সত্ত্ব	চন্দ্র	বিজ্ঞানময় কোষ	কারণ শরীর
৬।	আজ্ঞা	সত্যলোক	সত্ত্ব	চন্দ্র	আনন্দময় কোষ	

প্রশ্ন হতে পারে, উপনিষদের এই দেহকোষ ব্যাপারটি কি বৈজ্ঞানিক সত্য ? এ বিষয়ে সন্দেহ থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু সন্দেহের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, স্থূল দেহের উপর একটি সূক্ষ্ম দেহ আছে। তার ফটোও তোলা হয়েছে। এই সূক্ষ্ম দেহ হয়তো অন্নময় কোষ। যদি স্থূল দেহের উর্ধ্বে একটি ভিন্ন কোষের সন্ধান পাওয়া যায় তবে অন্য কোন কোষ যে নেই তা-ই বা বলি কি করে। সুতরাং যোগশাস্ত্র নতুন গুরুত্ব লাভ করেছে। তবে দেহবিদ্যা যারা চর্চা করেন, দেহ নিয়ে যারা নাড়াচড়া করেন, সেইসব বিজ্ঞানী ও ডাক্তারেরা দেহ তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোথাও নাকি পান নি যোগনাড়ির সন্ধান—যে নাড়ি-পথে কুণ্ডলিনী শক্তি মূলাধার থেকে সহস্রারের দিকে উঠে যান। সেইজন্য যোগশাস্ত্রের মূল্য নিরূপণে স্থূল বিজ্ঞানীদের মনে অনেক সন্দেহ। হাতেনাতে প্রমাণ না পেলে বিজ্ঞান বিশ্বাস করে না কোন কিছুতে। ফলে অনেকেরই মনে যোগশাস্ত্রের বর্ণনা অনুযায়ী অধ্যাত্ম সাধনা প্রসঙ্গে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। যদি সত্যি সত্যিই স্থূলদেহে যোগশাস্ত্র বর্ণিত নাড়িগুলি না থাকে, তাহলে সবটাই তো একটা বুজরুকি। সেইজন্য কিছু কিছু তন্ত্রশাস্ত্রের ধারণা—এ নাড়িগুলি স্থূল দেহের মধ্যে নেই। ষটচক্রের ছয়টি চক্রের সন্ধানও সেখানে মিলবে না। এ সবই আসলে রয়েছে সূক্ষ্ম দেহে। কুলকুণ্ডলিনীর উর্ধ্বগতি হয় সূক্ষ্ম দেহে, স্থূল দেহে নয়। এইজন্য বামকেশ্বর তন্ত্র বলেছে—ষটচক্র রয়েছে লিঙ্গ শরীরে, বা সূক্ষ্ম শরীরে। এখানে কুণ্ডলিনী চলাফেরা করেন সূক্ষ্ম স্নায়ু দিয়ে। সূক্ষ্ম স্নায়ুকেই বলে নাড়ি।

কুণ্ডলিনীও অসম্ভব একটা তৈরি করা গল্প কথা নয়। আমাদের দেহের মধ্যে রয়েছে যে শক্তি, আমাদের দৈনন্দিন কাজে ও চলাফেরায় তার মাত্র দশ ভাগ ব্যয় হয়। বাকি নব্বুই ভাগ থেকে যায় শরীরের মধ্যেই। এই শক্তিই হল কুণ্ডলিনী। যোগীরা এই শক্তিকেই জাগরিত করেন অধ্যাত্ম উন্নতির জন্য। শক্তি হল জ্যোতি, শক্তি হল আলো।

অগ্নি যত প্রবল, তার জ্যোতির্বৃত্ত তত বড়। তেমনি স্থূল দেহের যোগ সাধনা করে শক্তিকে যদি প্রজ্বলিত করা যায়, তবে সূক্ষ্মদেহের বৃত্তে তার জ্যোতি ছড়িয়ে পড়ে। স্থূলদেহে যোগ সাধনা যত প্রবল সূক্ষ্ম দেহে স্তরের ব্যাপ্তিও তত বড়। সুতরাং স্থূল দেহের প্রচেষ্টাতে সূক্ষ্ম দেহের কুণ্ডলিনী-শক্তি সূক্ষ্মচক্র ভেদ করে উর্ধ্বে উঠতে পারে।

কেউ কেউ মনে করেন যে, সৃষ্টিতে যেমন সূক্ষ্ম ব্যোম থেকে ক্ষিতি পর্যন্ত পঞ্চ ভূত। স্থূল দেহের উর্ধ্বের কোষগুলিও তেমনি। দেহের বিভিন্ন গ্রন্থির ক্রিয়া এই পঞ্চ ভূতের এক একটি ভূতকে প্রভাবিত করে। এই গ্রন্থিগুলিই হল আধার বা চক্র। সেই হিসেবে **Sexgland** হল মূলাধার, **Suprarenal gland** হল স্বাধিষ্ঠান, **Pancreas** হল মণিপুর, **Thymus** অনাহত, **Thyroid** বিশুদ্ধ এবং **Pituitary** সহস্রার। কেউ কেউ ষটচক্রের বা পদ্মের যোগনির্দিষ্ট দলগুলির সংখ্যাও বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তাদের দলগুলি থাকে মস্তিষ্কের স্নায়ুতে। দেহের বিভিন্ন গ্রন্থির বিশেষ ক্রিয়া মস্তিষ্কের সেই সব স্নায়ুতে বিশেষ রকম শিহরণ তৈরি করে। যেমন, তাঁদের মতে **Nuclei in Medulla** হল মূলাধারের চার পাপড়ি। **Nuclei in pons** হল স্বাধিষ্ঠানের ছয় পাপড়ি। **Nuclei at junction of pons and midbrain** হল মণিপুরের দশ পাপড়ি। **Nuclei in midbrain** হল অনাহতের বার পাপড়ি। **Nuclei in Subthalamic** হল বিশুদ্ধের ষোল পাপড়ি এবং **Nuclei in Thalamus** হল আজ্ঞাচক্রের দুই পাপড়ি।

সৃষ্টির যে পঞ্চভূত, তারো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন এঁরা। সৃষ্টিতে যেমন আছে ব্যোম, মরুৎ, তেজ, অপ, ক্ষিতি তেমনি বিজ্ঞানও এর ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছে বিশ্বাসযোগ্যভাবে। বিজ্ঞানের মতে একটি পরমাণুকে ভাগ করা যেতে পারে **Electrons**-এ। **Electron** অবস্থাতে পরমাণু আর বস্তু নয়, শক্তি। এই **Electron**-কেন্দ্রে আছে **Positively charged particle** যাকে বলে **Proton**,

Negatively charged particle Neutron-এর চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। Proton ও Neutron-এর সমন্বয়ে Electron গঠিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে হতে থাকে স্পন্দন (Vibration)। এই স্পন্দন একটি বিশেষ বৃত্ত পর্যন্ত শ্রুতিগ্রাহ্য। একেই বলে শব্দ। এই শব্দকেই বলে শব্দব্রহ্মণ—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা। শাস্ত্রে একেই বলে ব্যোমতত্ত্ব। শ্রুতিগ্রাহ্য বৃত্তের বাইরে স্পন্দন বা Vibration হল মরুৎ-তত্ত্ব যা স্পর্শযোগ্য। এর বাইরে স্পন্দন বা Vibration-এর পরিচয় হল তেজতত্ত্ব বা উত্তাপ। যখন সব জিনিস শীতল হয়ে আসে তখন দেখা দেয় অপতত্ত্ব, বা তরলতা। তারপর সব যখন ঘনীভূত বস্তু তখন দেখা দেয় ক্ষিতি তত্ত্ব। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এইভাবেই শক্তি থেকে তৈরি। মানবদেহও এইভাবে শক্তি পর্যায় থেকে স্থুল পর্যায়ে পর্যবসিত। শক্তি যা বস্তু দ্বারা সীমিত নয়, তা যদি স্থুল হতে পারে, তাহলে স্থূলই বা শক্তি পর্যায়ে যেতে পারবে না কেন। যদি সৃষ্টিতত্ত্বের এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সত্য হয়, তাহলে যোগশাস্ত্রের স্তর বিভাগও সত্য। সেইজন্য যোগশাস্ত্র যখন বলে যে, দেহ নিয়ন্ত্রণ করে দেহাতীতে যাওয়া যায়, সাধক দেহ নিয়ন্ত্রণের যে পর্যায়ে পৌঁছান, সূক্ষ্ম জগতে সেই ভাবেই তিনি তার ফল পান, তখন খুব একটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় না সে কথা। সুতরাং স্বর্গ বলে যে একটা কথা আছে সবটাই তার বোধহয় কল্পনা নয়। সূক্ষ্মতর থেকে সূক্ষ্মতম জগৎই নানা স্বর্গ, স্বর্গের স্তর। স্থূল ও সাধারণ সূক্ষ্ম জগৎই নরক। এইজন্যই যোগের মতে যে সাধক অনাহত চক্রে কুণ্ডলিনীকে উঠিয়ে জীবন শেষ করবেন পরজন্মে তিনি অনাহত চক্রের গুণ নিয়েই জন্মাবেন, এবং সেখান থেকেই জীবন শুরু করবেন। তাঁর সাধনাও শুরু হবে অনাহত চক্র থেকে।

তন্ত্রযোগের মতে, মূলাধার এবং স্বাধিষ্ঠান পর্যায়ে সাধক থাকেন তামসিক জগতে। অর্থাৎ নিজের অন্তর্লোকেই তিনি তামসিকতার ঊর্ধ্বে নন। এই তামসিক জগতের নিয়ন্ত্রক দেবতাই হলেন অগ্নি।

মণিপুর ও অনাহত অঞ্চলে সাধক থাকেন রাজসিক অধ্যায়ে অর্থাৎ তাঁর অন্তর্জগতে তখন রজগুণের প্রাধান্য। বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্রে উঠতে পারলে সাধক উপনীত হন সাত্বিক জগতে। অর্থাৎ তাঁর অন্তর্জগতে তখন সত্বগুণের প্রাধান্য। এ জগতের নিয়ন্ত্রক দেবতা হলেন চন্দ্র। তবে এ সত্বগুণ চৈতন্যকে সহস্রারে না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।

কুণ্ডলিনী হলেন চৈতন্যের স্থূলরূপ। চব্বিশটি তত্ত্ব নিয়ে রয়েছেন মূলাধারে। কুণ্ডলিনী জাগ্রত হওয়া মাত্রই ধারণ করেন কুমারী রূপ অনাহত চক্রে পৌঁছে হন রমণী। এখান থেকেই কুণ্ডলিনীর উর্ধ্বগতির সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সহস্রারে উঠলেই কুণ্ডলিনী হন পতিব্রতা।

দ্বিতীয় পর্যায়ে কুণ্ডলিনীর একটি মাত্র ধাপ। আজ্ঞাচক্র থেকে শক্তির গতি এবার সহস্রারে। সহস্রারের মধ্যেই রয়েছে শ্রীচক্র। সহস্রারের মধ্যে রয়েছে এমন এক উজ্জ্বল স্থান থাকে বলে চন্দ্রলোক-অর্থাৎ অমৃতসায়র। এখানেই একত্রে থাকেন সৎ এবং চিৎ—পঞ্চবিংশতিতম ও চতুর্বিংশতিতম তত্ত্ব। চিৎ অথবা শুদ্ধ বিদ্যাকে যদাখ্যও বলা হয় অর্থাৎ চন্দ্রের ষোলকলা। চতুর্বিংশতি ও পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব এখানে বাস করে চিরমিলনে। এই মিলনকেই বলা হয় ষড়বিংশতিতম তত্ত্ব। সৎ এবং চিতের এই মিলনকেন্দ্রই সাধকের লক্ষ্য। কুণ্ডলিনীকে উর্ধ্বগতি করা হয় এই মিলন কেন্দ্রে আনার জন্যই। এখানে কুণ্ডলিনী এলেই সাধকের পরমানন্দ লাভ হয়।

কুণ্ডলিনী কিন্তু সহস্রারে এলেও বেশিক্ষণ থাকেন না। ফিরে আসতে চান মূলাধারে। বার বার কুণ্ডলিনীকে তুলতে হয় সহস্রারে, যতক্ষণ না তিনি সেখানে স্থায়িভাবে থাকতে পারেন। এ অবস্থা হলেই সাধক হন জীবন্মুক্ত। হন নির্মল সত্তা। সাধক নিজের মধ্যে আর কোন কিছুরই অনুভব পান না। অনন্ত আনন্দের জগতে ডুবে থাকেন তিনি।

কুণ্ডলিনীর সহস্রারে স্থিতিই হল সাধকের চূড়ান্ত লক্ষ্য, সাধনার চূড়ান্ত পর্যায়। কিন্তু কৌল সাধকেরা মূলাধারে তাঁকে জাগরিত না করেই শক্তি সাধনা করেন। কুল হল পৃথ্বী, এইজন্য পৃথ্বীতে কুণ্ডলিনীকে রেখেই যাঁরা সাধনা করেন তাঁদের বলা হয় কৌল। তাঁদের সাধনার ধারাই বামাচার সাধনা নামে পরিচিত। ফলে তন্ত্রাচারের কিছু অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করলেও জন্মমৃত্যুর বৃত্তের বাইরে যেতে পারেন না তাঁরা। মিশ্র তান্ত্রিকেরা এ-ব্যাপারে কৌলদের উপরে। তাঁরা সূর্য, বায়ু এই সবের মধ্যে শক্তির পূজা করেন। নানা ধাতুর যন্ত্র নির্মাণ করে উপাসনা করেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ কুণ্ডলিনীকে জাগরিত করে আনতে পারেন অনাহত চক্র পর্যন্ত।

সময়চার তান্ত্রিকের পক্ষে বহির্বিশ্বে দেবীসাধনা নিষেধ। মানুষের দেহের মধ্যে যে-কোন চক্রে তাঁকে পূজা করতে হয়। তাঁরা দেবী ও শিবের ধ্যান করেন (১) অধিষ্ঠান সাম্য হিসেবে অর্থাৎ একই ক্ষেত্রে বসবাসকারী হিসেবে, (২) অবস্থান সাম্য হিসেবে অর্থাৎ একই অবস্থায় থাকা ভঙ্গীতে, (৩) অনুষ্ঠান সাম্য হিসেবে অর্থাৎ একই কর্মরত থাকা অবস্থাতে, (৪) একরূপ হিসেবে এবং (৫) একনাম হিসেবে।

প্রথমটিতে এদের স্থান হল (১) মূলাধার চক্র। দ্বিতীয়টিতে (২) উভয়েই নৃত্যরত। তৃতীয়টিতে (৩) উভয়েই তারা সৃষ্টিরত। চতুর্থ অবস্থাতে (৪) উভয়েই তারা রক্তবর্ণ এবং পঞ্চমত (৫) শিব হলেন ভৈরব ও শক্তি ভৈরবী।

উন্নত সাধক যাঁরা তাঁরা দেবীকে পুজো করেন সহস্রারে, অন্য কোন চক্রে নন। কিন্তু সহস্রারে পুজো হয় কেমন করে? বলা হয়েছে, সহস্রারে দেবীকে পুজো করতে হলে পুজো করতে হবে বৈন্দবে সমস্ত চিন্তাকে নিবদ্ধ করে, অর্থাৎ ষড়বিংশতিতম তত্ত্বের কেন্দ্রে মনোনিবেশ করে। সেখানেই শিব এবং শক্তি থাকেন মিলনে। পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্বেরও উপরে এর স্থান—সহস্রারের চন্দ্রমণ্ডলে! সাধককে চিন্তা করতে হবে এই মিলন সম্পর্কে এবং ভাবতে হবে যে, তিনিই সেই

মিলন। সুতরাং যাঁরা বাহ্যপূজা করেন, অর্থাৎ বাইরের জগতে শক্তিকে আরাধনা করেন তাঁরা সময়চার দলের তন্ত্রসাধক নন।

বৈন্দবে শিব শক্তির মিলন-আনন্দকে নিজের আনন্দ বলে অনুভব করার দুটো পথ আছে। এই দুটো পথের একটিতে আছে চারটি উপায় ও অন্যটিতে ছয়টি। গুরুর কাছ থেকে পেতে হয় এই পথের সন্ধান। যেমন সময়চারী শিক্ষার্থীকে অনুসরণ করতে হবে এই এইসব পদ্ধতি, যেমন, (১) গুরুর উপর থাকবে অবিচল আস্থা, (২) গুরুর কাছ থেকে লাভ করবে পঞ্চদশী মন্ত্র এবং এই মন্ত্র জপ করতে হবে তাঁরই নির্দেশে। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির জ্ঞানকে বুঝতে হবে। মন্ত্র উচ্চারণের ছন্দ রাখতে হবে নির্ভুল। বুঝতে হবে দেবতাকে অর্থাৎ শব্দে প্রকাশিত মন্ত্রের যথাযথ অর্থকে। (৩) শুক্লপক্ষের অষ্টম দিনে আশ্বযুজ মাসের মহানবমীতে মধ্যরাত্রে গুরুর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে হবে। তখন গুরু তাঁকে মন্ত্র দেবেন, জানাবেন ষটচক্রের চরিত্র। দেবেন পরমানন্দে একাত্মবোধ আনার জন্য ছয়টি পথের নির্দেশ। এইভাবে নিজেকে তৈরি করলে মহাদেব তাঁকে দেবেন অন্তরতমের জ্ঞান। শিব থেকেই ব্রহ্মজ্ঞান। শিবও এইজন্য অধ্যাত্ম গুরু—আদিনাথ। দেহ তৈরি হলে এবং সাধক প্রস্তুত হলে তবেই কুণ্ডলিনী জাগরিতা হন। কুণ্ডলিনী যখন মণিপুর চক্রে ওঠেন তখনই একাগ্রচিত্ত সাধক তাঁকে দেখতে পান। তারপর নিজের চেষ্টায় তাঁকে তোলেন ঊর্ধ্বতর চক্রে যথাযথ পূজা করতে হয় দেহের স্তরে স্তরে—তবেই নিজেকে আরও বেশী করে প্রকাশ করেন কুণ্ডলিনী। আজ্ঞাচক্র ভেদ হলে বিদ্যুৎ- গতিতে কুণ্ডলিনী ছুটে চলেন সহস্রারের দিকে। প্রবেশ করেন অমৃতসায়রে অবস্থিত কল্পবৃক্ষাবৃত মণিদ্বীপে। শক্তি তখন সদাশিবের সঙ্গে মিলে উপভোগ করেন অপার আনন্দ। শাস্ত্রযোগ অভ্যাসকারী যোগীকে এই মিলনের সময় থাকতে বলে অবগুণ্ঠনের বাইরে। কিন্তু কি করে সেটা সম্ভব কে জানে। কারণ কুণ্ডলিনীর ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে সঙ্গে জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পেতে থাকে একে একে। কুণ্ডলিনী যখন

সহস্রারে তখন জীবাত্মার কোন অস্তিত্ব নেই। সুতরাং কে অপেক্ষা করবে বাইরে? যা-হোক অপেক্ষা করতে হবে ততক্ষণই যতক্ষণ কুণ্ডলিনী আবার ফিরে না আসেন তাঁর নিজ স্থানে। এইভাবে কুণ্ডলিনীকে ওঠানামা করাতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সহস্রারে শাশ্বত মিলনে মিলে যায় শক্তি ও শিব। কুণ্ডলিনীর জাগরণের পদ্ধতিটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ব্যাপার। তবু কোন কোন গুরু শিষ্যকে জানিয়ে থাকেন এই তত্ত্ব।

সহস্রারে গিয়ে কুণ্ডলিনীর ফিরে আশার চিন্তাতেও নাকি আছে ব্রহ্মানন্দ বোধ। যে সাধক একবার কুণ্ডলিনীকে উঠিয়েছেন সহস্রারে মোক্ষ ছাড়া আর কিছুই কাম্য নেই তাঁর কাছে। যদি সময়চার তান্ত্রিকদের কোন. পার্থিব বাসনাও থাকে তবু অন্তর্বিশ্বেই করতে হবে তাঁর পূজা।

শ্রীবিদ্যার আছে সুভগোদয় এবং আরও নানাধরনের পদ্ধতি। এতে বলা হয়েছে সাধককে মনোনিবেশ করতে.হবে সূর্যমণ্ডলের দেবীর উপর। এই ভাবেই সাধককে ধ্যানের বিষয়ে মনোনিবেশ করতে হবে। সূর্যমণ্ডল বলতে বোঝায় পিণ্ডাণ্ড অর্থাৎ মানবদেহ। বহিপূ্র্জা সম্পর্কে সমস্ত মন্ত্রনির্দেশও মানবদেহের অভ্যন্তরের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

যোগের সর্বশেষ দুরূহ যোগ হল রাজযোগ। মন্ত্রযোগে, হঠযোগে এবং লয়যোগে সাধক ক্রমশঃ যোগ্যতা অর্জন করেন। যে যোগ্যতার ফলে সবিকল্প সমাধি লাভ করা সম্ভব। একমাত্র রাজযোগেই লাভ করা যায় নির্বিকল্প সমাধি। আগের যোগগুলিকে অধিগত না করে কেউ যদি রাজযোগে আসেন তাহলে আবার ফিরে আসতে হবে জন্মমৃত্যুর বৃত্তে এই পৃথিবীতেই। রাজযোগে সমাধি হলে পুনর্জন্ম আর নেই। কারণ রাজযোগে সমাধি হলে পার্থিব বস্তুর প্রতি কিছুমাত্র আকর্ষণ থাকবে না। কারণ এখানে শিবশক্তির মিলন হলে আর কোন প্রত্যাবর্তন নেই। মন্ত্রযোগে, হঠযোগে এবং লয়যোগে তৈরি করতে হয়

রাজযোগের পথ। মন্ত্রযোগে যে সমাধি তাকে বলে মহাভাব। এতে দেহ স্থির হয়, বাক্য হারিয়ে যায়। দেহ হয়ে পড়ে মৃতবৎ। লয়-যোগের সমাধিতে যোগীর কোন বাহ্যচেতনা থাকবে না। তিনি যেন নিমজ্জিত হন আনন্দ-সমুদ্রে। রাজযোগের সমাধি হল পূর্ণ সমাধি। এতে আসে চিৎ-স্বরূপ ভাব। আসে চূড়ান্ত মোক্ষ।

বৈরাগ্য বা নির্লিপ্তি আছে চার ধরনের। চারটি যোগের সঙ্গে তারা যুক্ত। যেমন (১) মন্ত্রযোগে হয় মৃদু বৈরাগ্য। (২+৩) হঠযোগ ও লয়যোগে হয় মধ্যমা বা অধিমাত্র বৈরাগ্য অর্থাৎ মধ্যস্তরের ও উচ্চস্তরের বৈরাগ্য। কিন্তু (৪) লয়যোগে পরাবৈরাগ্য অর্থাৎ নির্বিকল্প সমাধি।

সমস্ত যোগই মানসিক অভ্যাসের সঙ্গে যুক্ত। রাজযোগে এই অভ্যাসের সঙ্গে সম্পর্ক সবচাইতে বেশী। এই যোগেই সৎ অসতের বিচার হয়। হয় শাশ্বত এবং অনিত্যের বিচার। এতে সাহায্য নেওয়া হয় উপনিষৎ ও অন্যান্য দর্শনের। তবে পশ্চিমী দার্শনিকতায় এর বিচার হয় না। এ বিচার হয় বৈরাগ্য লাভ করা মানসিকতার দ্বারা। বৈরাগ্য লাভের ফলে যে জ্ঞান হয় সেই জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তির মধ্যেই বুদ্ধি বা বিচার শক্তি দেখতে পাবে তার পূর্ণবিকাশ। রাজযোগের দ্বারাই এই ধরনের জ্ঞান লাভ সম্ভব।

রাজযোগে আছে ষোলটি ভাগ। সাতটি জ্ঞানের স্তরে আছে সাতধরনের বিচার। একে বলে জ্ঞানদা, সন্ন্যাসদা, যোগদা ও লীলোন্মুক্তি, সৎপদা, আনন্দপদা এবং পরাৎপরা।

জ্ঞানের যেমন আছে সাতটি স্তর, তেমনি আছে কর্মেরও, যেমন, (১) বিবিদিষা অথবা শুভেচ্ছা (২) বিচারণা (৩) তনুমানসা (৪) সত্ত্বাপত্তি (৫) অসমশক্তি (৬) পদার্থাভিনী ও (৭) তুর্যগা।

উপাসনারও আছে এই ভাবে সাতটি স্তর, যেমন, (১) নামপর (২) রূপপর (৩) বিভূতিপর (৪) শক্তিপর (৫) গুণপর (৬) ভাবপর ও (৭) স্বরূপপর।

জ্ঞানদা, সন্ন্যাসদা, যোগদা, লীলোন্মুক্তি, সৎপদা, আনন্দপদা ও পরাৎপরা এই সাতটি জ্ঞান ও বিচারপদ্ধতি অনুসরণ করে রাজযোগী লাভ করেন দুই ধরনের ধারণা (১) প্রকৃত্যাশ্রয় ও (২) ব্রহ্মাশ্রয়। অর্থাৎ প্রকৃতি আশ্রয় করে ধারণা ও ব্রহ্ম আশ্রয় করে ধারণা।

তিন ধরনের ধ্যান আছে যাতে জন্মে আত্মপ্রত্যক্ষের ধারণা। সমাধি আছে চার ধরনের। ব্রহ্মাণের আছে তিনটি অবস্থা যেমন (১) বিরাটপুরুষ। অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে স্থূলরূপে প্রকাশিত সব কিছু। (২) সূক্ষ্মরূপে ঈশ্বর অবস্থা, যাতে তিনি সৃষ্টি করেন এই বিরাট বিশ্ব। রক্ষা করেন, লয় করেন। এবং (৩) সচ্চিদানন্দ অবস্থা যাতে তিনি সব কিছুরই উৎস।

রাজযোগে ব্রহ্মাণের এই তিন অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের ধ্যানের পদ্ধতি আছে। চার ধরনের যে সমাধি, তা এসব অনুসরণ করলেই পাওয়া যায়। এর মধ্যে প্রথম দুটি হল সবিচার অর্থাৎ যে অবস্থায় পার্থিব বিচারবুদ্ধি থাকে কিছুটা। কিন্তু শেষের দুটি হল নির্বিচার সমাধি, যাতে পার্থিব বিচারবুদ্ধির সামান্য কিছুও অবশিষ্ট থাকে না। নির্বিচার সমাধি লাভ করে রাজযোগী পান জীবন্মুক্তি অর্থাৎ পার্থিব প্রাণময় দেহে বাস করেও তিনি অর্জন করেন মোক্ষ। তিনি তখন হন সকল আকর্ষণের অতীত। কর্ম থেকে তিনি তখন মুক্ত অর্থাৎ কর্মাশ্রয়চ্যুত। একমাত্র রাজযোগেই লাভ হতে পারে এই ধরনের মুক্তি।

তৃতীয় অধ্যায়

তন্ত্রে দেখা যাচ্ছে যোগের বিস্তৃত আলোচনা, যোগের নানা কলাকৌশল। কখনও এসব বিশ্বাস হয়, কখনও হয় না। কখনও বা বিজ্ঞানের ধরা ছোঁয়ার মধ্যে একে আনা যায় কখনও যায় না। সুতরাং যোগের এসব কলাকৌশল বুঝতে হলে তার তাত্ত্বিক পটভূমিও একটু জানা দরকার। জানা দরকার ইতিহাস। বোঝা দরকার তন্ত্রযোগ বিচ্ছিন্ন কোন পদ্ধতি কিনা যোগ-সাধনার।

তন্ত্রে দেখি দেহের মধ্যে ষটচক্রের গুরুত্ব খুব বেশি। তবে এই ষটচক্রের উল্লেখ যে শুধু তন্ত্রশাস্ত্রেই আছে, তা নয়, অন্য শাস্ত্রেও দেখা যায়। তবে সেখানে এর উল্লেখ বড় অস্পষ্ট। আলোচনা সংক্ষিপ্ত। সুতরাং এ থেকে বলা সম্ভব নয় যে, ভিন্নশাস্ত্রে উল্লেখিত চক্রগুলিও তন্ত্রশাস্ত্রের ষটচক্রের মতই। এগুলি সম্ভবতঃ এক ধরনের পূজার ধারা। এমন একটা ব্যাপার হল ভূতশুদ্ধি। কিন্তু ভূতশুদ্ধি সাধারণ যোগের ব্যাপার নয়। সিদ্ধ সাধক ছাড়া ভূতশুদ্ধির মাধ্যমে চেতনাকে ব্রহ্মরন্ধ্রে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। ভূতশুদ্ধি হল সম্পূর্ণ একটা মানসিক ক্রিয়ার পদ্ধতি। এজন্য একে যোগ না বলে উপাসনা বলাই ভাল। এই পদ্ধতির মাধ্যমে সাধক দেহের নানা স্থানে ইষ্টদেবতার পূজা করেন। তবে তন্ত্রশাস্ত্র ছাড়া আরও অন্যান্য শাস্ত্রেও যোগপদ্ধতির স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

উপনিষদে জীবের ক্ষেত্রে আছে চারটি অবস্থার উল্লেখ, যেমন, (১) জাগ্রত (২) সস্বপ্ন নিদ্রা (৩) স্বপ্নহীন নিদ্রা ও (৪) তুরীয় অবস্থা। তন্ত্রশাস্ত্র ছাড়া দেহের বিভিন্ন শাস্ত্রেও আছে বাহাত্তর হাজার যোগনাড়ির উল্লেখ। ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে প্রাণ নির্গমনের কথাও আছে। সুষুম্না নাড়ির মধ্য দিয়ে যে চেতনা প্রবাহিত হয় উর্ধ্ব দিকে, তারও উল্লেখ আছে। হংস-উপনিষদে বলা হয়েছে ব্রহ্মজ্ঞান দেওয়া যেতে

শুধুমাত্র শান্তমন, আত্মনিয়ন্ত্রণকারী ও গুরুভক্তকে। এই তিনজনের অধিকারীকে বলা হয় শান্ত, দান্ত ও ভক্ত ব্রহ্মচারী। ভাষ্যকার নারায়ণ বলেছেন যেন, শাঁরদাতিলক তন্ত্র গ্রন্থের ভিত্তি হল শ্রুতি—নারায়ণেন শ্রুতিমাত্রোপজীবিনা। উপনিষেদও উল্লেখ আছে নাম ধরে ধরে ছয়টি চক্রের। মূলাধার থেকে বায়ুকে কি ভাবে ঊর্ধ্বে ওঠানো যাবে সে সম্পর্কেও নির্দেশ আছে। হংস সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, হংস থাকে অনাহত চক্রের নিচে অষ্টদলপদ্মে। ইষ্টদেবতাকে পুজা করতে হয় এখানেই।

অষ্টদলের সঙ্গে যুক্ত আছে এক একটি বৃত্তি, যেমন (১) পূর্বদলের সঙ্গে যুক্ত পুণ্যমতিঃ, অর্থাৎ পুণ্যবৃত্তি, (২) দক্ষিণপূর্বদলের সঙ্গে যুক্ত নিদ্রা এবং আলস্য। (৩) দক্ষিণ দলের সঙ্গে যুক্ত ক্রূরমতি অর্থাৎ দুষ্টবুদ্ধি ও নিষ্ঠুরতা। (৪) দক্ষিণ-পশ্চিম দলের সঙ্গে যুক্ত পাপে-মনীষা অর্থাৎ পাপমতি (৫) পশ্চিম দলের সঙ্গে যুক্ত ক্রীড়া অর্থাৎ নানা নীচুবৃত্তি। (৬) উত্তর-পশ্চিম দলের সঙ্গে যুক্ত গমনোদৌবুদ্ধি অর্থাৎ গমনের ইচ্ছা বা ক্রিয়ার ইচ্ছা। (৭) উত্তর দলের সঙ্গে যুক্ত রতি এবং প্রীতি অর্থাৎ নানা ধরনের তৃপ্তিকর আকর্ষণ। এবং (৮) উত্তর-পূর্ব দলের সঙ্গে যুক্ত নানা ধরনের দ্রব্য গ্রহণ। এই অষ্টদল পদ্মের কেন্দ্রে বাস করে বৈরাগ্য। এর সূক্ষ্মতম তন্তুতে আছে জাগ্রতাবস্থা। ফলত্বকে আছে স্বপ্নাবস্থা এবং বৃন্তে আছে সুষুপ্তি। পদ্মের উপরে আছে নিরালম্ব প্রদেশ। এ-ছাড়া আছে দশ ধরনের নাদ, যেমন, স্বেদনির্গমন, কম্পন ইত্যাদি। দশম নাদ অভ্যাসে ব্রহ্মপদ লাভ হয়।

ব্রহ্ম উপনিষদে বলা হয়েছে (১) নাড়ি (২) হৃদয় (৩) কণ্ঠ ও (৪) মূর্ধা হল ব্রহ্মণের চারটি স্থান। এই চারটি স্থানে ব্রহ্মণ আলোকিত হয়ে আছেন। হয়তো এই স্থানগুলি চক্রেরই মত কোন কেন্দ্র। ভাষ্যকার নারায়ণের মতে 'মন' হল দশম স্তর। অন্যান্য স্তর হল চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ইত্যাদি।

ধ্যানবিন্দু উপনিষদে আছে, যোগীরা অনাহত শব্দ শুনতে পান (অর্থাৎ হৃদয়ের শব্দ? অনাহত চক্রের শব্দ?)। উপনিষদে বলা হয়েছে

যে, পূরক ধ্যান করতে হবে নাভিতে মহাবীরের অর্থাৎ যাঁর আছে চতুর্ভুজ ও পাটফুলের রঙ। অর্থাৎ বিষ্ণুর ধ্যান করতে হবে। কুম্ভক করে ধ্যান করতে হবে হৃদয়ে রক্তবর্ণ ব্রহ্মার—যিনি বসে আছেন পদ্মের উপর। রেচক করে কপালে চিন্তা করতে হবে ত্রিনয়ন রুদ্রের।

নিম্নতম পদ্মের আছে আটটি দল। এর পরই দ্বিতীয় পদ্ম, যার মাথা নিচের দিকে। তৃতীয় পদ্ম হল সর্বদেবময়। দেখতে অনেকটা কদলীপুষ্পের মত, অর্থাৎ কলার মোচার মত? একশত পদ্মের উপর যে-সব পদ্ম তার প্রত্যেকটিরই আছে একশটি করে দল। এর উপরও আছে ধ্যানের নির্দেশ। এর পর আছে সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি-ধ্যানের কথা। আত্মাই জাগরিত করে পদ্মকে এবং পদ্ম থেকে বীজ নিয়ে যায় চন্দ্র, অগ্নি ও সূর্যে। কে জানে এই পদ্মগুলি তন্ত্রের চক্রের মত কিনা।

অমৃতনাদ উপনিষদে আছে পঞ্চ উপাদানের কথা (পঞ্চভূতের ?)। তার উপরে আছে অর্ধমাত্রা অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রের উল্লেখ। তন্ত্রে বিভিন্ন চক্রে যে উপাদান আছে এই পঞ্চ উপাদান হল সেই উপাদান বা চক্রের শামিল। প্রাণের গতিবিধি যোগীরা দেখতে পান বলে উল্লেখ আছে। অর্থাৎ মূলাধারে যে-ভাবে প্রাণ প্রবেশ করে ও বের হয় তা দেখতে পান। এতে হঠযোগের কিছু পদ্ধতিরও উল্লেখ আছে।

ক্ষুরিকা উপনিষদে আছে বাহাত্তর হাজার নাড়ি এবং ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার কথা। সুষুম্না বাদে অন্যসব নাড়িকে ধ্যানযোগে সাধনা করা যায়। এতে সূক্ষ্ম নাড়ি দিয়ে প্রাণবায়ু প্রবাহিত করার নির্দেশও পাওয়া যায়। পূরক, কুম্ভক, রেচক ও অন্যান্য হঠযোগ পদ্ধতিরও বর্ণনা আছে। তন্ত্রমতে মূলাধারকে উত্তপ্ত করে ব্রহ্মনাড়ি দিয়ে চৈতন্যকে উর্ধ্বে ওঠাবার মত যেন অনেকটা।

নৃসিংহ-পূর্বতাপনীয় উপনিষদে আছে সুদর্শন চক্রের কথা, যে সুদর্শন ষট, অষ্টম, দ্বাদশ, ষোড়শ ও দ্বাত্রিংশতিদল পদ্মে একের পর এক রূপান্তরিত হয়। তন্ত্রের চক্র ও দলের সঙ্গে এর অনেক মিল। মূল সুদর্শন চক্র যেন তন্ত্রের মূলাধার চক্র। তন্ত্রচক্রের সঙ্গে এর সবটা যে

মিল আছে তা নয়। এই পার্থক্যের কারণ, সুদর্শনচক্রে দল তৈরি হয়েছে মন্ত্রহিসেবে। যেমন, ষটদল পদ্মে আছে সুদর্শনের ছয় অক্ষর মন্ত্র, অষ্টদল পদ্মে আছে নারায়ণের আট অক্ষর মন্ত্র। দ্বাদশদল পদ্মে আছে বাসুদেবের দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র। ষোড়শদল পদ্ম হল ষোড়শ কলার (এখানে স্বরবর্ণ) অনুস্বার দিয়ে উচ্চারণ। দ্বাত্রিংশৎদলপদ্ম হল প্রকৃতপক্ষে দ্বিদলপদ্ম আজ্ঞাচক্র। কারণ এখানে আছে এক এক দলে দুটো করে ষোল অক্ষরের মন্ত্র, যেমন, নৃসিংহ এবং তাঁর শক্তির মন্ত্র।

মৈত্রী উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে নাড়ি সম্পর্কে উল্লেখ। বিশেষ করে সুষুম্না নাড়ি সম্পর্কে। চেতনার বিভিন্ন স্তরভেদের কথাও আছে এখানে। আছে নানা মণ্ডলভেদের কথা, যেমন, সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি ইত্যাদি।

যোগতত্ত্ব উপনিষদ ও যোগশিক্ষা উপনিষদে আছে হঠযোগের কথা। অন্তর্দুয়ার বন্ধ করার কথা এবং সুষুম্না-দুয়ার খোলার কথাও রয়েছে এখানে। অর্থাৎ আছে ব্রহ্মদ্বার খোলার কথা। রামতাপনীয় উপনিষদে আছে নানা ধরনের যোগ ও তন্ত্রপদ্ধতির উল্লেখ, যেমন, দ্বারপূজা, পীঠপূজা, ভূতশুদ্ধি ইত্যাদি। কুণ্ডলিনীর সাহায্যে আছে বিভিন্নচক্রের ভূতশুদ্ধির কথাও।

অথর্ববেদের শাণ্ডিল্য উপনিষৎ, কৃষ্ণযজুর্বেদের বরাহ এবং যোগ কুণ্ডলিনী উপনিষৎ, এবং ঋগ্বেদের নাদবিন্দু উপনিষদেও যোগ সাধনার নানা উল্লেখ পাওয়া যায়।

দেবীভাগবতে আছে ষটচক্র বা পদ্মের পূর্ণ বিবরণ। মূলাধারে কুণ্ডলিনী বা পরদেবতাকে জাগাবার কথাও আছে এখানে। হংসমন্ত্র, ভূতশুদ্ধি, স্থূলতত্ত্বকে সূক্ষ্মতত্ত্বে মিলিয়ে দেওয়া, প্রকৃতির মহত্তত্ত্বে মিশে যাওয়া, আত্মার মধ্যে মায়াকে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া এবং এই ভাবে জীবাত্মাকে পরমাত্মার মধ্যে একাত্ম করার কথাও আছে এখানে। এছাড়া আছে ধরামণ্ডলের বর্ণনা ও পৃথ্বী এবং অন্যান্য তত্ত্বের বীজের উল্লেখ। মহানির্বাণ তন্ত্র ও অন্যান্য তন্ত্রে যেমন আছে পাপপুরুষকে নিঃশেষিত করার কথা এখানেও আছে তেমনি।

লিঙ্গপুরাণেও আছে নানা দলের নানা পদ্মের কথা। এতে বলা হয়েছে, শিব হলেন নির্গুণ, কিন্তু মানুষের কল্যাণে তিনি উমার সঙ্গে বাস করেন মানবদেহে। যোগীরা নানা পদ্মে তাঁর ধ্যান করেন।

অগ্নিপুরাণ জাদু, মন্ত্র, তন্ত্রের নানা রীতিনীতি এইসব কিছুতেই পূর্ণ। ভূতশুদ্ধির কথাও আছে এখানে। এই পুরাণ বলেছে—নাভি থেকে ক্রমান্বয়ে বীজমন্ত্র ধ্যান করে শেষপর্যন্ত ঊর্ধ্বতম স্থানে এসে সাধক স্নান করতে পারেন অমৃতসায়রে।

শঙ্করাচার্যের মঠে আছে তান্ত্রিক যন্ত্র শ্রীচক্র। তিনি তাঁর ভাগবদ্‌গীতা ভাষ্যে বলেছেন—প্রথম হৃদপদ্মকে (অনাহত চক্র) আনতে হয় নিয়ন্ত্রণে। তারপর ভূমি জয় করে অর্থাৎ অন্যান্য নিম্নচক্র জয় করে সুষুম্না দিয়ে প্রাণকে আনতে হয় ভ্রূ-মধ্যে (আজ্ঞাচক্রে)। তারপর যোগীরা যান উজ্জ্বল পুরুষের কাছে। ভূমিজয় বলতে শঙ্করাচার্য বুঝিয়েছেন পঞ্চভূত জয়। শঙ্করাচার্য যোগশাস্ত্র শিখে নিজস্ব অভিজ্ঞতা নিয়ে একশত শ্লোকে পুস্তক লিখেছিলেন মন্ত্রশাস্ত্রের উপর। এই শ্লোক থেকে একচল্লিশটি শ্লোক নিয়ে রচিত হয়েছে আনন্দলহরী। এবং বাকী ৫৯টি নিয়ে রচিত হয়েছে সৌন্দর্যলহরী। শেষটিতে দেবীর বর্ণনা করা হয়েছে আপাদমস্তক সুন্দরী হিসেবে। আনন্দলহরীতে রয়েছে শঙ্করাচার্যের মূলতত্ত্ব। শঙ্করাচার্যের বর্ণনা এখানে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা। কারো মতে শিব স্বয়ং নাকি লিখেছিলেন আনন্দলহরী। শঙ্করাচার্য হলেন এর মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ও বিশ্বে তার প্রচারক। আনন্দলহরীর শ্লোক সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। কারো মতে ৩৫, কারো মতে ৩৩। আসলে আনন্দলহরী হল গৌড়পাদের সুভগোদয়ের পরিবর্ধিত রূপ।

হিসেব নিতে গেলে যোগশাস্ত্রের হাজার রকম বর্ণনা আছে হাজার গ্রন্থে। কিন্তু এ সবের মূল্য কি ? অভিজ্ঞতা না থাকলে এ শুধু বইয়ের পাতায় লিপিমাত্র। অভিজ্ঞতা যাঁর সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে অন্ততঃ এর তত্ত্ব জানা প্রয়োজন। জানা দরকার বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ করে এর যথার্থতা।

তবু বিশ্লেষণে দেখা যায় এই যে, শক্তি, যাকে ইংরেজীতে বলা যায় এনার্জি, তা থাকে দুই ভাবে দেহের দুই প্রান্তে। এই দুই মেরু প্রান্তের এক প্রান্তে শক্তি রয়েছে স্থির হয়ে, আর এক প্রান্তে প্রাণ হিসেবে, অর্থাৎ গতিময় অবস্থাতে। দেহের সমস্ত প্রাণ-চাঞ্চল্যের আড়ালে রয়েছে এক স্থির পটভূমি। এই স্থির কেন্দ্র হল সর্পশক্তি, যা রয়েছে মূলাধারে। এই শক্তিই হল দেহের স্থির ভিত্তিভূমি। প্রাণশক্তিরও এটাই হল ভিত্তি। শক্তির এই কেন্দ্র হল চৈতন্যের স্থূল আকার। স্বরূপে এই শক্তি হল পরম চৈতন্য। প্রকাশে এ হল শক্তি। মূলতঃ এক হলেও এরই মধ্যে রয়েছে পার্থক্য। চৈতন্য যখন শক্তির আকারে প্রকাশিত তখন এর মধ্যে থাকে দুটো দিক, একটি প্রচ্ছন্ন আর একটি প্রকাশিত। এই প্রচ্ছন্ন শক্তিকে বিজ্ঞানে বলে **potential energy** এবং প্রকাশিত শক্তিকে **kinetic energy.**

অদ্বৈত বেদান্তের মতে একের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ হওয়া অসম্ভব। সিদ্ধ সাধকের চোখে একের এই বহু হওয়া বস্তুতপক্ষে একটা আরোপণ, শাস্ত্রে যাকে বলে মূলের অধ্যাস। নিম্নজগতে যে শক্তি আত্মপ্রকাশ করেছে, যে শক্তি ক্রিয়াশীল, সিদ্ধ সাধকের চোখে তা মিথ্যে নয়, সত্য। শাক্ততন্ত্র বাস্তবিকভাবে বৈদান্তিক সত্যকেই প্রমাণ করে। শাক্ত মতে সৃষ্টিপদ্ধতি হল পরম চৈতন্যের মেরুপ্রান্তিকতা অর্থাৎ কোন এক শেষ প্রান্তে এসে স্থির হওয়া। পরাচৈতন্যের এই মেরুপ্রান্তিকতাকে নাশ করা হয় যোগের সাহায্যে। মানুষের দেহের মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন শক্তি থাকে (**potential energy**) যোগে তাকেই করা হয় ক্রিয়াশীল। তখন গতিময় শক্তি এগিয়ে চলে উর্ধ্বদিকে পরা-চৈতন্যের সঙ্গে মেলার জন্য। এই পরম চৈতন্য থাকে সহস্রারে।

কেউ কেউ বলেছেন, কুণ্ডলী শক্তি হল আদ্যাশক্তি। আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গেও এর সম্পর্ক রয়েছে। স্থূল আকারে মহাজাগতিক শক্তিকে দেখা যেতে পারে স্থির (**static**) এবং গতিময় (**dynamic**) উভয় অবস্থাতেই। স্থূল হল সাম্যাবস্থা; গতি হল তুলনামূলক

গতিময়তা অর্থাৎ যথার্থ অবস্থার আপেক্ষিক পরিবর্তন। স্থূল বস্তু বাহ্যতঃ স্থির। বাহ্যতঃ বলা হয়েছে এই কারণে যে, একমাত্র পরম চৈতন্য ছাড়া আর কোন কিছুই স্থায়িভাবে স্থির নয়। এমন যে জড় পদার্থ তার মধ্যেও আছে অতি সূক্ষ্ম স্পন্দন। জড়বস্তুর মধ্যে এই যে আপেক্ষিক স্থিরতা তাকেই বলা হয় শক্তির সাম্যাবস্থা। অর্থাৎ স্থূল বস্তুর মধ্যে রয়েছে যে-সব উপাদান তা একে ধরে রেখেছে অপরকে।

জীবদেহের কোষে কোষে রয়েছে ক্রিয়াশীল শক্তি। এই শক্তি নিজেকে দুইভাবে বিভক্ত করেছে, যার একটি হল (১) দেহকোষ সঞ্জীবক (**anabolic**) এবং আর একটি হল (২) দেহকোষনাশক (**katabolic**)। অর্থাৎ একটি দেহকোষে রাসায়নিক পরিবর্তন এনে কোষকে সজীব করে, আর একটি সেই রাসায়নিক পরিবর্তন বন্ধ করে দেহকে প্রাণহীন করে। একটির গতি পরিবর্তনের দিকে, আর একটির গতি স্থিতির দিকে। দেহকোষের কাজ চলেছে এই সংবর্ধন ও সংরক্ষণের মধ্য দিয়েই।

মনের চিন্তাতেও এই মেরুপ্রান্তিকতা লক্ষণীয়। পরম চৈতন্যের মধ্যেও চলেছে এই সংবর্ধন ও সংরক্ষণের খেলা। শক্তির প্রভাবে সর্বত্রই চলছে এই গতি এবং স্থিতির লীলা; পরা চৈতন্য ছড়িয়ে পড়েছে বিচিত্র বৈচিত্র্যে। আদ্যাশক্তির মধ্যেও চলেছে সেই একই খেলা—সংবর্ধন ও সংরক্ষণ।

বর্তমান পরমাণুবিজ্ঞানও প্রমাণ করছে একই জিনিস। শক্তির চাপে পরমাণু আর পরমাণু থাকছে না, অর্থাৎ বস্তু থাকছে না। একটা নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘুরছে ইলেকট্রন ও প্রোটন। পরমাণু হল ক্ষুদ্র রশ্মি, যার মধ্যে সৌরজগতের অনুরূপ খেলা চলছে। পরমাণু কেন্দ্রে রয়েছে একটি যথার্থ (**positive**) তড়িৎ শক্তির ক্রিয়া (**change**) যাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে নঞর্থক ক্রিয়া (**negative change**) ইলেকট্রন। এই যথার্থ বা হাঁ-বাচক ক্রিয়াশক্তি ও না-বাচক ক্রিয়াশক্তি একে অপরকে বাধা দিচ্ছে। ফলে পরমাণু থাকছে

সাম্যাবস্থাতে। এই কারণেই ভেঙে পড়ছে না পরমাণু। কিন্তু এই সাম্য যদি নষ্ট হয় তাহলেই দেখা দেয় প্রচণ্ড শক্তি। প্রচণ্ড শক্তি পেলে তবেই পরমাণুর উপাদানগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবে একেবারে যে কেন্দ্রচ্যুত হয় তা নয়। কারণ তারা ঘুরতে থাকে সেই হ্যাঁ-বাচক শক্তিকে (positive change) কেন্দ্র করেই। যে প্রচণ্ড শক্তিতে এই পরমাণু উপাদানের বিচ্যুতি, অসাম্য অবস্থা, তাই বোধহয় ইচ্ছাশক্তি। শক্তি যেমন কেন্দ্রচ্যুত ক'রে পরমাণুর উপাদানগুলিকে ঘুরাতে থাকে নির্দিষ্ট বৃত্তে, তেমনই পরম কোন কেন্দ্রে ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে মহাবিশ্বে দেখা দিয়েছে সৃষ্টির বৈচিত্র্য। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে এখনও একটা সংবর্ধনের অবস্থায় আধুনিক বিজ্ঞানের Big Bang Theory তা প্রমাণ করে। একথা আজ স্পষ্ট প্রমাণিত যে, কোন এক অজ্ঞাত কেন্দ্র থেকে সারা মহাবিশ্বজগৎ দ্রুতবেগে প্রতি সেকণ্ডে হাজার হাজার মাইল দূরে ছুটে চলছে।

মহাবিশ্বজগতে শক্তি যখন মেরুপ্রান্তিক অবস্থাতে নিজেকে ভাগ করেন স্থির (static) ও গতিময় (dynamic) অবস্থাতে, তখন বুঝতে হবে যে তার গতিময়তা একক নয়, তাতে আছে একটা স্থির কেন্দ্র। সমস্ত গতিময়তা এই গতি এবং স্থিতিকে কেন্দ্র করেই। শক্তির হ্যাঁ-বাচক (positive) কেন্দ্রটি হচ্ছে চুম্বকের মত। শক্তি যেমন গতিময় তেমনই স্থির। শক্তির এই স্থির মেরুপ্রান্তিক অবস্থাই হল কুণ্ডলিনী শক্তি।

৺কালী হলেন শক্তি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তান্ত্রিক ও পৌরাণিক ৺কালীরও একটা অর্থ আছে। এই মূর্তিটি হল একাধারে সত্য ও প্রতীকী মূর্তি। মা ৺কালী হলেন মহাজাগতিক সত্যের প্রতীক। সদাশিব, যাঁর বুকে তিনি কৃষ্ণাঙ্গিনীরূপে নগ্ন অবস্থায় নৃত্যপরা সেই সদাশিব হলেন তাঁর পরম চৈতন্যরূপ পটভূমি। তিনি শ্বেতশুভ্র এবং নিষ্ক্রিয়। পরম চৈতন্য বলেও সপ্রকাশ অথচ নিষ্ক্রিয়। এই যে পরম চৈতন্য তাঁর বাইরে থাকতে পারে না কিছুই। তাই ৺মা একা নন—

তিনি শিববক্ষারূঢ়া। ৺মা হলেন গুণময়ী ক্রিয়া। প্রকৃতি হিসেবে তিনি গুণ দ্বারাই তৈরি, কারণ প্রকৃতির আবির্ভাব হয় গুণের মধ্যে সংঘাতের ফলে, গুণের মধ্যে সাম্যের অভাবের ফলে। তিনি নগ্ন এই কারণে যে, যদিও সবাইকে তিনি বেষ্টন করে আছেন, তাঁকে বেষ্টন করার কেউই নেই। তিনি অন্ধকার বর্ণা, কারণ তিনি দুর্জ্ঞেয়া, অবাঙ্মানসগোচরা। তবে তিনি প্রকৃতি হলেও মূল থেকে, অর্থাৎ শিব থেকে, অর্থাৎ পরম চৈতন্য থেকে বিচ্ছিন্না নন। তিনি পরম চৈতন্যেরই গুণস্বরূপা। সাংখ্যের পুরুষ এবং প্রকৃতির মত দু'টি নন, একটি। তিনি হলেন অবিভাজ্য ও অবিচ্ছেদ্য সত্যের মেরুপ্রান্তিক রূপ। এই অবিভাজ্য ও অবিচ্ছেদ্য আদি শক্তি বা আদ্যাশক্তিও হলেন তিনি নিজেই। সেইজন্য শক্তি থেকে চিৎ বা পরম চৈতন্য পৃথক একটা কিছু নয়। চৈতন্য আর শক্তি এক। শিবই শক্তি, শক্তিই শিব। ইনিই হলেন গুণাশ্রয়ী, অর্থাৎ গুণকে আশ্রয় করে যা টিকে আছে, আবার ইনিই হলেন গুণময়ী অর্থাৎ গুণ দিয়েই যা তৈরি। একাধারে তিনি নির্গুণ এবং সগুণ দুইই।

মহাজাগতিক শক্তি হল সমষ্টিশক্তি। কুণ্ডলিনী হলেন ব্যষ্টি-শক্তি। এই ব্যষ্টিশক্তি হল মহাজাগতিক শক্তির ক্ষুদ্ররূপে বিকাশ। কুণ্ডলিনীতেই রয়েছে মহাবিশ্বজাগতিক শক্তির প্রতিচ্ছবি। শক্তির মেরুপ্রান্তিকতাই তাঁকে দিয়েছে গতিময় স্থিরতা (static dynamic aspect)। মানুষের দেহের মধ্যেও রয়েছে শক্তির এই মেরু প্রান্তিকতার খেলা। মূলাধারে সাড়ে তিন প্যাঁচে স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে বেষ্টন করে আছেন যে কুণ্ডলিনী, তিনি হলেন গতিময় শক্তির স্থিতিময় পট-ভূমি। গতিময় শক্তি সারাদেহে প্রাণ-স্পন্দনের খেলা খেলে চলেছে। স্থিতিময় শক্তি রয়েছে মূলাধারে স্থির হয়ে। মানবদেহ এই কারণে একটি চুম্বক বিশেষ, যার মধ্যে রয়েছে দু'টি মেরুপ্রান্ত। মূলাধার হল সমগ্র দেহের তুলনায় স্থিত মেরু। সমগ্র দেহ হল গতিময়। আধার হল স্থিত মেরু, সেইজন্য তাকে বলে মূলাধার। এই মূলাধারের স্থিত শক্তি হল দেহের অভ্যন্তরের ক্রিয়াশীল ও ক্রমবিকাশমান শক্তির সঙ্গে

সহাবস্থানী। দেহের গতিময় শক্তি হল তার প্রতিরূপ (counter-part)। স্থিত শক্তিকে কেন্দ্র করেই তা সঞ্চরণশীল। মূলাধারের শক্তি হল পৃথ্বী পর্যন্ত স্থূলজগৎ সৃষ্টির পর বিকাশমান শক্তির অবশিষ্ট অংশ। কারণ স্থূল পদার্থ সৃষ্টির পর শক্তিকে আর অগ্রসর হতে হয় নি নতুন পর্যায় সৃষ্টির জন্য। অথচ শক্তি নিঃশেষিত হতে পারে না কখনও। সেইজন্য অবশিষ্ট শক্তি স্থির হয়ে আছে মূলাধারে।

জন্ম রহস্যের পিছনেও সম্ভবতঃ এই শক্তিই ক্রিয়াশীল রয়েছে। যেমন ধরুন, মাতৃ ovum প্রতিনিধিত্ব করে স্থিত শক্তির। পিতৃ বীর্য (spermatazoon) প্রতিনিধিত্ব করে গতিময়তার। এই দুইয়ের মিলন থেকেই আরম্ভ হয় পৃথকীকরণ ও একীকরণ। জীবন বিজ্ঞানের ভাষায় differentiation and integration. শক্তি আত্মপ্রকাশ করে germinal cell থেকে অর্থাৎ fertilised ovum থেকে। তারপর বহির্বিষয় গ্রহণ করে এবং আত্মস্থ করে বাড়তে থাকে। জীবকোষগুলি আত্মবিভক্তি করে সৃষ্টি করে নতুন জীবকোষ। তারপর আবার তাদের একীভূত করে দেহসৃষ্টি করে। অদ্ভুত এক গ্রহণবর্জন নীতির মধ্য দিয়ে চলেছে এই সৃষ্টিকর্ম। বহির্বিষয় গ্রহণ হল ক্রিয়া-শক্তির বহিঃপ্রকাশ, আত্মস্থকরণ হল শক্তির অন্তর্মুখীন ক্রিয়াকলাপ। জীবকোষের বিভক্তি এবং বৃদ্ধি হল শক্তির বহির্মুখী ক্রিয়া। এদের সমন্বয়সাধন হল অন্তর্মুখীন কার্যকলাপ। শক্তির এই দুই ক্রিয়া ছাড়া সবই অচল। Germ cell-এর মধ্যে শক্তির যে সঞ্চিত অবস্থা (stock) তা ততক্ষণই স্থির থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না মাতৃগর্ভে পিতৃ মাতৃ কোষের মিলন ঘটে। এই শক্তিই হল দেহের আদ্যাশক্তি, অক্লান্ত শক্তির উৎস। শক্তির প্রতিমুহূর্তের সংকোচন হল নতুন করে বিকোচনের আরম্ভ। অথচ মূল শক্তির সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত না হয়েই ঘটছে এমন। Germ cell-এর এই শক্তিকে সেইজন্য বলা চলে শাশ্বত শক্তি। তাকে কেন্দ্র করেই চলেছে দেহের যত লীলাখেলা।

এতক্ষণ যে আলোচনা হল তাতে নিশ্চয় অসঙ্গতি আছে অনেক ক্ষেত্রেই। সেইজন্য একটা সমন্বয়ের দরকার। যেমন (১) যে germ force-কে আমরা স্থির (static) বলেছি তার মধ্যেই নিশ্চয়ই আছে গতি এবং স্থিতি এক হয়ে। কারণ শুধুমাত্র স্থিতি থেকে গতি হতে পারে না। তবুও বলা যায় যে, যে-germ force দিয়ে আমাদের জীবনযাত্রা শুরু তা প্রধানতঃ স্থির (statical)। এই শক্তিই হল প্যাঁচানো কুণ্ডলিনী। (২) এ থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে ক্রিয়ার আবেগ এরই জন্য কুণ্ডলিনী আংশিকভাবে স্থির এবং আংশিকভাবে গতিময়। অর্থাৎ এর স্থির অবস্থা থেকেই তৈরি হয় গতিময়তা যার ফলে তৈরি হয় দেহ। কিন্তু দেহবৃদ্ধির এই পদ্ধতির মধ্যে কুণ্ডলিনী নিজেকে যে নিঃশেষিত করে ব্যয় করেন তা নয়। সাড়ে তিন প্যাঁচ শক্তি তিনি রেখেই দেন। এ যদি না হত, মূলাধার চক্র যদি নিষ্ক্রিয় থাকত, তাহলে কোনদিনই সম্ভব হত না দেহের ক্রমবিকাশ। এ হল হাঁসকল বা কব্জা যার উপর সব ঘুরছে। (৩) প্রত্যেকটি সৃজনশীল ক্রিয়ারই মূলাধারের উপর প্রভাব পড়ছে। এই প্রভাবে যদিও মূলাধারের মৌল চরিত্রের কোন হেরফের হচ্ছে না তবুও এর আয়তন ও তীব্রতা বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু যে মূলশক্তি রয়েছে সাড়ে তিন প্যাঁচ মাপে তার কোন হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না কখনও। যেমন, প্রত্যেকটি স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসই মূলাধারে কুণ্ডলিনীর উপর প্রভাব ফেলে। কিন্তু এতে কুণ্ডলিনীর কিছুই পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু প্রাণায়াম করলেই এর উপর ঘটে তীব্র প্রতিক্রিয়া মূলাধারের উত্তপ্ত শক্তি উঠতে থাকে উপরের দিকে। একের পর এক চক্রভেদ হতে থাকে। কিন্তু সাধারণ যে ধারণা আছে, কুণ্ডলিনী নিজেকে বেষ্টনমুক্ত করে ছুটে চলেন উপরের দিকে, সে ধারণা সম্পর্কে সন্দেহের প্রচুর অবকাশ আছে। সেই স্থির শক্তি কখনই নিজেকে নিঃশেষিত করতে পারে না কখনও। ব্যাপারটি আসলে ঘটে এইরকম কুণ্ডলিনী শক্তি যখন যোগের প্রভাবে অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠেন, তখন সদৃশ এক শক্তিকে ঊর্ধ্ব দিকে ঠেলে দেন। সেই শক্তি দেহের বিভি

স্তর ভেদ করতে করতে মিশে যায় শিবের মহাকুণ্ডলীর সঙ্গে, সপ্তম স্তরে, অর্থাৎ সহস্রারে। যখন মূলাধার থেকে শক্তির এই আত্মচ্ছায়া নিক্ষেপণ সুষুম্না দিয়ে উঠে যায় উর্ধ্ব দিকে, মূল কুণ্ডলিনীকে স্বয়ং নড়তে হয় না স্বক্ষেত্র থেকে। overcharged electro magnetic যন্ত্র থেকে যেমন স্ফুলিঙ্গ বেরয় এও ঠিক তেমনি। এ যেন রেডিয়াম নির্গমন। যে শক্তি থেকে তার নির্গমন হচ্ছে, তার হেরফের ঘটছে না তেমন (It is like the emanation of radium which do not sensibly detract from the energy contained in it.) কুণ্ডলিনী শক্তির এই প্রতিক্ষেপ যেন উপনিষদের সেই ধারণার মত—'পূর্ণ থেকে পূর্ণকে তুলে নিলে থাকে পূর্ণই।' মূলাধারের কুণ্ডলিনী হলেন পূর্ণ আদ্যাশক্তি—রয়েছেন পরমাণু আকারে। যেজন্য এঁকে বলে coiled বা কুণ্ডলীকৃতা। এই পূর্ণ আদ্যাশক্তি সর্বশেষে যেখানে গিয়ে মিশেছেন সেই সহস্রারেও রয়েছে পূর্ণ।

কুণ্ডলিনীর যে শক্তি সুষুম্না দিয়ে উর্ধ্বে ওঠে, সেই শক্তি হল গতিময় শক্তি (dynamic)। মূলাধারের স্থির শক্তির এটা প্রতিচ্ছায়া মাত্র। মূলাধারের শক্তির হেরফের ঘটে না কখনও। অথচ সেই স্থির শক্তি থেকে একটা গতিময় শক্তির সৃষ্টি হয়। এইজন্যই যোগীরা যোগের দ্বারা কোন শক্তি তৈরি করেন না, তাকে জাগরিত করেন মাত্র। আধুনিক জীবন-বিজ্ঞানের অভিমত, যে germ cell বিকশিত হয়ে দেহ তৈরি করে, সে germ cell কখনও শেষ হয় না। মূল germ cell দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এই যা। এর এক ভাগ তৈরি করে দেহ, আর এক ভাগ অবিকৃত অবস্থায় থাকে দেহের মধ্যে। এই অবিকৃত অর্ধ অংশ germ-plasm-এর কাজ করে। এই germ-plasm প্রজন্মের দীর্ঘ প্রবাহেও অবিকৃত থাকে।

শক্তি, তা স্থির বা গতিময় যা-ই হোক না কেন, তার পটভূমিতে স্থির (static) শক্তির থাকা চাই-ই। স্থির ভিত্তি বা আধার ছাড়া গতিময় শক্তির ক্রিয়াকলাপ অসম্ভব। তন্ত্রের এই ধারণা যদি সত্য হয়

তাহলে নিরবচ্ছিন্ন গতিময়তা সম্পর্কে **Heraclitus**, বৌদ্ধগণ এবং বর্তমান দার্শনিক **Bergson**-এর যে অভিমত তা অসত্য। এর কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। নিরবচ্ছিন্ন গতিময়তা সম্পর্কে যদি কারো কোন অনুভব হয়ে থাকে অর্থাৎ হৃদয়ানুভূতিসঞ্জাত ধারণা, তবে তার যথার্থ কোন ভিত্তি নেই। পরমাণুর গঠন-প্রকৃতি এবং শক্তির মেরুকেন্দ্রিকতা স্থির-গতিময়তাকেই (static-dynamic) প্রকাশ করে। অস্তিত্ব যেখানে জটিল সেখানে শক্তির এই স্থির-গতিময়তাই কাজ করে। দেহের সমস্ত ক্রিয়াশীলতা, **germ cell**-এর ক্রমবিকাশ, সবই এই স্থির শক্তিকেই কেন্দ্র করে, যে শক্তি রয়েছে মূলাধারে। মহাবিশ্ব জগৎ, সৃষ্টি, যা এসে স্তব্ধ হয়েছে পৃথ্বী তত্ত্বে, সেই সৃষ্টিরও পেছনে রয়েছে এই স্থির শক্তি। এই শক্তিই হল পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরীর চিন্ময় দেহে মহাকুণ্ডলী শক্তি। সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে যখন কেবলমাত্র মহাবিশ্ব-জগতের উদয় হচ্ছে ঐশ্বরিক চেতনায়, তখন—তৎ-মেরুপ্রান্তের প্রতি-মেরুপ্রান্ত (anti-polarity) হিসেবে প্রয়োজন হয়েছিল 'অহম্'-এর। তৎ-এর বিকাশের স্থির পটভূমি হিসেবে কাজ করেছে অহম্। আমাদের মানুষের অভিজ্ঞতার যে চৈতন্যবোধ, সেই চৈতন্যবোধই কাজ করে স্থির শক্তি হিসেবে। মানুষের দেহে যেমন মূলাধার, তেমনই মহাসৃষ্টির সর্বত্রই রয়েছে মূলাধার বা static force. মূল হল চিৎশক্তি অর্থাৎ শক্তির চেতনা।

প্রাণায়াম বা বীজমন্ত্রে মূলাধার হয় **Overcharged Electro-Magnetic** যন্ত্রের মত। মূলাধারে কুণ্ডলিনীর জাগরণ হল—স্থির শক্তির গতিময়তা বা ক্রিয়াশীলতার সমান। এতে করে স্থির শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যায় না কখনও। যা উর্ধ্বে উঠে যায় তা হল কুণ্ডলিনীর প্রতিচ্ছায়া।

কেউ কেউ মনে করেন, কুণ্ডলিনী শক্তিই অংশত রূপান্তরিত হন গতিময় (**kinetic**) শক্তি হিসেবে। তবুও শক্তি, এমনকি মূলাধারের শক্তিও হল অসীম। সুতরাং এ শক্তির কখনও শেষ নেই। এক ধরনের

শক্তির আর এক ধরনের রূপান্তর হয় এই যা। কুণ্ডলিনীর সহস্রারে যাওয়াতে অসীম স্থির শক্তি (infinite potential) হয় অসীম গতিময় (infinite kinetic) শক্তি। ব্যক্তিদেহে কুণ্ডলিনী-শক্তি স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-এর স্তর পার হলেই ঘটে বিদেহ মুক্তি। কিন্তু অনেকের ধারণা এতেও বিদেহ মুক্তি হয় না, কারণ সংস্কার থাকলে মুক্তি অসম্ভব। কারণ দেহের মধ্যে স্থির শক্তির এতে লয় ঘটলেও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মহাকুণ্ডলী শক্তি থেকেই যায়।

প্রভাবিত হতে পারে এমন কোন জিনিস যদি Electro-Magnetic যন্ত্রের কাছে রাখা যায়—দেখা যাবে যন্ত্রটি সেই জিনিসের মধ্যে ছড়িয়ে দেবে বিপরীত ধরনের একটা বৈত্যুতিক চৌম্বক শক্তি। অথচ সেজন্য Electro-Magnetic যন্ত্রের শক্তির কোন তারতম্য ঘটবে না। সাধারণতঃ যেমন দেখা যায়, যার থেকে যত শক্তি গেল ততই তার কমল, যাতে গেল তার বাড়ল ; স্থির শক্তির প্রতিচ্ছায়ার ক্ষেত্রে তেমন কিছু ঘটে না। মূলাধারস্থিত কুলকুণ্ডলিনী যদিও প্রতিচ্ছায়া নিক্ষেপ করে, তবু সে তেমনি অবিকৃতা থাকে। রূপান্তরিত শক্তি স্থির শক্তির সমান হয়, এবং স্বভাবে হয় বিপরীত, যেমন, গতিময়। যেন কোন হাঁ-বাচক শক্তি (Positive charge) অনুরূপ না-বাচক শক্তি (Negative charge) ছড়িয়ে দিচ্ছে কাছাকাছি কোন জিনিসকে। মূলাধার থেকে কুণ্ডলিনীর উর্ধ্বগতিও বুঝি এমনি। overcharged কুণ্ডলিনী (উত্তপ্ত কুণ্ডলিনী) প্রতিবেশী স্বাধিষ্ঠান চক্রে ছড়িয়ে দেয় তার গতিময় শক্তি (kinetic energy) এই বোধহয় কুণ্ডলিনীর উর্ধ্ব গমন।

তবে সাধারণ বিচারবুদ্ধি বা বিজ্ঞানবুদ্ধি যা-ই বলুক না কেন, যোগ মতে কিন্তু স্থির শক্তি কুণ্ডলিনী যোগতাপে উত্তপ্ত হয়ে প্যাঁচ খুলে দিয়ে নিজেই ছুটে চলেন উর্ধ্ব দিকে। যোগীকে যদি জিজ্ঞেস করা যায়, কুণ্ডলিনী শক্তি উর্ধ্বে উঠে গেলে, দেহ মড়ার মত হলে, ব্যক্তি-চৈতন্য হারিয়ে গেলে স্বতন্ত্র দেহ টিকে থাকে কি করে ? তাহলে তিনি

বলবেন, শিবশক্তির মিলনের ফলে যে শক্তি তৈরি হয় দেহ টিকে থাকে সেই শক্তির বলে। যোগীদের কথা, কুণ্ডলিনী যদি স্থির থাকে, তার প্রতিচ্ছায়া যদি উঠে যায়, তাহলে যে অংশ থেকে তা উঠে যায় তা স্থির হয়ে যায় কেন ? শক্তি ঠিক থাকলে সেখানেও থাকবে উত্তাপ, স্পন্দন, কিন্তু তা কেন থাকে না ? সুতরাং ধরতেই হবে যে, কুণ্ডলিনীর প্রতিচ্ছায়া নয়, কুণ্ডলিনী নিজেই ওঠেন উপরের দিকে।

তবু আমাদেরও ধারণা, যারা যোগ করে নি তেমন ভাবে, কুণ্ডলিনীকে সুষুম্না দিয়ে ওঠান নি, তাঁরা জানেন না যে, কুণ্ডলিনী যথার্থই দেহের স্থির কেন্দ্র। দেহের প্রত্যেকটি কোষের মধ্যেই আছে এই স্থির কেন্দ্র! এইসব প্রাণকোষ বা জীবকোষ ধরে রাখে শিবের সঙ্গে কুণ্ডলিনীর মিলনে যে অমৃত রসধারা নির্গত হয় সেই রসধারা। তবে বিজ্ঞানী তার্কিক তবু বলবেন, কুণ্ডলিনীর উর্ধ্বগতি হল কুণ্ডলিনীর প্রতিচ্ছায়ার উর্ধ্বগতি। কুণ্ডলিনীর যে কিছু স্পন্দন তা হল জাহাজ থেকে কামান দাগার অনুরূপ। জাহাজ থেকে কামান দাগলে তার ধাক্কা এসে পড়ে জাহাজের গায়ে। কুণ্ডলিনী থেকে প্রতিচ্ছায়া নিক্ষিপ্ত হলে তার ধাক্কা এসে তেমনি পড়ে দেহের উপর। তবে জাহাজে তখনও যেমন কামান থাকে, দেহের মধ্যে কুণ্ডলিনী শক্তিও তবু তেমনই থাকে, প্রতিচ্ছায়া বিচ্ছুরণে হেরফের হয় না তেমন কোন। ভিতের উপর না দাঁড়ালে যেমন কামানের গোলা ছুটতে পারে না, তেমনি কুণ্ডলিনীর গতিময় শক্তি তার স্থির শক্তির উপরই নির্ভরশীল। উর্ধ্বগামী শক্তি হল স্থির শক্তির প্রতিচ্ছায়া। কুণ্ডলিনী যদি নিজের শক্তি ত্যাগ করেন, তাহলে বুঝতে হবে তিনি আর কুণ্ডলিনী অর্থে থাকেন না। কুণ্ডলিনী তখন স্থির শক্তি থেকে হয়ে যান গতিময়। কুণ্ডলিনী হন 'না-কুণ্ডলিনী।'

কিন্তু যত কথাই বলি না কেন, যে প্রশ্ন থেকে যায় তা হল এই : কুণ্ডলিনীর উর্ধ্বগতিতে মূলাধারের কুণ্ডলিনী কি সত্য সত্যই নিঃশেষ হয়ে যান। গতিময় শক্তি কি স্থির শক্তিকে নাশ না করলে হয় না ?

গতিময় শক্তি কি স্থির শক্তিকে অস্বীকার করে সম্ভব? এক পা স্থির না করে আর এক পা বাড়িয়ে কি চলা যায়? সেদিক থেকে দেখতে গেলে আবার বিভ্রান্তি আসে। কোন কিছু স্থির ভিত্তির উপর না দাঁড়ালে গতিময় শক্তি অসম্ভব। সুতরাং এ এক অদ্ভুত অবস্থা। শক্তি যেমন স্থান ত্যাগ করছেন আবার থেকেও যাচ্ছেন তেমনি। কুণ্ডলিনী এক অবস্থাতে কুণ্ডলীমুক্তা, আর এক অবস্থাতে কুণ্ডলায়িতা। দুইই চলছে এক সঙ্গে।

ব্যক্তিদেহের কেন্দ্রে স্থির শক্তি কখনও নিঃশেষিত হতে পারে না। তখনই এ শক্তি নিঃশেষিত হবে যখন ঘটবে বিদেহ মুক্তি, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত না স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ-শরীরের অবসান ঘটছে। কুণ্ডলিনী শক্তি হল সমস্ত জৈবিক দেহের স্থির শক্তি। পৃথক পৃথক কোষের স্বতন্ত্র জীবন এবং সমস্ত জৈবিক দেহের সম্মিলিত জৈব চেতনার মধ্যে যে কি সম্পর্ক তা স্পষ্ট করে বলতে পারে নি বিজ্ঞান। পৃথক পৃথক কোষের একটা যান্ত্রিক সংযোগই কি জৈবদেহ-জীবন? অথবা পৃথক পৃথক কোষের জীবন সমগ্র জৈব দেহের উত্তাপেই উত্তাপিত? প্রাণ-শক্তিসম্পন্ন? অর্থাৎ সাধারণ জৈবদেহজীবনই কোষজীবন তৈরি করে, না কোষজীবনই তৈরি করে সাধারণ জৈবদেহজীবন? এ ব্যাপারে বিজ্ঞানের চূড়ান্ত কোন জবাব নেই। শক্তিবাদের অনেক সমর্থকই মনে করেন যে, সাধারণ জৈবদেহ-জীবনই অর্থাৎ একটা প্রাণ-প্রবাহই এ ব্যাপারে কোষজীবনের অগ্রগামী। Germ cell-এর মধ্যেই দিয়ে দেওয়া হয় সাধারণ জীবনের সার। জীবদেহের সমস্ত বিকাশই সেই কোষে প্রবাহিত জীবনের সার থেকে। তবুও কোষ-জীবনেরও আছে একটা সম-স্বাধীনতা। 'সম' বলার কারণ, সমগ্র জীবনপ্রবাহ থেকেই তাকে সংগ্রহ করতে হয় জীবনরস। সমগ্র জৈব দেহের উপর আঘাত এলে তা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে কোষের মধ্যেও। সমগ্র দেহজীবনের মৃত্যু হলে কোষেরও মৃত্যু ঘটে।

প্রত্যেক কোষেই আছে স্থির-গতি সম্পন্ন (static dynamic

polarity) মেরুপ্রান্তিক শক্তি। সমগ্র দেহের মধ্যেও আছে এটা। সমগ্র দেহের মধ্যে এই স্থির শক্তি থাকে মূলাধারে। আর যে শক্তি সারা দেহে ক্রিয়াশীল, তা হল এই স্থির শক্তির গতিময় দিক। এই ক্রিয়াশীল শক্তি হল পঞ্চপ্রাণ অর্থাৎ প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। দেহের সমস্ত কাজই চলে এই পঞ্চপ্রাণের দ্বারা। সুতরা বলা যেতে পারে যে, গতিময় শক্তি থাকে সারা দেহে। এই গতিময় শক্তি শুধু যে বৃহৎ অঙ্গগুলিকেই পরিচালিত করে তা নয়, ক্ষুদ্র কোষ গুলিকেও উজ্জীবিত রাখে। সুতরাং মূলাধার থেকে কুণ্ডলিনীর উর্ধ্ব গতি বলতে এই বোঝায় না যে, সেই স্থির শক্তিই উঠে যাচ্ছে। আসলে ঘটনা যা ঘটছে তা হল এই যে, দেহকে ক্রিয়াশীল রাখছে যে প্রাণ প্রবাহ অর্থাৎ গতিময় শক্তি, কুণ্ডলিনীযোগে ষটচক্র ভেদ বলতে বোঝায়—দেহের বিভিন্ন স্তর থেকে সেই প্রাণ-শক্তিকে স্তরে স্তরে গুটিয়ে আনা। তার ফলে যে অঞ্চল থেকে সেই শক্তি সরে যায়, সেই অঞ্চলকেই মনে হয় মৃতবৎ, ঠাণ্ডা। কুণ্ডলিনীর উর্ধ্বগতি মানে এই নয় যে, এতে মূলাধারের স্থির শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে। কুণ্ডলিনীর গতিময় প্রাণশক্তি হিসেবে পঞ্চবায়ুকে যোগের মাধ্যমে একত্র সংগ্রহ করে সুষুম্নার মধ্যে প্রবাহিত করা হয়। কুণ্ডলিনী যেমন থাকেন গতিতে তেমনি থাকেন সুষুম্নার মধ্য দিয়ে উর্ধ্বগতি প্রাণপ্রবাহের মধ্যেও কিন্তু যোগের সাহায্যে সমগ্র দেহে প্রবাহিত পঞ্চবায়ু বা প্রাণকে একটি অক্ষরেখায় এনে সংগ্রহ করা গেলেও দেহের সমস্ত প্রাণ-শক্তিই যে এতে নিঃশেষিত হয়ে যায় তা নয়, আরও কিছু প্রাণ বাকি থাকে এই যৌগিক আহরণের বাইরে। সেই অবশিষ্ট প্রাণশক্তিই বাঁচিয়ে রাখে দেহকোষগুলিকে এবং দেহকে। এই কারণেই দেহ মৃতবৎ হলেও বস্তুতঃ যৌগিক সমাধি লাভ করার পরও দেহ বেঁচে থাকে। যৌগিক প্রথায় যদি সম্পূর্ণ প্রাণশক্তি আহরিত হয়ে সুষুম্না দিয়ে সহস্রারে তা প্রবাহিত হয়ে যায় তাহলে সমগ্র দেহই নষ্ট হয়ে যাবে, পুনরা তাতে প্রাণপ্রবাহ অসম্ভব।

অপর পক্ষে কুণ্ডলিনী অর্থাৎ স্থির শক্তি যদি যথার্থই জাগরিতা হন, মূলাধারে কুণ্ডলিনী যদি তাঁর সাড়ে তিন প্যাঁচ খুলে ফেলেন স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ থেকে, তাহলে কোথাও প্রাণপ্রবাহের অভাব তো ঘটবেই না বরং সমস্ত দেহ ভরে যাবে প্রচণ্ড প্রাণপ্রবাহে। দেহের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা গতিময় শক্তি শুকিয়ে তো যাবেই না বরং কুণ্ডলিনীর ঊর্ধ্বগতির জন্য আরও কিছু প্রাণশক্তি যুক্ত হবে এর সঙ্গে। কারণ কুণ্ডলিনীর ঊর্ধ্বগতি হলে স্থির শক্তি গতিময় হয়ে আরও বেশী প্রাণশক্তি ছড়াবে। **Static power** হবে **Kinetic**-সুষুম্নার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে প্রতিবেশী নাড়ি ও কোষগুলিকে আরও বেশী করে সঞ্জীবিত করবে। এইজন্যই অনেকের ধারণা, কুণ্ডলিনীর জাগরণে স্থির-শক্তি এতটুকুও বিচলিত হয় না। কুণ্ডলিনী বা স্থিরশক্তি নিজে স্থির থাকলেও গতিময় একটি ভাব (**dynamic equivalent**) তৈরি করে। এই গতিময় ভাবই প্রাণশক্তি হিসেবে কাজ করে। এই প্রাণশক্তিই যোগের দ্বারা আহরিত হয়ে সুষুম্নাতে যায় এবং তারপরই উঠতে থাকে ঊর্ধ্বদিকে। সুতরাং কুণ্ডলিনীর ঊর্ধ্বগতিকে এইভাবে ভাগ করা যেতে পারে :

(১) অক্ষরেখা বা মেরুদণ্ডের মূলে আছে মূলাধারে সাড়ে তিন প্যাঁচের স্থিরশক্তি বা স্থির কুণ্ডলিনী। এর সহযোগী হিসেবে সমস্ত দেহে ছড়িয়ে আছে গতিময় প্রাণ পাঁচভাবে—অর্থাৎ পঞ্চবায়ুর আকারে, যে বায়ুর কথা বলা হয়েছে আগেই। (২) কুণ্ডলিনী-যোগে গতিময় প্রাণের কিছু অংশকে সংগ্রহ করা হয় মূলাধারে। এর ফলে মূলাধার গতিময় প্রাণদ্বারা আক্রান্ত বা প্রভাবিত হয়। এর ফলে দেহের অন্যান্য অংশের সমস্ত গতিময় শক্তি নেমে আসে মূলাধারে। এসে একত্রে জড় হয় অক্ষরেখার মুখে। এই গতিময় শক্তি হল সমস্ত দেহশক্তির সমান। (ক) প্রাণশক্তির এই একত্র সমাবেশে কুণ্ডলিনী তাঁর সাম্য হারান না। (খ) কিভাবে এই প্রাণশক্তির যে একত্র সমাবশে হয় বলা অসম্ভব। তবে সম্ভবতঃ স্থির কুণ্ডলিনী শক্তির কিছুটা আকর্ষণ থাকে যা দেহের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রাণশক্তিকে সংগ্রহ করে এনে জড় করে

সেখানে। এই প্রাণশক্তি সমবেত হয় অক্ষরেখার মুখে। (গ) কিংবা এমনও হতে পারে যে, Elcetro Magnatic Action-এর মত কোন এক সূক্ষ্ম ক্রিয়া (Inductive Action) দ্বারা প্রাণশক্তি একত্রে সংগৃহীত হয়ে কেন্দ্রাভিমুখী হয়। অঙ্কের ভাষায় ছড়িয়ে পড়া প্রাণশক্তিকে বলা যায় Scalar Quantity অর্থাৎ যার Magnitude আছে Direction নেই। অপরপক্ষে এক-কেন্দ্রাভিমুখী প্রাণকে বলা যায় Vector Quantity অর্থাৎ যার Magnitude ও Direction দুইই আছে।

ধরা যাক আমরা দৈবচক্ষু বা আন্তর নয়নে দেখলাম কুণ্ডলিনী যোগের অগ্রগতি। তাহলে দেখব, যেন ঘন তড়িৎ উঠছে মূলাধার থেকে। এবং সেই তড়িৎ একের পর এক চক্র ভেদ করছে। যত চক্র ভেদ করছে ততই সে হচ্ছে বেশী গতিবেগসম্পন্ন। এই গতিবেগ বেড়ে যাচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই তড়িৎ গিয়ে পৌঁছচ্ছে পরমদৈবস্থানে। তখন যদি ফিরে তাকানো যায় মূলাধারের দিকে তাহলে দেখা যাবে যে, কুণ্ডলিনী তেমনই সাড়ে তিনপ্যাঁচে জড়িয়ে ধরে আছে স্বয়ম্ভূ লিঙ্গকে। তিনি নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন, অথচ রয়ে গেছেন স্বক্ষেত্রেই। নিজেকে মূলাধারে রেখেই আবার ফিরে আসছেন সহস্রার থেকে। যোগীদের কুণ্ডলিনীর ওঠা নানা বুঝি এমনিতরই।

একটু গভীরভাবে ভাবলে মনে হয়, কুণ্ডলিনী যখন জাগেন তখন তিনি নিজে অথবা তার প্রক্ষিপ্ত শক্তি হারিয়ে ফেলেন স্থিরতা, যে স্থির-শক্তি বিশ্বচৈতন্যকে ধরে রাখে। যতক্ষণ তিনি নিদ্রিতা, ততক্ষণই ধারণ করে রাখেন। যখন গতিময়ী তখন চলে আসেন অপরার্ধের স্থির কেন্দ্রে থাকে বলে সহস্রার। এই সহস্রারের মেরুপ্রান্তও তিনি নিজেই, শিব-চৈতন্যের সঙ্গে মিলিতভাবে অথবা স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, সমস্ত পর্যায়ের অতীত তুরীয়াতীত অবস্থাতে। কুণ্ডলিনী যখন নিদ্রিতা, তখন মানুষের কাছে এই জগৎ রূপময়। যখন তিনি জেগে ওঠেন তখন তিনি রূপ-চৈতন্য হারিয়ে প্রবেশ করেন মানুষের কারণ-শরীরে। যোগের দ্বারা মানুষ চলে যায় চৈতন্যের অতীতে।

কুণ্ডলিনী যোগ যাঁরা করেন তাঁরা বলেন, এ যোগ অন্যসব যোগ থেকে অনেক বড়। এ-যোগে যে সমাধি হয় সে ধরনের সমাধি অন্য কোন যোগেই হয় না। এ জন্য তাঁরা যে কারণ দেখান, তা হল এই রকম : ধ্যানযোগে যে চরমানন্দ তা হয় বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে, নিবিড় মনঃসংযোগের ফলে মন তখন শূন্য হয়। মন শূন্য হলে তবেই সেখানে থাকতে পারেন পরম চৈতন্য।

তবে পরম চৈতন্যের স্বাদ সাধক কতটা অনুভব করবেন নির্ভর করবে তার জ্ঞান-শক্তির উপর এবং কতটা তিনি বিশ্ব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবেন তার উপর। অপর পক্ষে কুণ্ডলিনী, যিনি সকল শক্তি একত্রে এবং এই কারণে জ্ঞান-শক্তিও, তিনি যখন জাগেন যোগী তখন লাভ করেন পূর্ণ-জ্ঞান! ধ্যান-যোগে কুণ্ডলিনীকে জাগানো সম্ভব নয়। ফলে শিবের সঙ্গে শক্তির মিলনের ফলে যে পরম তৃপ্তিকর অবস্থা আসে সে অবস্থার সন্ধান এই যোগে মেলে না।

কুণ্ডলিনী যোগে কেবল যে ধ্যানযোগে সমাধি হয় তা নয়, এ সমাধি হয় জীবের কেন্দ্র-শক্তির সহযোগে, যে শক্তি তাঁর উর্ধ্বগতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের অঙ্গে গুটিয়ে নেন দৈহিক চেতনা, মানসিক চেতনা, সব। শুধুমাত্র মনঃসংযোগের সাহায্যে পূর্ণের সঙ্গে যে যোগ, এ যোগ তার চাইতে অনেক বেশি পূর্ণ। কারণ, মনকে শূন্য করলেও, তার মধ্যে থাকতে পারে শূন্যবৃত্তি। কিন্তু কুণ্ডলিনী যদি দেহের স্তরে স্তরে উর্ধ্বে ওঠেন তাহলে নিঃশেষে তিনি পার্থিব সকল স্তরের চেতনাকেই গুটিয়ে নেন নিজের সঙ্গে। ধ্যান যোগ ও কুণ্ডলিনী যোগ, উভয় যোগেই দৈহিক চেতনা থাকে না। কিন্তু কুণ্ডলিনী যোগে সমস্ত দেহকেই গুটিয়ে নেওয়া হয় শিবের কাছে। এর ফলে যে আনন্দ (ভুক্তি) ধ্যানযোগী এই আনন্দের স্বাদ কখনও বুঝতে পারেন না। দিব্যযোগী ও বীর সাধক, উভয়েই যদিও মুক্তি লাভ করেন তবুও দিব্য যোগীর আনন্দ অনেক বেশী নিবিড়। দিব্য যোগীর আনন্দ হল স্বয়ং-আনন্দ। বীর সাধকেরা দেহ-

জগতে এর অনুমান করেন। এ যেন অতি কষ্ট করে তুলে আনা তৃষ্ণার জল।

ধ্যানযোগী ও কুণ্ডলিনী যোগী অর্থাৎ বীর সাধক ও দিব্য সাধক যদিও উভয়েই লাভ করেন মুক্তি অবুও বীর সাধকের মুক্তি হল পার্থিব জগৎ থেকে মুক্তি। কিন্তু যোগী যখন তাঁর সাধনা দ্বারা বার বার কুণ্ডলিনীকে শিবের সঙ্গে যুক্ত করে শাশ্বত মিলন তৈরি করেন তখন সেই আনন্দের, সেই মুক্তির কোন তুলনা নেই। সে মুক্তি 'মুক্তি' নিজেই। এই জন্য এই যোগকে বলা হয় রাজযোগ, অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ।

চতুর্থ অধ্যায়

যোগের কথা বলেছিলেন একটি বন্ধু, সর্প রহস্য ভেদ করতে গেলে কি যোগ সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার। সে-জন্য পড়লাম পতঞ্জলির যোগসূত্র। পড়লাম তন্ত্রযোগ। কিন্তু সর্প রহস্য কি তাতে ভেদ হল? ব্রহ্মাণ কি, তা যেমন পুঁথি পড়ে জানা যায় না, তেমনি যোগ কি তা যোগ না করলে বোঝা যায় না। কিংবা বিশ্বাস হয় না নিজের চোখে যোগী পুরুষকে না দেখলে। অনেক সময় চোখের সামনে অদ্ভুত ঘটনা, অবিশ্বাস্য ঘটনা দেখলেও কেমন সন্দেহের দোলা লাগে। মনে হয় বুজরুকি। আমরা যাকে মেসমেরিজম বলি তাই। সোকরিগোলির পাহাড়ে, বাঙ্গালী-বাবার আশ্রমে আমি যে যোগী পুরুষের মধ্যে দেখেছিলাম অলৌকিক ক্ষমতা, সেটা আমার কাছে আজও বিশ্বাস্য নয়। আমাকে সম্মোহিত করে তিনি হয়তো প্রতারণা করেছেন, আজও এমন কথাই বার বার মনে আসে।

আমি নিজে যোগ করি। অবশ্য এ যোগ অধ্যাত্ম সত্য জানার জন্য নয়। এ যোগ রোগমুক্তির জন্য। এতে যে পরিপূর্ণ ফল পেয়েছি তা নয়। তবে আংশিক রোগমুক্তি ঘটেছে নিশ্চয়ই। দেহের স্নায়ু তন্ত্রীগুলি শক্ত হয়েছে। ব্রহ্মচর্য পালন সহজ হয়েছে। এ যোগকে আমি যোগ বলি না। বলি এক ধরনের ব্যায়াম। এতে স্নায়ুতন্ত্রীতে কাজ হয়, মাংস পেশীতে কাজ হয়। মাংসগ্রন্থি থেকে যে রস নিঃসৃত হয় তা দেহে আনে বিশেষ এক ধরনের পুষ্টি। কিন্তু এ যোগের সঙ্গে তন্ত্রযোগ বা পতঞ্জলি যোগের কোন মিল আছে বলে মনে হয় না। স্থুল দেহকে নিয়ন্ত্রিত করলে সূক্ষ্ম দেহ নিয়ন্ত্রিত হয়, এটা যেন কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না। যদিও স্থুল দেহ সুস্থ হলে মনের কিছুটা সাম্য আসে, তবু মনের বাসনা কামনা এতেই রহিত হয়ে যায় এরকম বোধ হয় না। অলৌকিক যোগশক্তির ক্রিয়া এক ধরনের মেসমেরিজম

বলেই আমার ধারণা। তন্ত্রযোগে যত যোগের কথা লেখা আছে মানবদেহের পক্ষে তা অনুসরণ করা সম্ভব বলে আমার বিশ্বাস নয়। যোগ সম্পর্কে পড়াশুনা করেও আমি তাই দোদুল্যমানতায় ভুগছিলাম।

আমার এক বন্ধু আমার মুখে মেসমেরিজম কথাটা শুনে বললেন, মেসমেরিজমও এক ধরনের যোগ। একে বলে যোগনিদ্রা তত্ত্ব। তিনি এর উপর এক প্রস্থ বক্তৃতাও দিলেন। বিজ্ঞানের সাহায্যে তিনি আমাকে জিনিসটা বোঝাবার চেষ্টা করলেন। বললেন, পৃথিবীর কোন কোন জায়গায় একধরনের পাথর পাওয়া যায়, যে পাথরগুলি লোহা পেলেই টেনে ধরে। এই টেনে ধরার ক্ষমতাটা পাথর যে কোথায় পেল, কি করে পেল, এ রহস্য ভেদ করা যায়নি এখনও। এই পাথরকে বলে চুম্বকপাথর। এর আকর্ষণকে বলে চুম্বকাকর্ষণ। এর যে শুধু এই টানবার গুণ আছে তাই নয়, আছে আর একটি গুণও। এই পাথরের পাশে যদি কিছুক্ষণ একটা লোহাকে রাখা যায় তাহলে লোহাটার মধ্যেও চুম্বকের গুণ হয়। লোহাটাকে যদি ঐ পাথরের উপর বা কাছাকাছি কোথাও একটা কাঁটার উপর যায় রাখা তাহলে লোহাটা উত্তর দক্ষিণমুখ হয়ে থাকে সব সময়।

ডাক্তার মেসমার নামে এক সাহেব মানুষের শরীরেও নাকি এই ধরনের আকর্ষণী ক্ষমতা দেখেছেন। তাঁর মতে একটা মানুষের শরীরও টানতে পারে চুম্বকপাথরের মত আর একটা মানুষের শরীরকে। চুম্বক পাথরের গুণ যেমন লোহায় গিয়ে পৌঁছে লোহাকে প্রভাবিত করে, তেমনই একটি মানুষের গুণও অপর মানুষে গিয়ে তাকে প্রভাবিত করতে পারে। তবে চুম্বকপাথর যেভাবে লোহাকে দৈহিকভাবে কাছে টেনে নিয়ে যায়, মানুষের আকর্ষণ মানুষকে ঠিক তেমন ভাবে প্রভাবিত করে না। তবে আকর্ষণ যে হয় সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

চুম্বকপাথরের আরও একটি গুণের কথা তিনি আমাকে বললেন: তার যেমন আকর্ষণ আছে, তেমনই বিকর্ষণের গুণও আছে। এই আকর্ষণী ও বিকর্ষণীশক্তির কার্যপ্রণালী এক হলেও প্রকৃতি একটু স্বতন্ত্র।

যদিও চুম্বকপাথরের দুই প্রান্তেই আকর্ষণী ক্ষমতা আছে তবু তা কাজ করে একটু পৃথক ভাবে। বন্ধুটি নিচে যে ভাবে এঁকে দিচ্ছি সেই ভাবে দুটি ডায়াগ্রাম এঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন আমাকে :

[ক খ

গ ঘ

ধরা যাক ক-খ ও গ-ঘ দুটি চুম্বক। ক-খ চুম্বকের-খ দিকটি যদি কোন লোহার চাবির কাছে আনা যায় তবে দেখা যাবে চাবিটি আকর্ষিত হয়ে চুম্বকের গায়ে লেগে গিয়ে ঝুলছে। এর পরে ক-খ চুম্বকের উপর গ-ঘ চুম্বকটিকে যদি ক-এর দিকে গ ও খ-এর দিকে ঘ এই ভাবে রাখা যায়, তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, দুটি চুম্বক একত্র হয়ে দুয়েরই আকর্ষণী ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু যদি ঐ চুম্বকের মুখ ঘুরিয়ে দুই দিক এক করা যায় অর্থাৎ যদি ক-খ চুম্বকের ক-এর দিকে গ-ঘ চুম্বকের ঘ-দিক ও খ-এর দিক গ-এর দিক রাখা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, চাবিটি সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যাবে। চুম্বক আর কিছুতেই লোহাকে টানবে না। এ থেকেই বোঝা যায় যে, চুম্বকের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করার দুই ক্ষমতাই আছে। মেসমার সাহেবের মতে মানুষের শরীরেও আছে ঐ ধরনের গুণ। এই ধরনের ক্ষমতা মানুষের শরীরে আছে বলেই মেসমেরিজম করে তাকে আকর্ষণ করে ঘুম পাড়ানো যায়।

তবে মেসমেরিজমের জন্য যে শুধু চুম্বকী আকর্ষণই আছে তা নয়, আছে বৈদ্যুতিক আকর্ষণও। বৈদ্যুতিক আকর্ষণ যে ভাবে কাজ করে তা এই রকম :

বৈজ্ঞানিকরা মানবদেহের আকর্ষণী শক্তির নাম দিয়েছেন **animal magnetism.** মেঘের আকাশে আমরা যেমন বিদ্যুৎ দেখি সেই রকম

বিদ্যুৎশক্তি নাকি আছে পৃথিবীর সব জিনিসেই। কোনটাতে আছে বেশি পরিমাণে, কোনটাতে কম। জগতের সমস্ত পদার্থে এই যে অজ্ঞেয় তেজ বিরাজ করে একেই বলে তড়িৎ। এই তড়িৎশক্তি আজ সমগ্র বিশ্বে শিল্পবিপ্লবের পথে অঘটন ঘটিয়েছে।

চুম্বকের মত তড়িতেরও আছে দুটো গুণ, যেমন, আকর্ষণী ও বিকর্ষণী ক্ষমতা। ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন **Positive** ও **Negative** ক্ষমতা। **Positive** জাতীয় তড়িতের সঙ্গে **Positive** জাতীয় তড়িতের যোগ হলে এর আকর্ষণী ক্ষমতা বেড়ে যায়। **Negative** জাতীয় তড়িতের সঙ্গে **Negative** জাতীয় তড়িতের যোগ হলে আকর্ষণের ঠিক বিপরীত কাজ হয়। এতে বিকর্ষণী ক্ষমতা জন্মে।

তড়িতের আরও একটি বিশেষ গুণ আছে। কাছাকাছি দুটো জিনিসে অসমানভাবে সে থাকতে পারে না। অর্থাৎ দুটি জিনিস কাছাকাছি থাকলে তার কোন একটাতে যদি বেশি পরিমাণ তড়িৎ থাকে তাহলে যেটিতে কম পরিমাণ তড়িৎ থাকবে বেশি পরিমাণ তড়িৎশক্তিসম্পন্ন জিনিসটি থেকে কিছু তড়িৎ কম তড়িৎসম্পন্ন জিনিসটিতে চলে যাবে। দুটিতেই তখন তড়িতের পরিমাণ সমান হবে। মেঘের বুকে যে বিদ্যুৎ দেখি তাও এই কারণে। একখণ্ড মেঘে যদি বেশি তড়িৎশক্তি থাকে, তবে কম তড়িৎশক্তিসম্পন্ন আর এক খণ্ড মেঘ কাছ দিয়ে যাবার সময় বেশি তড়িৎসম্পন্ন মেঘ থেকে কিছু তড়িৎ চলে যায় কম তড়িৎসম্পন্ন মেঘে। এই চলে যাবার সময়ই আমরা দেখি বিদ্যুৎ চমকানো। দুটি মানুষের মধ্যে তড়িৎশক্তিও এইভাবেই কাজ করে।

মানুষের যে অনুভূতি হয় সেটা তার দেহের তড়িৎশক্তির জন্যই। এই তড়িৎশক্তির সাহায্যেই চোখ, কান, নাক ইত্যাদি কাজ করে। মাথার সঙ্গে মানুষের মনের সম্পর্ক খুব নিকট। ব্রেনে মানসিক কার্যকলাপের প্রভাব তড়িৎতরঙ্গই দেহে পৌঁছে যায়। আর এই মাথা থেকেই হাজার হাজার শিরা উপশিরা মানুষের সারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ

ছেয়ে আছে। এই শিরার ভেতর দিয়ে রক্ত চলাচল করে। তবে সব শিরার মধ্য দিয়ে তা চলে কিনা বলা যায় না। এমন সব সূক্ষ্ম শিরা আছে দেহের মধ্যে, যাদের মধ্য দিয়ে রক্ত চললেও তা দেখার সাধারণ কোন উপায় নেই। তবে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা, রক্ত নয় এর ভিতর দিয়ে চলে দেহের তড়িৎপ্রবাহ। এই তড়িৎপ্রবাহই জীব-দেহের জীবনশক্তি। এই তড়িৎপ্রবাহে বিদ্যুতের দুটি গুণই আছে বলে মানুষের পক্ষে মেসমেরিজম সম্ভব।

মেসমেরিজম হল একজন মানুষের দেহের তড়িৎশক্তির অপর মানুষের দেহে অনুপ্রবেশ। তবে এক মানুষের দেহ থেকে অন্য মানুষের দেহে তড়িৎপ্রবাহের প্রবেশ চুম্বকপাথর ও লোহার মধ্যে তড়িৎপ্রবাহের কাজের মত প্রত্যক্ষ করা যায় না। তবে মেসমেরিজম করার সময় এক জনের বেশি তড়িৎশক্তি অপরের দেহের মধ্যে ঢুকলে যার দেহে তা ঢুকে যায় তার জ্ঞান হারিয়ে যায় বা সে সম্মোহিত হয়ে পড়ে। বিদ্যুৎ মানুষের শরীরে ঢুকলে যেমন হয় ঠিক যেন তেমন অবস্থা। তবে একটি মানুষের দেহে এত তড়িৎশক্তি থাকে না যে, অপরের দেহে তা ঢুকলে সে জন্য তার মৃত্যু হবে। এই জন্য মেসমেরিজমে মানুষের মৃত্যু হয় না। কিন্তু কম তড়িৎসম্পন্ন লোক বিহ্বল হয়ে পড়ে এতে। যাদের তন্ত্রীমণ্ডলী বা **nervous system** দুর্বল তারাই মেসমেরাইজড হয়। তন্ত্রীমণ্ডলীতে তড়িতের ঘাটতি হলেই লোকে দুর্বল হয়ে পড়ে। বলশালী দেহে তড়িৎ বেশি থাকে, দুর্বল দেহে কম। মেয়েদের দেহ অপেক্ষা পুরুষের দেহে তড়িৎশক্তি বেশি থাকে বলে মেয়েরা স্বাভাবিকভাবেই পুরুষের বশবর্তিনী হয়। পুরুষরা মেয়েদের সহজেই মেসমেরাইজ করতে পারে।

পরকে যেমন মেসমেরাইজ করা যায়, তেমনি নিজে নিজেও মেসমে-রাইজড হওয়া যায়। যোগাঙ্গে নানা ধরনের ন্যাসের ব্যবস্থা হয়েছে এই কারণেই। যোগের সাহায্যে দেহকে এমনভাবে তৈরি করা যায় যে, বাহির থেকে তড়িৎশক্তি নিজের দেহের মধ্যে টেনে আনা যায়। তবে

এটা অত্যন্ত কঠিন কাজ। যখন এধরনের শক্তি কেউ অর্জন করেন, তখনই তিনি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন। এই ক্ষমতা অর্জনের জন্য তিনটি বিষয় শিক্ষা করা প্রয়োজন, যেমন, মনস্থির করা, বাইরের জিনিস থেকে তড়িৎ আহরণ করা, এবং বার বার অভ্যাস করা। যিনি মনস্থির করতে পারবেন না, বা যিনি অস্থিরচিত্ত হবেন, তাঁর পক্ষে এ ধরনের অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা অসম্ভব। জগতে মহৎকার্য করেছেন তাঁরাই যাঁরা হতে পেরেছেন স্থিরচিত্ত।

মনস্থির করা যোগের সাহায্যে সম্ভব। মনস্থির হলে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা কঠিন নয়। মন যখন স্থির হয়, একটি বিশেষ বস্তুতেই নিবদ্ধ হয়, তখন তা থেকে তড়িৎ আকর্ষণ করা খুব একটা কষ্টের ব্যাপার নয়। যখন বাইরের জিনিস থেকে তড়িৎশক্তি নিজের ভেতরে আনতে আরম্ভ করেন সাধক, তখন যে-শক্তি দ্বারা তা করা হয় তাকে বলে ইচ্ছাশক্তি।

ইচ্ছাশক্তি বাড়ে কি ভাবে? এটা বাড়ে অভ্যাস ও চর্চার দ্বারা। মনকে স্থির করে অন্যসব জিনিস থেকে সরিয়ে নিয়ে অভীষ্ট বিষয়ের উপর ফেললে মন যা চায় সেই অনুপাতেই কাজ হয়। অনন্যমন হয়ে কোন জিনিসে চিন্তাকে আকৃষ্ট করলে, অর্থাৎ তা থেকে তড়িৎশক্তি আহরণ করা হতে থাকলে এক ধরনের অচৈতন্য অবস্থা আসে। তখন অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়। বহু দূরের জিনিস মনের চোখের উপর ভেসে উঠতে থাকে। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সব স্পষ্ট হয়ে যায়। যোগশাস্ত্রে একেই বলে যোগনিদ্রা। যোগাভ্যাসে যদি শক্তি আয়ত্ত হয় তবে তা চিরকাল যোগীর সঙ্গে থেকে যায়।

প্রশ্ন হল, যোগে কি সত্য সত্যই এমন করা সম্ভব? বন্ধুটি আমাকে একখানি বই দিয়ে বললেন: পড়ে দেখ, এতে মনঃসংযোগের উপর আলোচনা আছে। কি করে মনঃসংযোগ করতে হয় তা লেখা আছে। যৌগিক প্রক্রিয়ার অত্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ এগুলো। যে-কোন লোক অল্প দিন অভ্যাস করলেই এটা আয়ত্ত করতে পারে। পড়তে লাগলাম বইটি। বইয়ের নাম **Yogic Cure for Common**

Diseases. লেখকের নাম ডঃ ফুলগেন্দ সিন্‌হা। ডঃ সিন্‌হার ধারণা, রাজযোগের প্রাথমিক পর্যায়ই হল মনঃসংযোগ। এর পরবর্তী অধ্যায়ই হল ধ্যান। এই মনঃসংযোগ কি? এবং এর ফলই বা কি? মনঃসংযোগ অর্থ একটি ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে মন দেওয়া। এ অভ্যাস যিনি করেন, তিনি মনের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে পারেন। মনের অস্থিরতা দূর হয়, নানা বিভ্রান্ত চিন্তায় মন বিক্ষিপ্ত হতে পারে না। মন তখন বিশেষ লক্ষ্য স্থির করে এগুতে পারে সেই দিকে। অর্থহীন নানা চিন্তা, যা মনকে বিভ্রান্ত ও দুর্বল করে, তা চলে যায়। উপযুক্ত শিক্ষা নিয়ে যখন এই শক্তি অর্জন করা যায় তখন মনের যত রোগ, যত দুর্বলতা সব দূর হয়।

মন ঠিক হলে দেহ ঠিক হয়। কেন হয়? কারণ দেহের সঙ্গে মনের সম্পর্ক নিবিড়। সুতরাং মনকে যদি বাঁধতে হয়, জানতে হবে দেহ মনের সম্পর্ক। মনের স্বভাবই কোন কিছুর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করা। বিশেষ বিশেষ সময়ে মন চিন্তা করে বিশেষ বিশেষ জিনিস নিয়ে। কেউ করতে পারে বিশেষ জিনিস নিয়ে বেশিক্ষণ চিন্তা, কেউ বা পারে কম। তবে মন যে কি জিনিসকে আঁকড়ে ধরে চিন্তার জাল বুনতে থাকবে, তা বলা অসম্ভব। মনের চিন্তা দেহের মধ্যেও তৈরি করে বিশেষ এক রকমের অবস্থা। চিন্তার বিষয় যেমন, দেহের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়াও তেমনি। বিষয় যদি হয় ক্রোধের, দেহের মধ্যে প্রতিক্রিয়াও হয় তেমনি। স্নায়ুতন্ত্রী উত্তেজিত, হয় হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়, দেহ উত্তপ্ত হয়, এবং মেজাজ ক্ষিপ্ত হয়। মনের বিশৃঙ্খলা যদি দূর করা না যায় তবে এসব থেকে তাকে মুক্ত করা অসম্ভব। হয়তো যাচ্ছি কোন গুরুতর কাজে, হয়তো করতে যাচ্ছি কোন লেখাপড়ার কাজ, কোন ঘটনায় মন যদি উত্তেজিত হয়ে যায়, তাহলে নিবিড়চিত্ত হয়ে সে কাজে মন দেওয়া অসম্ভব। ফলে যে ফল আশা করছি সে কাজ থেকে তা মিলবে না। কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা যদি মনকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় তা হলে যে কাজের যে ফল তা বেশি করে পাওয়া

যাবে। এই যে মনঃসংযোগ, মন নিয়ন্ত্রণ, এর জন্য চাই চেষ্টা আর প্রস্তুতি। একটি অতি সাধারণ চেষ্টার কথা বলেছেন ডঃ সিন্‌হা, যা এই রকম :

ঘরের একটা টেবিলের উপর রাখা যাক একটি ফুলের পাত্র। এমন উঁচুতে রাখা যাক, যাতে চোখের দৃষ্টির সঙ্গে সমান্তরাল হয় পুষ্প পাত্রটি। ফুলের পাত্রে একতোড়া ফুল রাখা যাক, কিংবা একটিমাত্র ফুল। গাছের ফুলও হতে পারে কিংবা কৃত্রিম প্লাস্টিকের। আসনকারী থেকে ফুলের দূরত্ব হবে পাঁচ ফিটের মত।

ফুল সামনে রেখে বসা যাক পদ্মাসনে। কোলের উপর বাঁ হাত রেখে, হাতের তালুর উপর রাখা যাক ডান হাত। দেহ হোক ঋজু, স্নায়ুমণ্ডলী স্বাভাবিক, যেন শক্ত না হয় কোথাও। দেহের ভার ছেড়ে দিয়ে হতে হবে সহজ। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস হবে স্বাভাবিক। এ আসন হল সুখাসন। এই সুখাসনে বসে তাকাতে হবে ফুলের দিকে। দশ সেকণ্ডের মত তাকিয়ে থাকা যাক ফুলের দিকে চোখের পাতার পলক না ফেলে। দশ সেকণ্ড তাকিয়ে থাকার পর চোখের পাতা বোজা যাক। মানস নেত্রে এবার দেখা যাক ফুলটিকে, যেমন দেখা গিয়েছিল চর্মচক্ষুতে ঠিক তেমন ভাবে। যে দশ সেকণ্ড চোখ মেলে দেখা গিয়েছিল সেই দশ সেকণ্ডই চোখ বুজে দেখা যাক ফুলটিকে। দশ সেকণ্ড চোখ বুজে থেকে আবার তাকানো যাক ফুলের দিকে দশ সেকেণ্ড। আবার দশ সেকণ্ড চোখ বুজে মানসনেত্রে দেখা যাক ফুলটিকে। প্রথম সপ্তাহে পাঁচবার করা যাক এমনি ভাবে। তারপর সংখ্যা বাড়িয়ে করা যাক দশ এবং পনের। তবে পনের বারের বেশি ডঃ সিন্‌হার মতে যাওয়া অনুচিত।

এটা অভ্যাস করা হয়ে গেলেও আরও কিছুক্ষণ বসে থাকতে হবে স্থির হয়ে। এবার দেহকে ভারমুক্ত করে বসে থাকতে হবে দু' মিনিট। এর পর আবার স্বাভাবিক কাজকর্ম।

দু' মাস অভ্যাস করার পর কেউ যদি মনে করে যে, ফুল নয়, অন্য

জিনিস সে রাখবে চোখের উপর, রাখতে পারে। তবে যা-ই রাখা যাক না কেন, সেটি যেন খুব বড় না হয় বা খুবই ছোট না হয়। মাঝামাঝি আকৃতি হলেই ভাল হয়। আর তাতে যেন রঙ থাকে, এবং সে রঙ যেন উগ্র না হয়ে স্নিগ্ধ হয়। দৃষ্টির বিষয় যেন হয় আনন্দদায়ক।

কিন্তু সহজ হলেও ব্যাপারটা তেমন সহজ নয়। এজন্য সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। সাবধান হতে হবে সময়ের ব্যাপারে। সময় যেন বর্ণিত সময়ের অনেক বেশি না হয়। তবে যিনি শিক্ষা দেবেন, তিনি যদি বোঝেন যে, আসনকারী আরও বেশি সময় দিতে পারেন, তাহলে আলাদা কথা।

সময়ের এই সীমা কেন? কয়েকটা ভাল কারণের জন্যই। আসনকারী মনের চোখে কিছু বিচিত্র চিত্র দেখে আকৃষ্ট হতে পারেন। ফলে তা দেখবার জন্য আকৃষ্ট হয়ে সময় নষ্ট করতে পারেন। অযথা মূল উদ্দেশ্য থেকে তিনি সরে যেতে পারেন। এমন কি তার চিন্তা, কাজকর্ম ও ব্যবহারও পাল্টে যেতে পারে। যাতে ক্ষতিকর কোন ফল না হয়, এজন্যই সময়সীমা বেঁধে দেওয়া।

আসন অভ্যাস করে মনঃসংযোগ হয়েছে কিনা, তা জানবারও উপায় আছে। যখন মনের চোখে বাস্তব চোখে দেখা জিনিসটি দেখা যায় না, তখন বুঝতে হবে যে মনঃসংযোগ হয় নি। যখন অভীষ্ট বিষয় ছাড়া আরও অন্যান্য জিনিসও মানস চোখে ভেসে উঠছে, বুঝতে হবে যে, মনঃসংযোগে সামান্য উন্নতি হয়েছে, সবটা হয় নি। শুধুমাত্র যদি অভিলষিত জিনিসটিই দেখা যায়, তা হলে অল্প সময়ের জন্য হলেও বুঝতে হবে যে, মনঃসংযোগ হয়েছে। অভীষ্ট জিনিস যদি মনের চোখে পাঁচ সেকণ্ডও থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে, মনঃসংযোগ হয়েছে ভালই। দশ সেকণ্ড মনের চোখে যদি ধরে রাখা যায় অভীষ্ট চিত্রটি তাহলে বুঝতে হবে যে, মনঃসংযোগ হয়েছে বেশ উঁচু পর্যায়েরই। মনঃসংযোগ হলে মনের দুর্বলতা যাবে, যাবে বিশৃঙ্খলা। জীবন হবে সুস্থ ও স্বাভাবিক।

মনঃসংযোগের এই কথা শুধুমাত্র কি তত্ত্ব, না অভ্যাস করলে সত্যিই পাওয়া যায় ফল? কানাড়া ব্যাঙ্কে কাজ করেন, আমার প্রতিবেশী মাদ্রাজী এক ভদ্রলোক। নাম R. Ramanam. বললেন, তিনি ফুলগেন্দ সিন্‌হার বই অনুসরণ করে সত্যি সত্যিই ফল পেয়েছেন। মন ছিল তার বড়ই বিশৃঙ্খল আর বিক্ষিপ্ত, এখন তা নেই। উত্তেজিত হয়ে পড়তেন সামান্য কারণে, এখন আর হন না। জানি না, তবুও কেন যেন একটা 'তবু' থেকে যায়। কয়েক সেকণ্ড কেন, কয়েক মিনিটও আমি আমার মনের চোখে ধরে রাখতে পারি অভীষ্ট চিত্র সামনে কোন চিত্র না থাকলেও কল্পনায় মনের দুয়ারে টেনে আনতে পারি তার চিত্রকল্প। তবু মনে হয় না, সুশৃঙ্খল মনের আমি অধিকারী। তাহলে? মনঃসংযোগ হলেও কেন মন শান্ত হয় না। আরও হয়তো বেশি দরকার, আরও হয়তো অভ্যাস দরকার, কিংবা আরও কিছু রহস্য আছে, যা জানার জন্য চাইই নতুন গুরু?

গুরু কে? যার কাছ থেকে শেখা যায়, তিনিই গুরু। শুধু মানুষ নয়, পশুপাখিও গুরু। চোখে দেখা অনেক ঘটনার বিশ্লেষণ করলেই তা থেকে নানা শিক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু মহামুক্তির পথের গুরু একটু ভিন্ন ধরনের। তাঁকে পাওয়া গেলেও ধরা যায় না। তিনি অলৌকিক ক্ষমতা দেখালেও তা বিশ্বাস্য মনে হয় না। সুতরাং অস্থির মন নিয়ে রহস্য সন্ধানের জন্য ব্যাকুলতা আমার থাকলই।

কোথায় যে কার সন্ধান মেলে বলা ভার। একবার যাচ্ছিলাম কালীঘাট শ্মশানের পাশ দিয়ে। দেখি একটা লোক হাত দেখছে, পারিশ্রমিক আট আনা, এক টাকা। পাশে দাঁড়িয়ে আর একটি লোক দেখছে। লোক না বলে পাগলাটে ধরনের লোক বলাই ভাল। সে ক্ষেপে যাচ্ছিল গণৎকারের হাত দেখার রীতি দেখে। পাশে দাঁড়ানো আমার হাতটা টেনে নিয়ে হঠাৎ সে বলল, ও কিচ্ছু জানে না। এই যে তোমার হাতের গোড়ার আঙুলের প্রত্যেকটি গাঁট, এর এক একটি গাঁটের

দূরত্ব জানবে পঁচিশ বছর করে। গাঁটের গোড়া দিয়ে শিররেখার দৈর্ঘ্য যে কয় গাঁট পর্যন্ত মানুষের পরমায়ু হল ততদূর। শিররেখায় যেখানে ছেদ সেখানে আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুযোগ। যে জায়গাটায় রেখা উর্ধ্বগতি, সেখান থেকে উন্নতি যোগ। পরে মিলিয়ে দেখেছি লোকটির কথা, সত্যিই খাটে। সেই থেকে আমি একজন হস্তরেখা বিশারদ বলে অনেকেরই ধারণা।

সন্ন্যাসী খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, বনে নয়, তীর্থে নয়, কোন আশ্রমেও নয়, খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম মনে মনে অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা করছিলাম। হঠাৎ আকস্মিক ভাবেই একদিন কালীঘাটে একটি লোকের দেখা পেয়ে গেলাম। লোকটির পরনে সন্ন্যাসীর বেশ নেই, নেই ভদ্রলোকের বেশও। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের বেশভূষা। বার বার তাকিয়ে দেখছিল আমাকে। আমি তেমন কোন মূল্য দিই নি প্রথমটা বরং তাকিয়ে দেখছিলাম একজোড়া সাহেব মেমকে। কোন গাইড তাঁদের ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছিল ৺কালীমূর্তি। হাসি পাচ্ছিল ব্যাখ্যা শুনে। শাক্তধর্মের এমন অপব্যাখ্যা নেই বোধহয় পুরাণের মত কোন অপদার্থ গ্রন্থেও। এই হল তীর্থ এবং তীর্থের ধারক এবং বাহকেরা। এদের হাতেই দায়িত্ব পড়েছে আমাদের ধর্মরক্ষার। এইজন্যই আমার ধারণা, তীর্থক্ষেত্রে যত আছে ব্যবসা, ততই যথার্থ ধর্মের অভাব, ততই অধ্যাত্মতার অভাব।

বিতৃষ্ণা নিয়ে মনে মনে যখন ভাবছিলাম, বিরক্ত হয়ে 'ফিরব' 'ফিরব' করছিলাম, ঠিক তখনই আমার নজর পড়ল সেই ভিখারী ব্রাহ্মণের মত লোকটির দিকে। এবার হাত তুলে ইশারা করে আমাকে সে ডাকল। এমন অনেক দুঃসাহসী ভিক্ষুক আমি দেখেছি যারা দরজার কড়া নেড়ে দরজা খুলিয়ে ভিক্ষা চায়। হাত দিয়ে ইশারা করে কাছে ডেকে ভিক্ষা প্রার্থনা করে। তেমনি কিছু ভেবেছিলাম আমি। এগিয়ে যাবার খুব ইচ্ছে যে ছিল, তাও নয়। তবু বিশেষ একটা দর্শনে আমি বিশ্বাস করি, বিশেষ একটি বাক্যে, যে বাক্যের নাম, 'সেখানে দেখিবে

ছাই উড়াইয়া দেখ তাই' ইত্যাদি। হয়তো লোকটা সাধারণ না হয়ে অসাধারণও হতে পারে, হয়তো কিছু দিতেও পারে, এই ভাবতে ভাবতেই এগিয়ে গেলাম।

খোঁচা খোঁচা দাড়ি, গা ভর্তি ময়লা। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে খানিকটা হ্যাঁ হ্যাঁ করে হাসল। তারপর আপন মনেই আমার মুখের দিকে খানিকটা কি দেখে নিয়ে বলল, আছে তো অনেকটাই, তার প্রকাশ কই? দেহ তো নিয়ন্ত্রণ করেছিস অনেকটাই তবু দেহের সম্পদ কই?

আপন মনে বিড়বিড় করছে লোকটা। বললাম, কি বলছেন?

লোকটি বলল, আরও একটু যে চাই রে?

—কি চাই?

—যা খুঁজছিস, তা পেতে হলে আর একটু বেশি চাই।

—কি খুঁজছি?

দেখলাম হাতে একটা খড়িমাটি ছিল লোকটার—তা দিয়ে সে একটা সাপ আঁকল।

আমি আশ্চর্য! এইবার পাশে গিয়ে বসলাম।

লোকটি বলল, যোগ পড়ছিস, যোগ করছিস, কিন্তু আসল যোগ এখনও হয় নি।

—কি যোগ?

—কুণ্ডলিনী যোগ।

লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম অবাক হয়ে।

লোকটি তাঁর হাত দিয়ে আমার হাতটা ছুঁলো। সাপের গায়ের মত ঠাণ্ডা শীতল হাত, সারাটা দেহ যেন আমার শিরশির করে উঠল।

লোকটি বলল, দেহ তৈরি হচ্ছে, কিন্তু আরও লাগবে। দেহ নাড়লে যা হয় তা ব্যায়াম, যোগ নয়। দেহের ভিতর বায়ু নড়াচড়া করলে তবেই যোগ হয়। চেষ্টা কর, হবে নিশ্চয়ই একদিন। বুঝেছিস ঠিক,

কিন্তু অনুভব করিস নি এই যা। তবে নিষ্ঠা নিয়ে এগিয়ে গেলে পারবি একদিন।

আমার মুখের দিকে আবার খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে বলল,

—চোখে দেখলেও বিশ্বাস নেই কেন, বল্ তো?

বললাম, ঠিক বুঝতে পারি না বলেই বোধহয় অবিশ্বাস।

সে বলল, নিজে অনুভব না করলে বিশ্বাস হয় না। অনুভব করবার চেষ্টা কর।

—অনুভব করব কিভাবে?

—কেন, যোগের মাধ্যমে! যোগ সম্পর্কে তো পড়ছিস, তবু কেন বিশ্বাস হয় না?

বললাম, গুরু ছাড়া এ যোগ হবে কি?

আবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল লোকটি। তারপর বলল, হবে, গুরু হবে, তবে একটু দেরিতে। আগে সাধারণ যোগ করে মন ঠিক কর, তারপর গুরুর দেখা।

কিছু হয়তো ভাবছিলাম আমি অন্যমনস্ক হয়ে। সে বলল, বোস্। আরও একটু কিছু দেখে যা।

—কি?

—একটা চক্র তো দেখেছিস, আর একটা চক্র দেখে নে?

আমি তার মুখের দিকে বাক্য হারিয়ে তাকিয়ে থাকলাম।

লোকটি একটু হাসল, হেসে খড়িমাটি দিয়ে একটা চক্র আঁকল মেঝেতে। আমি চক্রটি তাকিয়ে দেখলাম:

লোকটি একটি পদ্ম আঁকল। পদ্মের ছয়টি দল। এক একটি দলের উপর লিখল লং, বং, ভং, মং, যং, এবং রং। পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে আঁকল অর্ধচন্দ্রযুক্ত ও আটদল বিশিষ্ট পদ্মাকার এক অম্ভোজমণ্ডল। তার মধ্যে লিখল বং। এই বং লেখা হল মকরের উপর। যেন হাতে হয়েছে পাশ। এর কোলে গরুড়ের উপর আঁকা হল শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ এক মূর্তি। পদ্মের কর্ণিকাতে আর একটি পদ্মের

উপর আঁকা হল একটি দেবী মূর্তি, যাঁর চার হাত, তিনটি চোখ ও বাঁকা দাঁত। দেখতে যেন ভয়ঙ্করী। চক্রটি দেখতে অনেকটা এইরকম :
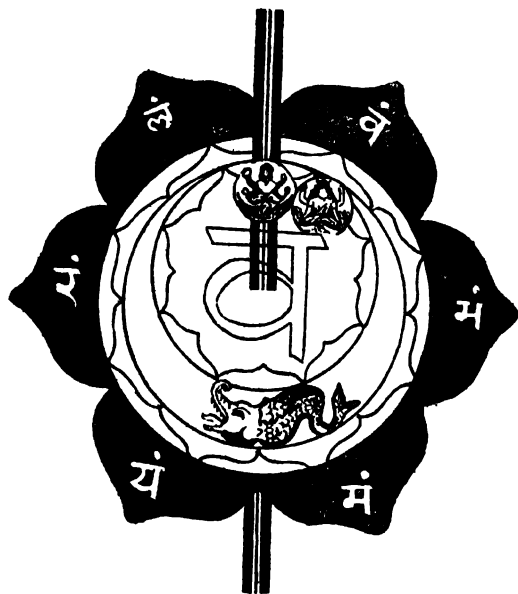
বললাম, এটা কি ?

সে বলল, কেন রে, এ-সম্পর্কে তো পড়াশুনা করেছিস, মনে নেই ?

মনে হল তন্ত্রগ্রন্থের স্বাধিষ্ঠান চক্র যে ভাবে আঁকা এ যেন সেইরকম ?

হাসতে হাসতে লোকটি বলল, স্বাধিষ্ঠান চক্রের মতন কিরে এই চক্রই তো স্বাধিষ্ঠান !

আশ্চর্য ! মনের কথা দেখি স্পষ্ট করে জানতে পারে লোকটা। অবাক হয়ে আবার তার মুখের দিকে তাকালাম ?

সে বলল, কিরে ! এ-সবের অর্থ কি, তাই জানতে চাস্ ?

—হ্যাঁ।

সে বলল, এ-সব আসলে তো আর কোন চক্র নয়, বা পদ্ম নয় ; দেহের মধ্যে এক একটি অঞ্চলে যে সব উপাদানের প্রাধান্য তারই প্রতীক। যেমন ধর, মূলাধারে অস্থি ধাতুর প্রাধান্য, স্বাধিষ্ঠানে মেদ ধাতুর, মণিপুরে মাংসের, অনাহতে রক্তের, বিশুদ্ধ চক্রে ত্বকের আর আজ্ঞাচক্রে মজ্জার। জীবের ক্রিয়া এইসব চক্রের যে-স্তরে বেশি ক্রিয়াশীল তার মানসিক বৃত্তি ও চালচলনও তেমনই। যেমন, মূলাধার যার বেশি ক্রিয়াশীল তার মধ্যে স্থূলবৃত্তিই প্রবল। কারণ বস্তুকে কেন্দ্র করেই মূলাধার। এর তত্ত্ব বা উপাদান হল পৃথ্বী অর্থাৎ ঘনীভূত পদার্থ। ঘনীভূত পদার্থের গুণই এখানে ক্রিয়াশীল। যেমন, পৃথ্বীর তন্মাত্র বা সূক্ষ্ম উপাদান হল গন্ধ। এখানে তাই ঘ্রাণেন্দ্রিয়ই বেশি 'ক্রয়াশীল। কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে 'পা' বা পাদেন্দ্রিয়ই বেশি ব্যস্ত, কারণ পৃথিবীতে পা রেখেই আমরা চলিফিরি।

সৃষ্টি যেমন ধাপে ধাপে বস্তুর অতীত কিছু থেকে ধীরে ধীরে বস্তুর আকার নিয়েছে চক্রগুলো হল সেই নানা স্তরের বা ধাপের প্রতীক। যত নিচে, চক্রের চরিত্র তত স্থূল, যত উর্ধ্বে তত সূক্ষ্ম। সুতরাং মূলাধার চক্রে চেতনা ঘোরাফেরা করলে মন থাকে স্থূল পর্যায়ে।

মূলাধারের উপরে এই যে স্বাধিষ্ঠান চক্র, এর ভৌত উপাদান পৃথ্বী থেকে আরও সূক্ষ্ম। মূলাধারের মৃত্তিকা ঘন বস্তু, স্বাধিষ্ঠানে আরও কম স্থূল উপাদান, যেমন জল। জলের রং জানা না গেলেও অস্তিত্ব অনুভব যায় করা। জল তরল, ঘন নয়। কোন আধারে না রাখলে তাকে দেখারও উপায় নেই। তাকে বুঝবার উপায় একমাত্র আস্বাদন বা অবগাহন। এইজন্য স্বাধিষ্ঠান চক্রের উপাদান হল অপ্। এর তন্মাত্র হল রস। আস্বাদন ও স্পর্শ দ্বারাই তার অস্তিত্ব বোঝা যায়। 'পাদ' ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যেমন বোঝা যায়, পৃথ্বী, তেমনই পাণি দ্বারা বোঝা যায় অপ্‌কে। সেইজন্য অপের কর্মেন্দ্রিয় হল পাণি। জল খেলেও হাত দিয়ে তুলে তবে খেতে হবে। বুঝতে হলেও হাত দিয়ে ছুঁয়ে তা বুঝতে হবে, বুঝেছিস ?

লোকটি আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললাম, অনুমান করতে পারি। মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠান চক্রের উপাদানের কথা তো বললেন, আর অন্যান্য উপাদান? অন্যান্য চক্রের তত্ত্ব?

লোকটি বলল, সেই চক্রে যখন আসবি তখন তার তত্ত্ব জানবি, এখন স্বাধিষ্ঠান চক্র সম্পর্কেই জেনে নে।

—'বলুন' সাগ্রহে লোকটির মুখের দিকে তাকালাম।

সোকরিগোলি পাহাড়ের সেই বাঙালী বাবার আশ্রমের সাধুটির মত লোকটিও বলল একটি সংস্কৃত শ্লোক :—

সিন্দুরপূররুচিরারুণপদ্ম-মন্যৎ
সৌষুম্নমধ্যঘটিতং ধ্বজমূলদেশে।
অঙ্গচ্ছদৈঃ পরিবৃতং তড়িদাভবর্ণৈ—
র্বাদ্যৈঃ সবিন্দুলসিতৈশ্চ পুরন্দরান্তৈঃ॥

বললাম, সংস্কৃতে আমার অভিজ্ঞাতা বড় কম, একটু ব্যাখ্যা করে বলবেন?

লোকটি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, তারপর বলতে লাগল, লিঙ্গমূলের সমদেশে সুষুম্না নাড়ির মধ্যে আছে আর একটি পদ্ম। এই পদ্ম সিঁদুরের মত রক্তবর্ণ ও মনোরম। পদ্মের যে ছয়টি দল, বর্ণ তার বিদ্যুতের মত। দলগুলি শোভা পাচ্ছে ব, ভ, ম, য, র এবং ল এই ছয়টি বর্ণদ্বারা।

—তারপর?

তারপর নতুন আর একটি শ্লোক বলল লোকটি :

তস্যান্তরে প্রবিলসদ্বিশদপ্রকাশ—
মম্ভোজমণ্ডলমথো বরুণস্য তস্য।
অর্দ্ধেন্দুরূপলসিতং শরদিন্দুশুভ্রং
বং-কার বীজমমলং মকরাধিরূঢ়ম্।

—এর অর্থ?

সে বলল, এই পদ্মের মধ্যে চিন্তা করতে হবে পদ্মাকার জলমণ্ডলের কথা। এই জলমণ্ডল হল অত্যন্ত শোভাসম্পন্ন, শুক্লবর্ণ ও অর্ধচন্দ্র শোভিত। এই পদ্মে রয়েছে প্রসিদ্ধ বরুণদেবের বং বীজ। এই বং বীজ শরৎকালের চাঁদের মত নির্মল এবং মকরের উপর অধিষ্ঠিত।

—তারপর ?

লোকটি আর একটি শ্লোক বলল :

তস্যাঙ্কদেশকলিতো হরিরেব পায়াৎ
নীলপ্রকাশরুচিরশ্রিয় মাদধানঃ।
পীতাম্বরঃ প্রথম যৌবনগর্ব্বধারী—
শ্রীবৎসকৌস্তুভধরো ধৃতবেদবাহুঃ॥

শ্লোকটি বলে নিজেই সে এর ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করল, কারণ সে জানে যে আমি এ শ্লোকের অর্থ সংস্কৃত থেকে উদ্ধার করতে অপারগ। সে বলল, বরুণ বীজের কোলে থেকে ভগবান বিষ্ণু ত্রিভুবন পালন করেন। এঁর বর্ণ মনোহর নীল। পরিধানে পীতবসন। এঁর মধ্যে রয়েছে যৌবনসুলভ গর্ব। বুকে রয়েছে শ্রীবৎস চিহ্ন ও বনমালা। ইনি চতুর্ভুজ। কেউ কেউ অবশ্য বলেন এঁর হাতে রয়েছে আয়ুধ ও হৃদয়ে আছে কৌস্তুভ রত্ন। এই কৌস্তুভ হল অমৃতসূর্যের প্রভাব মত। কৌস্তুভের নিচে রয়েছে উজ্জ্বল অযুত চন্দ্রের মত বনমালা। কৌস্তুভের উপরে রয়েছে অনুরূপ উজ্জ্বল শ্রীবৎসচিহ্ন। পাশবদ্ধ বরুণ বীজের কোলে হরির হাতে রয়েছে, শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। বাহনের কথা বলা না হলেও চিন্তা করতে হবে গরুড়ের কথা। কারণ, মূলাধার চক্রে হাঁসের পিঠে ব্রহ্মার উপস্থিতি দেখা গেছে।' এইটুকু বলেই লোকটি আর একবার আমার দিকে একটু তাকাল। তারপর আর একটি শ্লোক বলল :

অত্রৈব ভাতি সততং খলু রাকিনীসা
নীলাম্বুজোদরসহোদর কান্তিশোভা।

নানায়ুধোদ্যতকরৈর্লসিতাঙ্গ-লক্ষ্মী—
দিব্যাম্বরাভরণভূষিতমত্তচিত্তা ॥

শ্লোকটি বলেই লোকটি যেন কি ভেবে একটু হাসল, তারপর নিজেই ব্যাখ্যা করতে লাগল : এই শ্লোকটির অর্থ হল এই যে, এই স্বাধিষ্ঠান পদ্মমধ্যে শোভা পাচ্ছেন প্রসিদ্ধা 'রাকিনী' নাম্নী শক্তি। এর শরীর-কান্তি নীল পদ্মের মধ্যভাগের মত। চার হাতে নানা আয়ুধ। এই চার হাত বৃদ্ধি করেছে এঁর অঙ্গশোভা। ইনি ধারণ করেছেন দিব্য বস্ত্র ও দিব্যাভরণ। এবং মত্তচিত্তা হয়ে আছেন।

এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করে লোকটি আপন মনেই কিছুক্ষণ গুম মেরে থাকল। তারপর কেন যেন্ হোহো করে খানিকটা হাসল। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল,—অদ্ভুত সব হেঁয়ালির মত মনে হচ্ছে, নারে ?

বললাম, হ্যাঁ।

—কিছু বুঝতে পারছিস না নিশ্চয়ই ?

—না।

—পারছিস, কিন্তু বুঝছিস না।

—কি রকম ?

—তোর অন্তরতর যে 'তুই', যে কিন্তু সব জানে, সব বোঝে। তোর বাইরের যে 'তুই' সে কিছু বোঝে না।

—অর্থাৎ ?

—খেয়াল করে দেখেছিস যে, 'অন্তরতর' বলেছি, বলিনি 'অন্তরতম' ? একটা মানুষের নানা সত্তা। তবে সাধারণতঃ লোকে বলে তিনটি সত্তা। চেতন সত্তা, অবচেতন সত্তা ও অচেতন সত্তা। অচেতন সত্তাতেই রয়েছে একটা মানুষের পরিচয়। আসলে সে যা চায় তা-ই হয়। প্রত্যেকটি জীবই ভোগ করে নিজের আকাঙ্ক্ষিত ফল। আসল 'আমি'র চাওয়া নকল 'আমি' বুঝতে পারে না, তাই ভুল করে, ভাবে ভাগ্য। কিন্তু আসলে তা ভাগ্য নয়। যারা নিজেদের

অনেকটা তৈরি করেছে, তারা জানে অবচেতন মনের সেই আসল 'আমি'র নানা খবর। তাই কখনও সত্যকে বোঝে, কখনও বোঝে না। তারা 'অন্তরতম'-এর চেতনাকে পারে 'অন্তরতর' পর্যায়ে টেনে আনতে। তোর অন্তরতর পর্যায়ে রয়েছে সত্যের আভাস। অর্থাৎ তুই অবচেতন মনে সত্যের অনেক আভাস পাস। এসব তুই কিছু বুঝিস সংস্কারে, কি বুঝিস আপন চেষ্টায়। কিন্তু চেতন মনের পর্যায়ে এই বোঝাটাকে টেনে তুলতে পারিস না বলে মনে করিস, বুঝি না। সেইজন্যেই বলেছি তোর 'অন্তরতর' যে 'তুই' সে সব জানে, তোর বাইরের যে 'তুই', সে কিছু বোঝে না। তোর যে চেতন মন সে কিছু বোঝে না। আসলে আমাদের চেতন মনই সবচাইতে অচেতন বেশি কিনা।

লোকটি দেখতে দরিদ্র ব্রাহ্মণ ভিখারীর মত। গুদামজাত করে রাখার মত প্রচুর জ্ঞান ভিতরে ঠেসে রেখেছেন। ডাঃ গ্রোড্ডেক যে অচেতন মনের কথা বলেছেন, যাকে তিনি বলেছেন '**The It**' এ-যেন অনেকটা সেইরকম। ডাঃ গ্রোড্ডেকের অভিমত, মানুষের অসুখ হয় নিজের ইচ্ছায়, ভোগ হয় নিজের ইচ্ছায় এবং নিরাময় ও মৃত্যুও হয় নিজের ইচ্ছায়। এ ইচ্ছা হল অন্তরতম চেতনার খাঁটি ইচ্ছা। ফরাসী বৈজ্ঞানিক **Pascal**-ও এই অন্তরতম চেতনার খেয়ালের কথা বলতে গিয়েই বলেছিলেন, '**The heart has its reason of which the reason knows nothing.** আধুনিক পশ্চিম জগতে মনের জগতের নতুন সমীক্ষা আরম্ভ হয়েছে এই চিন্তারই ভিত্তিতে। এরই ভিত্তিতে ইউরোপের শিল্প সাহিত্যের মূল্যায়ন নতুন করে। শিল্প সাহিত্যে অধিবস্তুবাদের উৎপত্তিও এই বিশ্বাসেরই ভিত্তিতে। এই যে একটা গভীর তত্ত্ব, সামান্য একটা মূর্খলোক তা জানল কি করে, ভেবে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকাতেই দেখি সে আর একবার হাসল। তারপর আরম্ভ করল আর একটি শ্লোক বলতে :

স্বাধিষ্ঠানাখ্য মেতৎ সরসিজ মমলং চিন্তয়েদ যো মনুষ্য।
স্তস্যাহঙ্কারদোষাদিক-সকলরিপুঃ ক্ষীয়তে তৎক্ষণেন॥

যোগীশঃ সোঽপি মোহাদ্ভুত তিমিরচয়ে ভানুতুল্যপ্রকাশো।
গদ্যৈঃ পদ্যৈঃ প্রবন্ধৈর্বিরচয়তি সুধাবাক্যসন্দোহলক্ষ্মীঃ॥

শ্লোকটি বলার পর নিজেই এর ব্যাখ্যা করতে লেগে গেল। বলল, যে স্বাধিষ্ঠান নামে এই নির্মল পদ্মকে চিন্তা করে, তার অহংকার, কামবোধ ইত্যাদি রিপু তৎক্ষণাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেই লোক যোগীদের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে এবং দুর্নিবার মোহরূপ অন্ধকারের মধ্যে সূর্যের মত প্রকাশ পেতে থাকে। সেই লোক গদ্যপদ্যময় প্রবন্ধে অমৃততুল্য বাক্যসমূহের সৌষ্ঠব সম্পাদনে সমর্থ হয়।

শ্লোকটির ব্যাখ্যা করে লোকটি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখল। হয়তো প্রত্যাশা করল, আমি কিছু বলব, কিংবা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করতে লাগল আমার ভেতরটা। আমিও তার চোখের দিকে তাকালাম। চোখ দুটো অত্যন্ত যেন গভীর। এত গভীর যে, অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ভয় লাগে। মনে হয় ডুবে যাব। এমন গভীর চোখ আমার জীবনে আগে আর কখনও দেখি নি সেই চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে পড়তে লাগল যোগনিদ্রা-তত্ত্বের কথা। মনে হতে লাগল যে, একটা শক্তি সেই চোখ দুটি থেকে বেরিয়ে এসে ক্রমশঃ আচ্ছন্ন করে ফেলছে আমাকে। কিংবা আমারই শক্তি সেই লোকের মধ্যে চলে যাচ্ছে। আমি ভেতরে কেমন একটা কাঁপুনি অনুভব করলাম। বাধ্য হয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

লোকটি বলল, কিরে! কিছু বুঝলি?

বললাম, কিছুই না।

—চক্রের কোন অর্থই ধরা পড়ল না তোর কাছে?

—কখনও মনে হয় ধরা পড়েছে, কখনও মনে হয় পড়ে নি।

—স্থূল দেহের উপর যে সূক্ষ্ম দেহ আছে, বিশ্বাস করিস?

বললাম, একটা দেহের অস্তিত্ব বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে, যাকে বলে 'হ্যালো', ঐ পর্যন্তই করি, আর নয়।

—একটা করলে আর একটাতে বিশ্বাস করতে আপত্তি কি ?

—ওটাকেও কোন সূক্ষ্ম দেহ বলে ভাবি না। মনে করি একটা দীপ্তি।

—দীপ্তি কি ?

বললাম, একটা আলো।

—আলোর নিশ্চয়ই কোন উপাদান আছে ?

—জানি না। বিজ্ঞান বলে, কখনও মনে হয় আলো গড়া পরমাণু দিয়ে, কখনও মনে হয় ঢেউয়ের মত।

—কিন্তু এরও একটা উপাদান আছে জানবি, একেই বলে তত্ত্ব। এই তত্ত্ব স্থূলও হয় সূক্ষ্মও হয়। সূক্ষ্ম হতে হতে সে হয়ে যায় উপাদানাতীত। সেই উপাদানাতীত অবস্থাই হল উৎস। এই যে দুনিয়া দেখছিস স্থূল দেহের চক্ষে, একে যদি মনের চোখে দেখিস তাহলে দেখবি, গঠনপ্রণালী একরকম হলেও সে ঠিক এই ঘনীভূত পদার্থ দিয়ে তৈরি জিনিসের মত নয়। স্বপ্নে যে জগৎ দেখিস অনেকটা সেইরকম। স্বপ্নে স্থূল দেহ কাজ করে না, স্থূল দেহের যে সূক্ষ্ম উপাদান তাই কাজ করে। মানুষের স্থূল চেতনা যখন স্থূলতার উর্ধ্বে ওঠে তখন জগৎও উঠে যায় স্থূলতার উর্ধ্বে। যখন মানস স্তরে পর্যবেক্ষণ তখন জগৎও গড়া মানস স্তরের সূক্ষ্ম উপাদান দিয়ে।

বললাম, ঠিক বুঝলাম না।

লোকটি বলল, যোগশাস্ত্র পড়েছিস ?

—হ্যাঁ।

—সাংখ্য পড়েছিস ?

—হ্যাঁ।

—পতঞ্জলের যোগসূত্র ?

—হ্যাঁ।

—সেখানে মনকেও বলা হয়েছে প্রাকৃত উপাদান দিয়ে গড়া ?

—হ্যাঁ।

—এই প্রাকৃত উপাদান হল সূক্ষ্ম উপাদান। মানুষের চেতনা যে স্তরে, জগৎও থাকে সেই স্তরে।

বললাম, উপনিষদে পড়েছিলাম দ্রষ্টার স্তর ও দ্রষ্টব্যের স্তরের একটা তুলনামূলক আলোচনা।

—কি রকম?

—উপনিষদে আছে, দ্রষ্টা যখন জাগ্রত অর্থাৎ স্থূল দেহে, দেহ ও প্রাণ নিয়ে দ্রষ্টব্য অর্থাৎ বিশ্ব তখন তার কাছে বিরাট হিসেবে প্রতীয়মান। দ্রষ্টা যখন নিদ্রামগ্ন অর্থাৎ মনের স্তরে দ্রষ্টব্য অর্থাৎ বিশ্ব তখন তার কাছে হিরণ্যগর্ভ। দ্রষ্টা যখন স্বপ্নহীন নিদ্রায়, অর্থাৎ মহা-মানসে, দ্রষ্টব্য তখন ঈশ্বর পর্যায়ে। দ্রষ্টা যখন তুরীয়ে, অর্থাৎ অবাঙ্-মানসগোচরম, দ্রষ্টব্য তখন ব্রহ্মণে অর্থাৎ সেই অবাঙ্মানসগোচরম। অর্থাৎ এইটুকু বোঝা যায় যে, দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্যে কোন ভেদ নেই। দ্রষ্টা যে উপাদানের তৈরি দ্রষ্টব্যও তার কাছে সেই উপাদানেই গড়া।

লোকটি বলল, যথার্থই তাই। তন্ত্রও বলেছে সেই কথা। চক্রগুলো হল দেহের চেতনার এক একটা স্তর। চেতনাকে যে স্তরে এনে দেখা যাবে বস্তুও লাভ করবে সেই স্তরের আকৃতি ও প্রকৃতি। আসলে এই জগৎ-উৎপত্তির ক্ষেত্রে এক পরম উপাদানহীন অস্তিত্ব থেকে এসেছে সূক্ষ্মতম প্রকৃতি, সূক্ষ্ম উপাদান, তারপর বস্তু। এইভাবে হয়েছে জগৎ ও জীব। যে ভাবে হয়েছে, তার উল্টো গতিতে চললে যেখান থেকে হয়েছে, সেখানেই ফিরে যাওয়া যায়। তন্ত্র সাধনা সেই ফিরে যাওয়ার সাধনা।

বললাম, শ্রীঅরবিন্দ Life Divine-এ এঁকেছেন উপাদানহীন অস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব পর্যায়ে আসার এক বিচিত্র চিত্র। তিনি সৃষ্টির ক্ষেত্রে বলেছেন আটটি তত্ত্বের কথা। যেমন, সৎ (Existence) চিৎ (Consciousnes-Force), আনন্দ (Bliss), মহামানস (Supermind), মন (Mind), আত্মা (Psyche), প্রাণ (Life), এবং বস্তু (Matter)। তাঁর মতে স্থূল ও সূক্ষ্ম বস্তুর অস্তিত্ব

হল দৈব অস্তিত্বের প্রতিসরণ, যদিও তার উদ্ভব হয়েছে স্তরে স্তরে ধারাবাহিকভাবে। যেমন, উপাদানহীন অস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বের পর্যায়ে যদি সৃষ্টিকর্মকে সাজানো যায়, তাহলে তা আসে এইভাবে :

সৎ

চিৎ

আনন্দ

মহামানস

মন

আত্মা

প্রাণ

বস্তু

তবুও তা ছড়িয়ে আছে এইভাবে : একদিকে দৈব অস্তিত্ব, আর একদিকে বস্তুগত অস্তিত্ব। যেমন,

দৈব অস্তিত্ব	বস্তুগত অস্তিত্ব
সৎ (Existence)	বস্তু (Matter)
চিৎ (Consciousnes)	প্রাণ (Life)
আনন্দ (Bliss)	আত্মা (Psyche)
মহামানস (Supermind)	মন (Mind)

সৎ থেকে আমরা চৈতন্য, আনন্দ ও মহামানসের মাধ্যমে নেমে আসি, আবার বস্তু থেকে প্রাণ, আত্মা ও মনের সাহায্যে উঠি। দৈব অস্তিত্বে সৎ থেকে নামি মহামানসে। বস্তুগত অস্তিত্বে বস্তু থেকে উঠি মনের স্তরে। দুই প্রান্তের দুই গ্রন্থি উর্ধ্ব প্রান্তের ও নিম্ন প্রান্তের এমন জায়গায় পরস্পর মুখোমুখি দাঁড়ায় যে, শুধ্ একটা সূক্ষ্ম পর্দার জন্য দুই জগতের অস্তিত্ব পৃথক হয়ে থাকে।

লোকটি হাসতে হাসতে বলল, এও তন্ত্রেরই ব্যাপার, যোগের ব্যাপার, তবে তন্ত্রসাধনার ধারা, বোঝার ধারা একটুখানি পৃথক।

—কি রকম?

—তন্ত্রে একের পর এক চক্র ভেদ করে ঊর্ধ্বে উঠতে হয়। এখানে আছে একদিকে বস্তুকে জোর করে একটা বিশেষ স্তরে ওঠানো, আবার সৎকে একটি বিশেষ স্তরে নামানো। অরবিন্দের অভিমত, বস্তুকে যদি মনের পর্যায়ে আনা যায়, অপর পক্ষে সৎকে যদি মহা-মানসের পর্যায়ে আনা যায় তাহলে দৈব জগৎ (অর্থাৎ সৎ, চিৎ, আনন্দ ও মহা-মানস)-এর আলোয় বস্তুজগৎ (মন, আত্মা, প্রাণ ও বস্তু) আলোকিত হয়। মন মহামানসের প্রতিসরণ লাভ করে দৈবসত্তা পায়, আত্মা হয় আনন্দে উদ্ভাসিত। প্রাণ হতে পারে চৈতন্য শক্তিতে আলোকিত এবং বস্তু পারে সৎ-এর আলোর প্রতিফলন ঘটাতে। অর্থাৎ যোগ সাধনার দ্বারা দৈব-সত্তা ও বস্তু-সত্তাকে যদি একটি মিলনকেন্দ্রে আনা যায় তাহলে সমগ্র বস্তু-সত্তা দৈবী জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এ ধরনের তন্ত্র সাধনা, যোগ সাধনা দেহকে দৈব পর্যায়ে উন্নীত করে, বস্তু-দেহেই করা যায় দৈবী আনন্দ ভোগ। বস্তুগত সত্তার প্রতিটি অণু-পরমাণু দৈবী আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে সাধককে মুক্তি দান করে। তবে এত ঘোরপ্যাঁচের দরকার কি, আমাদের সাধারণ তন্ত্রের ষটচক্র ভেদ করার পদ্ধতি অবলম্বন করলেই তো সব সহজ হয়। দরকার হয় না এত তত্ত্বের, তথ্যেরও দরকার হয় না। তাছাড়া শ্রীঅরবিন্দ যত সহজে আটটি তত্ত্বের কথা বলেছেন, তত সহজে তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করা যায় না। উপাদানহীন অস্তিত্ব থেকে স্থূল উপাদানময় অস্তিত্বে আসতে সৃষ্টিকর্মে ২৪টি উপাদানের কথা বলেছে সাংখ্য। তন্ত্র বলেছে ৩৬টি তত্ত্বের কথা। এই তত্ত্বের স্বরূপ বুঝলে তন্ত্রে মুক্তি লাভ করা সহজ হয়।

জিজ্ঞাসা করলাম, সে আবার কি রকম ?

লোকটি বলল, 'তাহলে এঁকে তোকে বোঝাতে হয়।' খড়িমাটি নিয়ে আবার সে শান বাঁধানো মেঝেতে খানিকটা আঁকিবুকি করল। এবার আঁকল জবরজঙ্গ একটা নকশা। নকশাটা দেখতে অনেকটা এইরকম :

ডায়াগ্রামটি এঁকে লোকটি আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল বলল,—বুঝলি ?
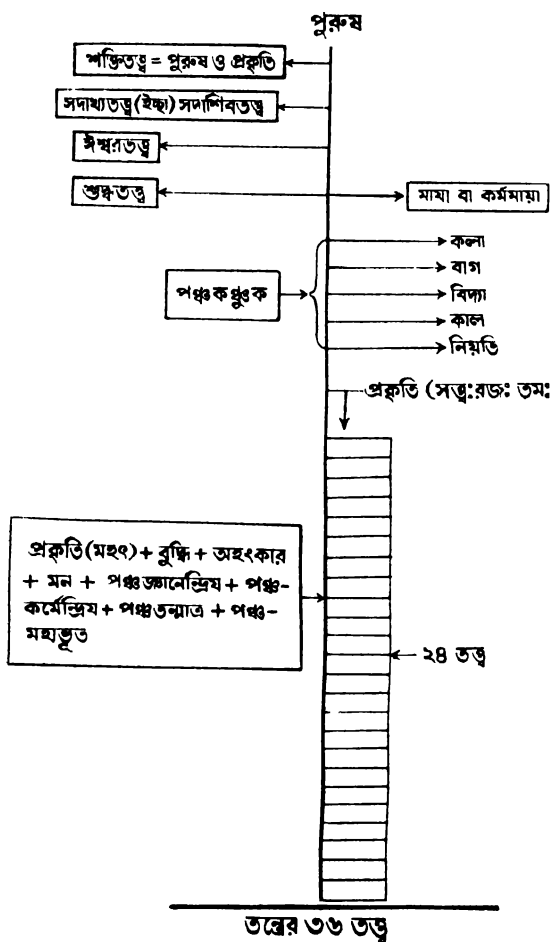
বললাম, একেবারেই না।

সে বলল, এইভাবে পুরুষ থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়েছে।

—কি রকম ?

লোকটি বলতে লাগল, পুরুষ হলেন শিব, শুদ্ধ পুরুষ অর্থাৎ উপাদানহীন অস্তিত্ব। তিনি অহং বটে, তবে সেইরকম অহং যিনি

নিজের অহংবোধও অনুভব করেন না। কিন্তু এর পরই তাঁর মধ্যে জাগে অহংবোধ। অহংবোধ জাগলেই সঙ্গে সঙ্গে থাকবে 'ইদম' বোধ। কারণ, ইদম ছাড়া অহং হয় না। এই পর্যায় হল শাক্ত-তন্ত্রের পর্যায়— যেখানে অহং ও ইদম একাত্মভাবে জড়িয়ে আছে। অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি একাত্ম হয়ে আছে। অথচ এরই মধ্যে রয়েছে অসংখ্য বিচিত্র সৃষ্টির সম্ভাবনা। শক্তি-তত্ত্বের এই হল গূঢ় রহস্য। এর পরই সদাশিবতত্ত্ব বা সাদাখ্য তত্ত্ব। এ পর্যায়ে শক্তির মধ্যে ইচ্ছার সঞ্চার হয়। শক্তি তখন ইচ্ছা-শক্তি। ঈশ্বর-তত্ত্বে শক্তির মাধ্যমে পুরুষ অহং সম্পর্কে বোধ লাভ করেন অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে অহং-এর বাইরেও কিছু আছে এটা বুঝতে পারেন। শুদ্ধ বিদ্যায় অহং এবং ইদম বোধহয় আরও স্পষ্ট। এর পরই মায়া বা কার্যমায়া অর্থাৎ পুরুষের গুণ তাঁর একাত্ম হওয়া সত্ত্বেও গুণকে তখন পৃথক কিছু বলে মনে হয়। এর পরই সৃষ্টির সূক্ষ্মতম উপাদান—পঞ্চ কঞ্চুক : কলা, রাগ, বিদ্যা, কাল ও নিয়তি। এর পরই প্রকৃতি পর্যায়। এই প্রকৃতিতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ মিশে থাকে একত্রে। এই গুণগুলির তারতম্য হিসেবে এর পরেই আসে বুদ্ধি, অহংকার, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র, এবং পঞ্চ মহাভূতাদি চব্বিশ তত্ত্ব। মহাভূত পর্যায়েই হল এই স্থূল জগৎ।

ডায়াগ্রামটির ব্যাখ্যা করে লোকটি আমার মুখের দিকে কিছু প্রত্যাশা করে যেন তাকিয়ে থাকল। আমি বললাম,—জিনিসটি বুঝতে পারছি। অস্তিত্বহীন অস্তিত্ব থেকে কিভাবে ভূত জগতের উৎপত্তি হচ্ছে, এ তারই ইতিহাস। কিন্তু এই যে ছত্রিশটি তত্ত্ব, ষটচক্র ভেদ দ্বারা এই ছত্রিশটি তত্ত্বের কিভাবে অনুভব হতে পারে ?

লোকটি হাসল। বলল, ধরে নে, এক একটি চক্রে আছে ছটি করে তত্ত্ব। তাহলে ?

বললাম, অর্থাৎ এক একটি চক্র ভেদ করলে, ছটি করে তত্ত্বের সূক্ষ্মতর উপাদানে যাওয়া যায়, এই তো ?

—যথার্থই তাই।

—কিন্তু অনেকে যে বলেন, নিম্ন চক্রের ছটি চক্রে ছটি করে তত্ত্বই আছে। তবে আজ্ঞাচক্র থেকে সহস্রারের দিকে এগুতে গেলে তত্ত্বের সংখ্যা বেড়ে যায়?

লোকটি বলল, যোগাভ্যাসে যিনি যেভাবে তত্ত্বগুলি অনুভব করতে পারেন, তিনি সেইভাবেই বলেন। সেইজন্য তন্ত্রে তত্ত্বগুলির বর্ণনায় সবাই একমত নন।

বললাম, আপনি যে সৃষ্টি-তত্ত্বের ক্রমবিকাশের কথা বললেন, সিদ্ধান্ত মতে আমি এ সম্পর্কে পড়েছি একটু ভিন্ন ধরনের কাহিনী।

—কি রকম?

সিদ্ধান্ত মতে সৃষ্টির ক্রমবিকাশের কাহিনী যেভাবে পড়েছিলাম তাই বললাম: সিদ্ধান্ত মতে ক্রমবিকাশ হল দু' ধরনের—শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। মায়াও দু' রকমের—শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। শুদ্ধ মায়াকে বলা হয় মহামায়াও। এই মায়া পরিচালনা করেন শিব নিজে। এই মায়া শিব তিনটি শক্তি দ্বারা পরিচালনা করেন। যেমন, ইচ্ছা-শক্তি, জ্ঞান-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি। শুদ্ধ মায়া পাঁচ ভাগে বিকশিত হয়—নাদ, বিন্দু, সাদাখ্য, মাহেশ্বরী ও শুদ্ধ বিদ্যা। নাদ হল শিব-তত্ত্ব এবং বিন্দু শক্তি-তত্ত্ব। নাদ হল জ্ঞান-শক্তি, বিন্দু ক্রিয়া-শক্তি। জ্ঞান ও ক্রিয়া-শক্তি সমান সমান থাকলে হয় সাদাখ্য তত্ত্ব। মাহেশ্বরী তত্ত্বে ক্রিয়া-শক্তি জ্ঞান-শক্তি অপেক্ষা প্রবলতর। মাহেশ্বরী তত্ত্ব থেকে শুদ্ধবিদ্যা দেখা দেয় তখনই যখন জ্ঞান-শক্তি হয় ক্রিয়া-শক্তি অপেক্ষা প্রবলতর।

শুদ্ধ মায়া থেকে শব্দ আসে এইভাবে, যেমন, চার ধরনের শব্দ আছে, পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা ও বৈখরী। পরা শব্দ হল সর্বোচ্চ ও সূক্ষ্মতম। এ অবস্থা হল নাদের সমান, অর্থাৎ এখানে শিবের ক্রিয়া-শক্তি প্রবলতর হয়। পশ্যন্তিও ঐশ্বরিক পর্যায়ের কিন্তু মূল থেকে অবিচ্ছিন্ন। ময়ূরের ডিমের মধ্যে যেমন ময়ূরের রঙ থাকে সেইরকম। মধ্যমা শব্দ

হল মূল থেকে বিচ্ছিন্ন কিন্তু তখনও শ্রুত নয়। বৈখরী হল শ্রুত শব্দ অক্ষর ও শব্দে এর প্রকাশ।

শুদ্ধমায়া থেকে সদাশিব ও রুদ্র আত্মপ্রকাশ করেন। সদাশিব তাঁর নিজের শক্তির দ্বারা অশুদ্ধ মায়া থেকে সৃষ্টি করেন কাল, নিয়তি ও কলা। কলা থেকে বিদ্যা (জ্ঞান) ও রাগ (আকর্ষণ) জন্মায়। এই পাঁচটি তত্ত্ব—কাল, নিয়তি, কলা, বিদ্যা ও রাগ তৈরি করে পরমাত্মার পঞ্চকঞ্চুক। এই পঞ্চকঞ্চুক দ্বারা প্রভাবিত আত্মা থেকে পুরুষ-তত্ত্ব আত্মপ্রকাশ করে। কলা থেকে রুদ্রের কার্যকলাপে প্রকৃতির আত্মপ্রকাশ হয়।

প্রকৃতির অব্যক্ত পর্যায় থেকে চিত্ত বা বুদ্ধি আত্মপ্রকাশ করে বুদ্ধি থেকে আসে অহংকার। অহংকার তিনরকম, সাত্ত্বিক অহংকার, রাজসিক অহংকার ও বৈকৃত অহংকার। সাত্ত্বিক অহংকার থেকে অর্থাৎ তৈজস থেকে আসে ইন্দ্রিয় ও মন। রাজসিক ও বৈকৃত অহংকার থেকে আসে কর্মেন্দ্রিয়। ভূতাদি থেকে আসে তন্মাত্র। তন্মাত্র থেকে মহাভূত (পঞ্চভূত)। সৃষ্টিরূপে পরম পুরুষের এই আত্মপ্রকাশের মধ্যে কাজ করে ৩৬টি তত্ত্ব। মায়া হল আত্মার এক ধরনের পাশ। মায়াকে বলা হয় অসৎ কারণ তিনি সৎ থেকে আলাদা। আসলে তিনি অচিৎ অর্থাৎ চিৎ থেকে পৃথক। অসৎ বা অনস্তিত্ব নন।

সিদ্ধান্ত মতে সৃষ্টি-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার পরে লোকটির দিকে তাকালাম, দেখলাম তিনি মৃদু মৃদু হাসছেন। তিনি বললেন, এরকম আরও অসংখ্য তত্ত্ব আছে। যেমন ধর, শাক্তাদ্বৈত মতের কথা বলছি। শাক্তাদ্বৈত মতে চৈতন্য ও শক্তির আছে তিনটি পর্যায়—চিৎ শক্তি আনন্দ শক্তি ও ইচ্ছা-শক্তি। চিৎ শক্তি হল নির্ভেজাল চৈতন্য। আনন্দ শক্তিতে নির্ভেজাল চৈতন্যের বাইরেও অন্য কিছু আছে। কিন্তু এ অন্য কিছুর অবস্থান অপ্রকাশ। তৃতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ ইচ্ছা-শক্তি পর্যায়ে এই অন্য কিছু আত্মপ্রকাশ করে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এসেছে চৈতন্যের তিনটি পর্যায়ে—(ক) প্রথম হল

বীজাবস্থা। এখানে বস্তুর প্রকাশ নেই। এতে আছে পাঁচটি নির্ভেজাল তত্ত্ব, যেমন (১) শিব তত্ত্ব (২) শক্তি তত্ত্ব (৩) সদাশিব তত্ত্ব (৪) ঈশ্বর তত্ত্ব এবং (৫) শুদ্ধবিদ্যা। (খ) দ্বিতীয় পর্যায় হল অবিদ্যা পর্যায়। এ পর্যায়ে বস্তুর সূক্ষ্ম প্রকাশ ঘটে। এ হল মিশ্র তত্ত্বের পর্যায়। মিশ্র তত্ত্ব হল (১) মায়া (২) কাল (৩) নিয়তি (৪) কলা (৫) রাগ এবং (৬) বিদ্যা। এ হল প্রস্তুতি পর্ব। (গ) তৃতীয় পর্যায় হল স্থূল পর্যায়— যেমন, এখানে অবিদ্যা আত্মপ্রকাশ করে। এ সময় বস্তু বেশি শক্তিশালী হয়। এ পর্যায়ে আছে ২৪টি তত্ত্ব। এই ২৪টি তত্ত্ব রয়েছে প্রকৃতি থেকে আরম্ভ করে পৃথ্বী তত্ত্ব পর্যন্ত বিরাজিত।

প্রকৃতির প্রকাশে রয়েছে দুটি পর্যায়। যেমন, (১) অব্যক্ত পর্যায়, এ পর্যায়কে তুলনা করা যেতে পারে স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রার সঙ্গে। এবং (২) চিত্ত পর্যায়, এ পর্যায়কে তুলনা করা যেতে পারে স্বপ্ন ও জাগরণ পর্যায়ের সঙ্গে। এই তত্ত্বে মনেরও দুটি পর্যায় আছে—(১) প্রকাশ পর্যায়, এ পর্যায়ে মন নির্ভর করে অন্য বিষয়ের উপর। সংযোগ স্থাপন করে অন্য বিষয়ের সঙ্গে। এবং (২) বিমর্ষ পর্যায়, এ পর্যায়ে অন্য বিষয়ের প্রতিফলনে মনের বিকলন বা আলোড়ন হয়।

বললাম, বাঃ! সুন্দর বিশ্লেষণ তো!

লোকটি বলল, এ রকম আরও অসংখ্য সুন্দর বিশ্লেষণ আছে। কিন্তু তাতে এসে যায় কি? বুদ্ধিগ্রাহ্য জ্ঞান মেঘ-রোদ্দুরের খেলার মতন। এই সূর্য দেখা যায় তো এই ছায়া পড়ে। এ জ্ঞানের মূল্য নেই। যে জীবনে মিষ্টি খায় নি, তাকে যা সে খেয়েছে, তা মিষ্টি নয় বলে নানা ভাবে বোঝানো গেলেও যথার্থ মিষ্টির যে স্বাদ, মিষ্টি না খেলে কখনই তা বোঝানো যাবে না। তেমনি তর্কবিদ্যা পরম-বিদ্যার সঙ্গে লুকোচুরিই খেলবে, কখনও তাকে যথাযথভাবে বুঝতে সাহায্য করবে না। মিষ্টিকে বুঝতে হলে যেমন মিষ্টি খেতে হয়, পরম বিদ্যার স্বরূপ জানতে হলে তাকে তেমনি অনুভব করতে হয়।

—কিভাবে সে অনুভব হবে?

—যোগের মাধ্যমে। যোগ শাস্ত্র তো পড়ছিস ?

বললাম, আজ্ঞে।

—কিন্তু শুধু পড়লেই তো হবে না, যোগ করতে হবে। যোগ পড়ার জিনিস নয়, যোগ করার জিনিস।

—পড়লে কি কোন কাজই হয় না ?

লোকটি বলল, হয়। যে পথ দিয়ে চলতে হবে, ঝাড়ু দিয়ে সে পথ ঝাড়-পোঁছ করলে, চলায় সুবিধে হয়। কিন্তু লক্ষ্যস্থলে যেতে হলে হাঁটতে তো হবেই !

জিজ্ঞাসা করলাম, কেউ যদি জ্ঞান অর্জন না করে যোগ করে ?

লোকটি বলল, কর্কশ পথের উপর দিয়ে হাঁটলেও একটি লোক তো গন্তব্যস্থলে পৌঁছুবেই ?

—হ্যাঁ।

—ধর গন্তব্যস্থলে আছে একটা মর্মর প্রাসাদ। একটা লোক গেল এবড়ো-খেবড়ো পথের উপর দিয়ে, আর একটা লোক গেল মসৃণ পথের উপর দিয়ে। লক্ষ্যস্থলে পৌঁছুবার পর উভয়েরই কি অভিজ্ঞতা হবে ?

বললাম, একই ধরনের।

লোকটি বলল, জ্ঞান অর্জন করে যোগ করা ও জ্ঞান অর্জন না করে যোগ করার ফলও ঐ একই রকম। জ্ঞান অর্জন করে যোগ করলে ভাল হয়। তুই যে যোগ সম্পর্কে পড়ছিস, ভালই করছিস। এবার যোগ কর, তাহলেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।

বললাম, যোগ ছাড়া, ভক্তির পথে কি অধ্যাত্ম উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না ?

লোকটি বলল, ভক্তির সামনে থাকে একটি লক্ষ্য, একটি দেবী বা দেব। ঐ লক্ষ্য পর্যন্তই অধ্যাত্ম সাধনা পূর্ণ হবে তার বেশি নয়। মুক্তি বলতে যা বোঝায় তা হবে না। মুক্তি পেতে হলে অনুভবকে সেই পূর্ণের পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে।

বললাম, না হয় ভক্তির পথে এটা সম্ভব নয়, কিন্তু জ্ঞানের পথে ?

লোকটি বলল, জ্ঞানের পথে অনুমান হয়, অনুভব হয় না। দুধ চোখে দেখে জানা আর দুধ চোখে দেখে পান করে জানায় যে পার্থক্য, জ্ঞানের পথে সত্যকে জানা আর সত্যকে অনুভব করার মধ্যে পার্থক্য সেইরকম।

বললাম, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব শুনেছি লেখাপড়া জানতেন না। কিন্তু তিনি এমন অনেক জ্ঞানের কথা বলেছেন, যে জ্ঞান পশ্চিমী দার্শনিকরাও দেখাতে পারেন নি। তাঁর সম্বল তো ছিল ভক্তি?

লোকটি বলল, ভক্তি অদ্ভুত সব ক্ষমতা জন্মাতে সাহায্য করে। এতে অন্তর নির্মল হয়, তখন সেই নির্মল অন্তরে নানা সত্য উদ্ভাসিত হয়।

—কিন্তু, তাতে কি সত্য জ্ঞান হয়?

—সত্য সম্পর্কে আংশিক জ্ঞান হয়। সত্যকে অনুভব করার জন্য যোগের পথে যেতেই হয়। তুমি তো জান যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও স্বয়ং যোগসাধনা করেছিলেন?

—হ্যাঁ, তিনি অত্যন্ত সহজে যোগ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সেটা সম্ভব হয়েছিল কি করে তাই ভাবি।

লোকটি বলল, সেটা সম্ভব হয়েছিল, প্রাক্তনের জন্য।

—প্রাক্তন বলে কি কিছু আছে?

—এতদিন তন্ত্র সম্পর্কে লেখাপড়া করে তোমার কি মনে হয়?

আশ্চর্য হয়ে লোকটির মুখের দিকে তাকালাম। সে কি করে জানল যে, তন্ত্র সম্পর্কে আমি লেখাপড়া করছি! জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি করে তা জানলেন?

লোকটি বলল, মানুষ চেষ্টা করলে কি না পারে? একই রেডিওতে কলকাতা স্টেশন, দিল্লী স্টেশন, বি. বি. সি স্টেশন, ভয়েস অব্ আমেরিকা সবই ধরা যায় না?

—যায়।

—কি করে যায়?

—সাঙ্কেতিক তরঙ্গ যে রকম, রেডিওর তরঙ্গশক্তিকে সেই মত করা হলেই সেই তরঙ্গ ধরা পড়ে।

লোকটি বলল, মানুষও একটি রেডিও যন্ত্র বিশেষ। দেহ তরঙ্গ নিয়ন্ত্রিত করার কলাকৌশল জানা থাকলে, বিভিন্ন মানুষের চিন্তা-তরঙ্গের সঙ্গে তাকে সুষম করে তুলতে পারলেই নানা মানুষের চিন্তা ভাবনার কথা জানা যায়।

—আচ্ছা এটা কি সম্ভব যে, মানুষ ত্রিকালদর্শী হতে পারে?

লোকটি বলল, কেন পারে না, শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন না?

বললাম, শ্রীকৃষ্ণের কথা গল্পকথা বলেই মনে হয়।

লোকটি খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, তারপর বলল, কিন্তু ত্রিকালদর্শনতত্ত্ব কিন্তু গল্প নয়।

—কি রকম?

লোকটি বলল, H. G. Wells-এর Time Machine পড়েছ?

আমি যেন চমকে গেলাম। এতক্ষণ যাকে সাধারণ মানুষ বলে মনে হয়েছিল, অশিক্ষিত বলে মনে হয়েছিল, হঠাৎ তাকে অন্য দৃষ্টিতে দেখতে পেলাম যেন। জিজ্ঞাসা করলাম—

—আপনি Time Machine পড়েছেন?

—কেন?

—সেখানে ত্রিকালদর্শনতত্ত্ব আছে ঠিকই। না পড়লে তো জানার কথা নয়!

লোকটি হেসে বলল, অনেকে না পড়েও অনেক কিছু জানে।

—কি করে?

—যিনি সর্বদর্শী হন, তাঁর কাছে কি কোন কিছু অজ্ঞাত থাকতে পারে?

গভীর দৃষ্টি মেলে তাঁর চোখের দিকে তাকালাম, আপনি···

লোকটি বলল, আমি কি?

—মানে···

লোকটি আমাকে কথা শেষ করতে দিল না। বলল, আমিও যা, তুমিও তাই, আমরা স্বতন্ত্র কিছু নই।

বললাম, তা কি করে হয়? আমি আপনার মত সর্বদর্শী নই।

—তুমিও সর্বদর্শী।

—তাহলে আমি কেন আপনার মত সব দেখতে পাই না?

—দেখতে পাও, কিন্তু নিজেই যে চোখের সামনে দেয়াল টেনে বসে আছ।

—দেয়াল?

—হ্যাঁ।

—কিসের দেয়াল?

—অবিদ্যার দেয়াল।

বললাম, তা ঠিক, আমি জ্ঞানী ব্যক্তি নই।

লোকটি হেসে বলল, তুমিই জ্ঞানী ব্যক্তি, তবে অজ্ঞানতার আবরণ টেনে বসে আছ।

—এই অজ্ঞানতা দূর করা যায় কি করে?

—এই অজ্ঞানতা দূর করা যায় পূর্ণ যে জ্ঞান তা অনুভব হলে, তবেই।

—জ্ঞান কি অনুভবের জিনিস, না আহরণের জিনিস?

—পার্থিব জ্ঞান আহরণের জিনিস। পূর্ণ জ্ঞান অনুভবের জিনিস।

—একটু বুঝিয়ে বলবেন?

লোকটি আমাকে জিজ্ঞাসা করল, যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় রসগোল্লা কি রকম জিনিস, তুমি কি বলবে?

জবাব দিলাম, বলব রসগোল্লা ছানা দিয়ে তৈরি এক ধরনের গোলাকৃতি জিনিস। চিনির জলে সিরা তৈরি করে তাতে এই রসগোল্লা জ্বাল দিয়ে ভিজিয়ে রাখা হয়। এটা খেতে হল মিষ্টি।

—যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, মিষ্টি কি রকম, কি বলবে?

একটুখানি হকচাকিয়ে গেলাম। ভাবলাম, মিষ্টি কিরকম তা

কিভাবে বলা যায়! ভাবতে ভাবতে নেতিবাচক একটি জবাবের কথা মনে হল। বললাম, মিষ্টি হল সেইরকম জিনিস, যা টক নয়, ঝাল নয়, কষায় নয়, তেতোও নয়।

—যে লোকটি মিষ্টি খায় নি, এতে সে মিষ্টির স্বরূপ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবে কি?

—না।

—মিষ্টির যথার্থ স্বরূপ বুঝতে হলে, তাকে কি করতে হবে?

—মিষ্টির যথার্থ স্বরূপ বুঝতে হলে তাকে মিষ্টি খেতে হবে।

লোকটি বলল, জ্ঞান আহরণ ও জ্ঞান অনুভবের মধ্যে এই হল পার্থক্য।

—কিরকম?

—বর্ণনা পড়ে মিষ্টি সম্পর্কে জানা হল জ্ঞান আহরণ। মিষ্টি খেয়ে মিষ্টির স্বরূপ জানা বা রসগোল্লার স্বরূপ জানা হল জ্ঞান অনুভব।

জিজ্ঞাসা করলাম, জ্ঞানের অনুভব হবে কি করে?

—সত্য জ্ঞান হলে।

—কিভাবে?

—সত্য জ্ঞান হবার পথ হল নির্বিকল্প সমাধি লাভ করা।

—নির্বিকল্প সমাধি লাভ করা যায় কি করে?

—যোগের মাধ্যমে।

—এটা কি সত্যই তাই?

—তোমার কি মনে হয়?

বললাম, আমি যোগী পুরুষ দেখি নি কখনও। যোগ সম্পর্কে সামান্য পড়াশুনা আছে। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সামান্য কিছু যোগও করি। তবে আমার এক তরুণ বন্ধুকে জ্যোতিষচর্চা করতে গিয়ে বার বার শুনি প্রাণায়ামের কথা বলতে। সে নাকি প্রাণায়ামের সাহায্যে ও আসন-যোগের সাহায্যে ভবিষ্যৎ বলা সম্পর্কে, রোগ নিরাময় সম্পর্কে ও সমস্যাসমাধানকল্পে বিরাট ক্ষমতা অর্জন করেছে। বহু জ্যোতিষীর

সংস্পর্শে এসেছি আমি। তার জ্যোতিষ চর্চা একটু ভিন্ন ধরনের। কুষ্ঠি থাকলে বলে নির্ভুল ভাবে। না থাকলে হাত দেখেও আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী করে। কয়েকটি লোককে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি, সত্যিই তার কথা ফলে। আমার স্ত্রীর স্বাস্থ্য উদ্ধার করে দিয়েছে এক টুক্‌রো পাথরের সাহায্যে। জ্যোতিষ চর্চা করে চ্যালেঞ্জ নিয়ে। এরকম জ্যোতিষী দেখি নি। তাঁর অনেক আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় মিলে গেছে। এত নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করার গোপন কথা জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, জ্যোতিষ হল বিজ্ঞান। সেই সঙ্গে এক ধরনের যোগ। ভাল চর্চা করলে, ভাল যোগ সাধনা করলে ভবিষ্যদ্বাণী নির্ভুল হয়।

লোকটি জিজ্ঞাসা করল, তোর কি মনে হয়?

বললাম, আমার মনে হয়, সঠিক ইনটুইশনের উপর নির্ভর করে এ-সব হয়।

—যথার্থ ই তাই। এবং এই ইনটুইশন আসে মনঃসংযোগের ফলে যোগসাধনা করলে সুস্থ মনঃসংযোগ হয়। নিচুস্তরের মনঃসংযোগ হয় সামান্য যোগে, যথার্থ সত্যে মনঃসংযোগ করতে হয় জটিল যোগে।

লোকটি এইটুকু কথা বলে আমার সর্বাঙ্গে তাকিয়ে যেন কি দেখল তারপর বলল, তোর যা শরীর দেখছি, তাতে যোগের লক্ষণ আছে শরীর নমনীয় আছে। সাধন-যোগের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ অনায়াসেই করতে পারিস। তাহলে নিজেই একবার পরীক্ষা করে দেখ না এ-সব?

—আমি!

—হ্যাঁ!

বললাম, আমার যোগ তো রোগ নিরাময়ের যোগ, স্বাস্থ্যরক্ষার যোগ, এ-যোগের সাহায্যে সাধনা-যোগ হয়?

—কেন, প্রাণায়াম করিস যে!

—আশ্চর্য! প্রাণায়ামেও বেশ অভ্যস্ত হয়েছি, লোকটা তা জানল কি করে!

আমার মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে খানিকক্ষণ কি দেখল লোকটি, তারপর একটু হাসল। জিজ্ঞাসা করলাম, হাসছেন কেন?

লোকটি বলল, কি বোকারে তুই?

—কেন?

—ব্রহ্মচর্য পালন করছিস দেহকে সুন্দর করার জন্য? যৌবনকে ধরার জন্য? অথচ সত্যিকারের সুন্দর, সত্যিকারের চিরতারুণ্যে যেখানে থাকা যায়, সেই সুন্দরকে লক্ষ্য হিসেবে রাখিস নি কেন? তবু, মহামায়ার খেলা কে বুঝে বল্!

—কেন?

—আরম্ভ করলি দেহ সুন্দর করার জন্য। কারণ, এই হাতের কাছের প্রলোভন না থাকলে দূরবর্তী সৌন্দর্যের জন্য এত পরিশ্রমের, এত ধৈর্যের ঝুঁকি কি নিতিস? মহামায়া আড়ালে হাসছেন। তুই যেতে চাস একদিকে, সে তোকে টানছে আর একদিকে। একদিন মার খেতে খেতে দেহ-সৌন্দর্য-বোধের প্রতি তোর আর কোন আকর্ষণ থাকবে না। তখন এই ব্রহ্মচর্যই তোকে এগিয়ে নিয়ে যাবে পরম সুন্দরের পথে। দেহ অনেকটা তৈরি হয়েই আছে, এবার প্রাণায়াম করছিস, মনও ঠিক হবে।

বললাম, কিন্তু আমি তো ও-সব অধ্যাত্ম চিন্তা-টিন্তা করি না!

—তাহলে এখনও যোগ ব্যায়াম করিস কেন?

বললাম, যোগ ব্যায়াম করলে শরীরে যেন একটা আনন্দ পাই।

সে বলল, অধ্যাত্ম রসের আনন্দ পেলে বার বার সেদিকেই ঝুঁকতে ইচ্ছা করবে। তবু বিশ্বাস হয় না, না রে?

—হ্যাঁ।

এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি, এবার দেখলাম, তিনি ভাঁজ করা এক কম্বাসনের উপর বসে আছেন। সেই আসনটা টেনে বের করে

আমার সামনে বিছিয়ে দিলেন। বললেন, বোস্‌ তো এর উপর একবার।

—কেন ?

—বোস না !

বোধহয় একটু ইতস্ততঃ করছিলাম।

লোকটি বলল, ভয় নেই। তুই করছিস মহামায়ার কাজ, মহামায়ার ছেলেদের আবার ভয় কি ?

ইতস্ততঃ ভাব ছেড়ে দিয়ে সেই আসনের উপর গিয়ে বসলাম।

লোকটি বলল, রোজ তো এখন ৮/৩২/১৬ আর ১৬/৬৪/৩২ মাত্রায় প্রাণায়াম করিস ?

—হ্যাঁ।

—সত্যি করে বলতো কি দেখিস ?

বললাম, দেখি নানা বিচিত্র আলো, জ্যামিতিক রেখা, বিন্দু, ত্রিভুজ, এইসব।

—কখনও তিলের থেকেও ছোট একটা কালো বিন্দু ওঠা নামা করে ?

—করে।

—এখন একটু মনঃসংযোগ করলেই ধ্যানের মত ভাব হয় ?

—হয় তো।

আর একবার কি একটু তাকিয়ে দেখল লোকটি আমার মুখের উপর, তারপর বলল, হয়।

আবার সে জিজ্ঞাসা করল, প্রথম প্রথম ধ্যান করতে গেলে হাজারো বাইরের চিন্তা মনে আসতো ? না রে ?

—হ্যাঁ।

—তারপর যখন মন বসত, তখন প্রথম প্রথম আসন ছেড়ে উঠলে পা টলত না ?

—হ্যাঁ।

—কথাও জড়িয়ে যেত ?

—হ্যাঁ।

—হাত দুটো চিন্‌চিন্‌ করত ?

—হ্যাঁ।

—নানা অসুবিধাই হয়েছে প্রথম দিকে, না রে ?

—হয়েছে।

—রাত্রে প্রাণায়াম ও ধ্যানের পরে কি মনে হয় ?

বললাম, মনে হয় শরীরে যেন একটা প্রবল মত্ততা আসে। শরীরে যেন আগুন জ্বলে।

লোকটি একটু মুচকি মুচকি হেসে আপন মনেই বলল, হবে। তারপর আমার তলপেটের উপরে হাত দিয়ে কি একটু দেখল। তলপেট কখনও টন্‌টন্‌ করে ?

—না।

লোকটি আপন মনেই বলল, মুখ চোখ দেখে তাই মনে হচ্ছে ?

—'কি মনে হচ্ছে ?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

সে বলল, মনে হচ্ছে ব্রহ্মচর্য ভালই রপ্ত হচ্ছে, বীর্য উপরে উঠে যাচ্ছে।

লোকটির দৃষ্টি যেন এবার ইস্পাতের মত চক্‌চক্‌ করে উঠল। সে যেন হুকুম জারির ভঙ্গী করে বলল, সিদ্ধাসনে বোস।

আমি সিদ্ধাসনে বসলাম।

লোকটি বলল, যোনিমুদ্রা দ্বারা মলদ্বার অঞ্চলে চাপ দে।

দিলাম।

—কাকিণী মুদ্রায় প্রাণ বায়ু নিতে থাক।

নিলাম।

—প্রাণ বায়ুর সঙ্গে অপান বায়ুর যোগ কর।

আমি প্রাণায়ামের সেই বিশেষ ভঙ্গিটি করলাম।

—এবার মনে মনে দেহের মধ্যে ছয়টা চক্রের কল্পনা কর।

করলাম।

—তলপেটে কোন উত্তাপ বোধ করছিস?

—হ্যাঁ।

—অশ্বিনী মুদ্রা কর।

করলাম। তলপেটের মাংস পেশীকে একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে ঘোরাতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গেই যেন মেরুদণ্ডের নিম্নাঞ্চলে একটা শিরশির্ ভাব অনুভব করলাম। তারপরই হঠাৎ মনে হল, দেহের নিম্নাঞ্চলে যেন প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ হল। সারা শরীর যেন ঝলসে গেল তীব্র আগুনে। নিম্নাঞ্চলের একটা কঠিন অঞ্চলে যেন আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্ফুরণ হল। মনে হল, শক্ত পাথর গলে গলে লাভা হয়ে গেছে। নাকে একটা অদ্ভুত ঘ্রাণ অনুভব করলাম। পা দুটো যেন বলির পাঁঠার মত ভয়ে ভয়ে কাঁপছে বা আগুন লাগা গোয়ালের গরুর মত ছটফট করছে। আমার মনে হতে লাগল, শুধু আমার দেহের ঐ অঞ্চলটাই নয়, আমার চতুর্দিকের পৃথিবীও ঐভাবে গলে গেছে। আমার সামনে বসে থাকা লোকটিও ঘন লাভাস্রোতের মত। যেন সে অনেকটা গলে গেছে। আমি কেমন অস্থির বোধ করতে লাগলাম। তারপর মনে আছে, মেঝেতে লুটিয়ে পড়লাম। আর কিছু মনে নেই। তারপর যখন চেতনা ফিরল, দেখি নিরন্ধ্র অন্ধকারে মন্দির প্রাঙ্গণ ভরে আছে। বোধহয় দু-একজন লোক এসেছে আমার আশে-পাশে। একজন বলল, আপনার কি হয়েছে?

অন্ধকার ভেদ করে তার মুখ দেখবার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে?

সে বলল, মন্দিরের পাণ্ডা। আপনার কি হয়েছিল?

—জানি না।

উঠে বসবার চেষ্টা করতে সে বলল, উঠবেন না। কিছু বাদেই ভোর হবে, তখন উঠবেন।

এই লেখকের :—

সর্পতান্ত্রিকের সন্ধানে—১ম ও ২য় খণ্ড

মহাতীর্থ একান্নপীঠের সন্ধানে (তৃতীয় সংস্করণ)

একান্নপীঠের সাধক ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড

খুঁজে ফিরি কুণ্ডলিনী

সহস্রারের পথে

দণ্ডিত আসামী

ঈশ্বর মরে গেল

দক্ষজদরওয়াজার নগরী

রাজপথ তীর্থপথ ১ম ও ২য় খণ্ড প্রভৃতি।